জীবনের চূড়ান্ত জিজ্ঞাসার নতুন সমাধান

দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন

স্টিফেন হকিং ও লিওনার্দ ম্লডিনাও

অনুবাদ

নূর মোহাম্মদ কামু

ড. গোলাম মোরশেদ খান

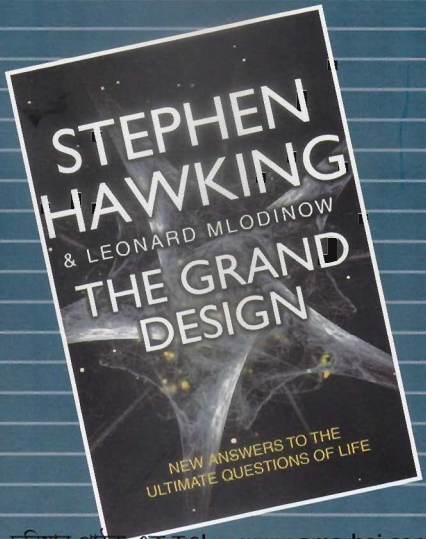

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখন এবং কী করে মহাবিশ্বের শুরু? কেন আমরা আজ এখানে? কোনো কিছুই না থেকেও কেন কিছু একটা অস্তিত্বমান? বাস্তবতার স্বরূপটি কী? প্রকৃতির সূত্রাবলীকে কেন এমন সুনিয়ন্ত্রিত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে আমাদের মতো সত্ত্বার উপস্থিতি সম্ভব হয়েছে? আর চূড়ান্ত বিচারে, আমাদের মহাবিশ্বের আপাতঃ দৃশ্যমান 'গ্র্যাণ্ড ডিজাইন'-এ এমন কোনো প্রমাণ রয়েছে কি, যাতে বলা যায় যে একজন মহান সৃষ্টিকর্তা এর স্রষ্টা। কিংবা বিজ্ঞান কি বিকল্প কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করে?

মহাবিশ্ব ও জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নাবলি একসময়ে ছিল দর্শনের আওতাভুক্ত, এখন সে এলাকা বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিকদের বিচরণ ক্ষেত্র– তবে তা শুধু ভিন্নমত প্রকাশের জন্য। তাদের নতুন বইয়ে স্টিফেন হকিং এবং লিওনার্দ ম্লডিনাও মহাবিশ্বের রহস্য সম্পর্কে সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে উপস্থাপন করেছেন; যা সহজবোধ্য ভাষায় চমকপ্রদ, কিন্তু সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে।

দ্য গ্রান্ড ডিজাইন বইয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে মহাবিশ্বের শুধু একটি অস্তিত্ব, কিংবা ইতিহাস নেই : বরং মহাবিশ্বের প্রতিটি ইতিহাস যুগপৎ বিরাজমান। যখন মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে তা সামগ্রিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন এ ধারণা কার্য-কারণ সম্পর্ককেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। কিন্তু মহাবিশ্বের 'উপর-নিচ' পদ্ধতি (হকিং এবং ম্লডিনাও-এর বর্ণনাকৃত) বলে যে অতীত কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ নেয় না, অর্থাৎ আমরা মহাবিশ্বকে প্রত্যক্ষ করেই ইতিহাস তৈরি করি, ইতিহাস আমাদের সৃষ্টি করে না। লেখকদ্বয় আরো ব্যাখ্যা করেছেন যে আমরা নিজেরাও মহাবিশ্বের সৃষ্টিলগ্নের কোয়ান্টাম-চঞ্চলতা থেকে সৃষ্টি এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব কীভাবে 'বহু-মহাবিশ্ব' ধারণার ভবিষ্যৎবাণী করে– এটা এমন এক ধারণা যে আমাদের মহাবিশ্ব অনেকগুলোর মধ্যে একটি; তা শূন্য থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট, এবং প্রতিটি মহাবিশ্বের ভিন্ন প্রাকৃতিক সূত্রাবলী রয়েছে।

বাস্তবতার প্রথাগত ধারণাকে হকিং এবং ম্লডিনাও প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, যা একটি 'মডেল-নির্ভর' বাস্তবতার তত্ত্বকে পাওয়ার আশা করে। সবশেষে তাঁরা চূড়ান্ত বিচার করেছেন M-তত্ত্বের রূপরেখাকে, যা আমাদের মহাবিশ্বের পরিচালনা সূত্রাবলীকে একমাত্র চূড়ান্ত তত্ত্বের গ্রহণযোগ্য প্রার্থী হিসাবে উপস্থাপন করেছে। তা যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায়, তবে এটাই হবে আইনস্টাইনের ইপ্সিত সেই একীভূত তত্ত্ব এবং মানুষের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিজয়।

আমাদের প্রচলিত ধারণা ও প্রথাগত বিশ্বাসকে পরিবর্তনকারী একটি সুনির্দিষ্ট, চমকপ্রদ এবং বিস্ময়কর পথনির্দেশিকা হিসাবে 'দ্য গ্র্যাণ্ড ডিজাইন' আপনাকে এমনভাবে উজ্জীবিত করবে, যা অতুলনীয়।

ISBN 978 984 8088 21 0
9 789848 088210

দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন | স্টিফেন হকিং ও লিওনার্দ ম্লডিনাও

সন্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টিফেন হকিং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের লুকাসিয়ান অধ্যাপক পদে ত্রিশ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন, অসংখ্য পদক এবং সম্মানে ভূষিত এবং অতি সম্প্রতি 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম' সম্মানে ভূষিত। সাধারণ পাঠকদের জন্য তাঁর লেখা অন্যান্য বইগুলোর মধ্যে আ ব্রিফ হিস্টোরী অব টাইম, ব্লাক হোলস এণ্ড বেবি ইউনিভার্সেস এন্ড আদার এসেজ, দ্য ইউনিভার্স ইন আ নাটসেল এবং আ ব্রিফার হিস্টোরী অব টাইম উল্লেখযোগ্য। তিনি ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে বসবাস করছেন।

অনুবাদক : নূর মোহাম্মদ কামু ৫ জানুয়ারী ১৯৫৭ সালে কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহন করেন। পিতা প্রয়াত ডা: সফিউদ্দিন আহমেদ এবং মাতা হোসনে আরা আহমেদ। পৈত্রিক বাড়ী পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া উপজেলার টিকিকাটা গ্রামে। পিতার সরকারি চাকরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে পড়াশুনা এবং সবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ থেকে সম্মানসহ এম.এস.সি। বর্তমানে ইথিক্যাল গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিওনার্দ ম্লডিনাও ক্যালটেকের পদার্থবিদ এবং বহুল বিক্রিত পুস্তক দ্য ড্রাঙ্কার্ডস ওয়াক : হাউ র‍্যাণ্ডমনেস রুলস আওয়ার লাইভস, ইউক্লিডস উইণ্ডো : দ্য স্টোরী অব জিওমেট্রি ফ্রম প্যারালাল লাইনস টু হাইপারস্পেস এবং ফেইনম্যান'স রেইনবো : আ সার্চ ফর বিউটি ইন ফিজিক্স এন্ড ইন লাইফ এর লেখক। তিনি স্টার ট্রেক : দ্য নেক্সট জেনারেশন এরও লেখক। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার সাউথ প্যাসাডোনায় বসবাস করছেন।

অনুবাদক : ড. গোলাম মোরশেদ খান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী একটি প্রগতিশীল পরিবারে জন্ম ১৯৫৪ সনে, নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলায়। উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত কারণে প্রায় তিনদশক ধরে প্রবাসে জীবনযাপন, তবে দেশজ শিল্পসংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হতে দেননি। কাব্যচর্চা দিয়ে শুরু হলেও এখন ব্যাপৃত আছেন বিজ্ঞানচর্চা ও অনুবাদকর্মে। প্রকাশিত গ্রন্থ : 'জীবন ও মানুষ : মহাবিশ্বের মহাপরিসরে' (১৯৯২), 'মানবসমাজ ও বিজ্ঞান' (২০০২)। পেশায় চিকিৎসক– ইউরোলজিতে পি.এইচ.ডি। বর্তমানে সৌদি আরব প্রবাসী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

The Grand Design

Stephen Hawking
and
Leonard Mlodinow

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের চূড়ান্ত জিজ্ঞাসার নতুন সমাধান

দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন

মূল : **স্টিফেন হকিং ও লিওনার্দ ম্লডিনাও**

অনুবাদ

নূর মোহাম্মদ কামু

ড. গোলাম মোরশেদ খান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ISBN-978-984-8088-21-0

দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন

স্টিফেন হকিং ও লিওনার্দ মুডিনাও

অনুবাদ : নূর মোহাম্মদ কামু ও ড. গোলাম মোরশেদ খান

The Grand Design
Stephen Hawking and Leonard Mlodinow
First published : 2010
Copyright © Stephen W Hawking and Leonard Mlodinow 2010
Original art copyright © Peter Bollinger 2010
বাংলা অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০১১

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১১
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ : বিপ্লব দেব

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : info@sandeshgroup.com
www.sandeshgroup.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

১৯৫.০০ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকদ্বয়ের উৎসর্গ

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পিতা
প্রয়াত ডাঃ সফিউদ্দিন আহমেদ
এবং
প্রয়াত আব্দুল হাকিম খান-এর
স্মৃতির উদ্দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকদ্বয়ের আরো বই :

কার্ল সাগান : অভিযাত্রী বিজ্ঞানী ও সংশয়ী দার্শনিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকদ্বয়ের কথা

দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন বইটি স্টিফেন হকিং এবং ক্যালটেকের পদার্থবিদ লিউনার্ড ম্লডিনাও-এর লেখা বহুল আলোচিত বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ। বইটি ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়।

স্টিফেন উইলিয়াম হকিং ১৯৪২ সালের ৮ই জানুয়ারি (গ্যালিলিওর তিনশতম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে) ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। গণিতশাস্ত্রে পড়াশুনা করার ইচ্ছে থাকলেও অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজে সে সুযোগ না থাকায় পদার্থবিদ্যায় ভর্তি হয়ে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাকাশবিজ্ঞানে গবেষণা করে তিনি পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৯ সনে কেমব্রিজের এপ্লাইড ম্যাথমেটিকস্ এন্ড থিউরিটিক্যাল ফিজিক্স বিভাগে সম্মানজনক লুকাসিয়ান অধ্যাপক হিসেবে ২০০১ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই বিশিষ্ট পদটি ইতিপূর্বে আইজাক বারো এবং ১৬৬৯ সালে আইজাক নিউটন অলঙ্কৃত করেছিলেন। বর্তমানে হকিং কেম্ব্রিজের সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল কসমোলজির গবেষক হিসেবে কাজ করছেন। বহু বছরব্যাপী দূরারোগ্য স্নায়ুরোগে (motor neuron disease) আক্রান্ত স্টিফেন হকিং-এর দেহ অসাড়, চলৎশক্তিহীন ও বাকরুদ্ধ হলেও তাঁর মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ কর্মক্ষম রয়েছে। এ ধরনের অসুস্থতার ভেতর হুইল চেয়ারে বসে বিজ্ঞানের জটিলতম বিষয়ে গবেষণা ও বিজ্ঞানপ্রেমীদের জন্য অসাধারণ পুস্তক উপহার দেয়া খুবই আশ্চর্যের বিষয়।

বইটির সহলেখক, বিজ্ঞানী লিউনার্ড ম্লডিনাও ক্যালটেকের পদার্থ বিজ্ঞানী এবং The Drunkard's Walk : How Randomness Rules Our lives, Feynman's Rainbow : A Search of Beauty in Physics and in Life, Euclid's Window : the Story of Geometry from Parallel Lines to Hyperspace, Star Trek : The Next Generation– ইত্যাদি বইয়ের লেখক। বর্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সাউথ প্যাসাডোনায় বসবাস করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষ্টিফেন উইলিয়াম হকিং সম্ভবত আইনস্টাইন-পরবর্তী সময়ে সর্বাধিক পরিচিত বিজ্ঞানী। তাঁর বহুল পরিচিত বই 'The Brief History of Time' ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং নব্বই লক্ষ কপি বিক্রির রেকর্ড সৃষ্টি করে। উক্ত বইয়ে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, যদি আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের একটি একীভূত তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারি, তাহলে ঈশ্বরের মনকে জানতে তা সাহায্য করবে। সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রায় বাইশ বছর পর 'দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন' বইতে মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং পরবর্তী বিকাশকালীন সময়ে ঈশ্বরের ভূমিকা বা হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর এসব মতামতের ঊর্ধ্বে থেকে আমরা যে কারণে বইটি অনুবাদ করতে আগ্রহী হয়েছি, তা হচ্ছে, M-তত্ত্বকে সমস্ত তত্ত্বের সর্বশেষ সমন্বিত তত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা বাংলাভাষী পাঠককে জ্ঞাত করানো। যদিও M-তত্ত্ব অনেকের মতেই একটি অসম্পূর্ণ, হতাশাজনক ও অপ্রমাণিত তত্ত্ব।

এই বইয়ে M-তত্ত্বকে উপস্থাপন করতে গিয়ে লেখকদ্বয় আমাদের মহাবিশ্বের প্রকৃতি নিয়ে বিজ্ঞানের একটি সুশৃঙ্খল ইতিহাস বইটির শুরু থেকেই বর্ণনা করেছেন– পিথাগোরাস থেকে দেকার্তে, হাইসেনবার্গ থেকে ফেইনম্যান পর্যন্ত যা বিস্তৃত। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এই একবিংশ শতকেও পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বই অসম্পূর্ণ এবং প্রশ্নবিদ্ধ; এমনকি কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্পর্কেও এর প্রবক্তাদের অন্যতম ফেইনম্যানের নিজের কথায়ই বলা যায়, "আমি নিশ্চিত যে কেউই কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে বুঝতে পারেন না।"

কিন্তু বিজ্ঞানের নিত্য নব আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের সফলতায় ভরপুর আমাদের গত বিশশতক। এই সময়কালেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পরমাণু এবং এর আরো গভীরতম পর্যায়ের ব্যাখ্যা প্রদানে সচেষ্ট হয়েছে; মহাকর্ষ বলের ব্যাখ্যা প্রদান করেছে এবং ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার সূত্রাবলি সম্পর্কে আমাদের ধারণার সার্থক পরিবর্তন এনেছে। দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন বই বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয় কোয়ান্টাম তত্ত্ব, ফেইনম্যানের 'সংঘটনের যোগফল'-এর চিত্র এবং বর্ণনা, কোনোরূপ জটিল গণিত ব্যবহার না করে একীভূত তত্ত্বের খোঁজে বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত M-তত্ত্বের পক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করে একটি মাত্র মহাবিশ্বের পরিবর্তে লক্ষ কোটি মহাবিশ্বের ধারণা উপস্থাপন করেছে। এটা অনেকটা মহাকাশ বিজ্ঞানে কোপার্নিকাস আর গ্যালিলিওর বিপ্লবের মতোই ঘটনা।

এই বইয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার সূত্রসমূহের বর্ণনা সার্বিকভাবে অনুধাবন করা আমাদের জন্য দূরূহ-এটা বিনীতভাবে পাঠকের কাছে উল্লেখ করতে চাই। তবুও একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এ ধরনের একটি বই বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের বিজ্ঞানবোধ জাগ্রত করতে সহায়ক হবে। দর্শন ও পদার্থবিদ্যার ইতিহাসের পরম্পরা বর্ণনা আর আমাদের সবার মধ্যে কৌতূহলি সদাজাগ্রত প্রশ্নগুলি, যেমন 'কোন কিছু না থাকার বদলে কিছু একটা কেন বর্তমান এবং বিশেষ কিছু সূত্রের পরিবর্তে অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো সূত্র এ মহাবিশ্বের চালিকাশক্তি নয়' কেন– এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের রূপরেখা পাওয়া যাবে।

নি:সন্দেহ 'দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন' বিজ্ঞানের বহুল প্রচারিত একটি বই। এ বইয়ের বাংলা অনুবাদে ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানের প্রচলিত ও স্বল্প পরিচিত ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ তেমন একটা নেই। কোনো ত্রুটির জন্য আমরা আগেভাগেই ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠক-পাঠিকার মতামত ও ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে অবশ্যই কৃতজ্ঞতার সাথে তা গৃহীত হবে।

এ বই অনুবাদে সন্দেশ প্রকাশনীর স্বত্ত্বাধিকারী জনাব লুৎফর রহমান চৌধুরীর আগ্রহ আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত প্রকৌশলী, অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু জনাব হাফিজুল হক, ইথিক্যাল গ্রুপের কর্ণধার জনাব রহমতউল্লাহ, যুক্তরাজ্যের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন প্রকৌশলী আরিফউল্লাহ অভিসিয়াস, প্রকৌশলী এম শহিদুল হাফিজ বইটি অনুবাদে সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বই আরো বেশি সংখ্যায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হোক– কেননা একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবলম্বন হচ্ছে বিজ্ঞান।

নূর মোহাম্মদ কামু
ড. গোলাম মোরশেদ খান
ঢাকা, বাংলাদেশ
তায়েফ, সৌদি আরব
জুন, ২০১১ সাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

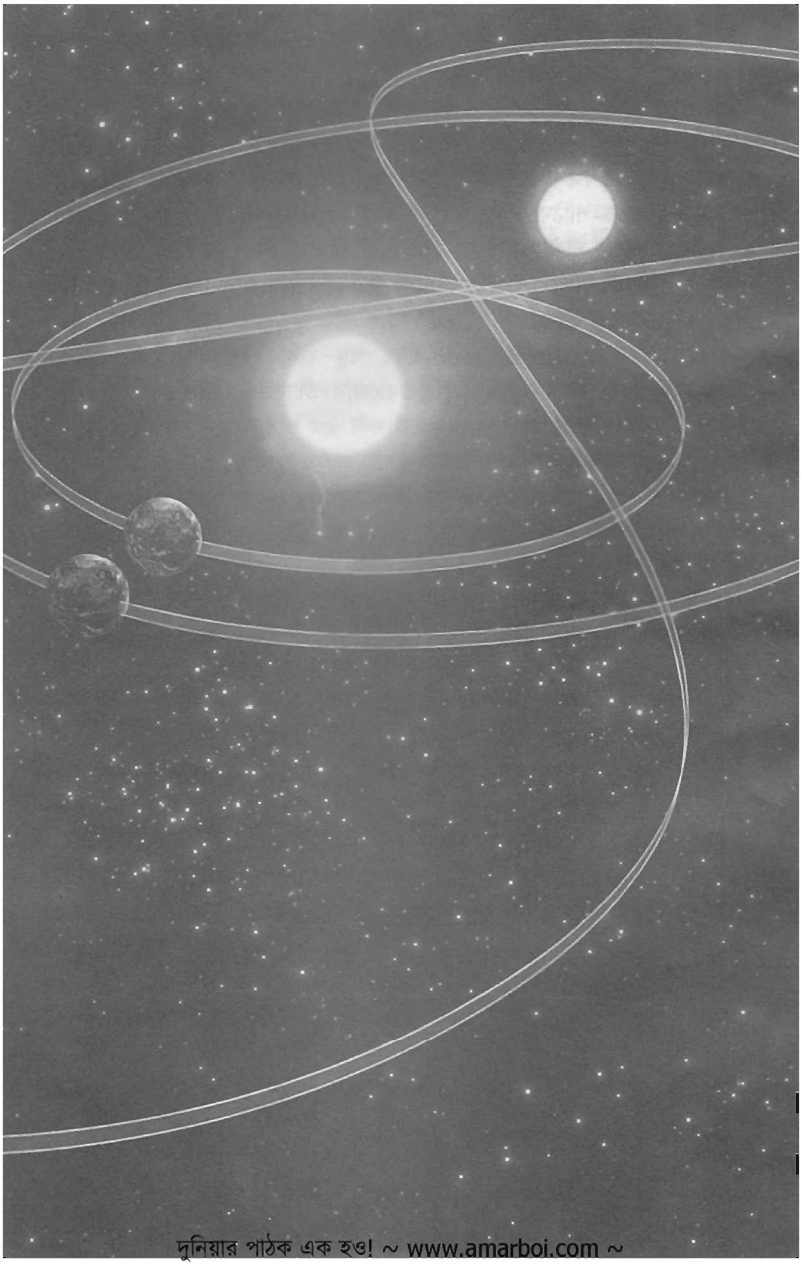

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

অস্তিত্বের রহস্য # ১৫

বিধিবিধানের শাসন # ২১

বাস্তবতা কী? # ৩৯

বিকল্প ইতিহাসসমূহ # ৫৭

সবকিছুর সূত্র # ৭৭

আমাদের মহাবিশ্বকে বেছে নেয়া # ১০৫

প্রতীয়মান অলৌকিক ঘটনা # ১২৩

দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন # ১৩৯

শব্দকোষ # ১৪৯

কৃতজ্ঞতা # ১৫৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

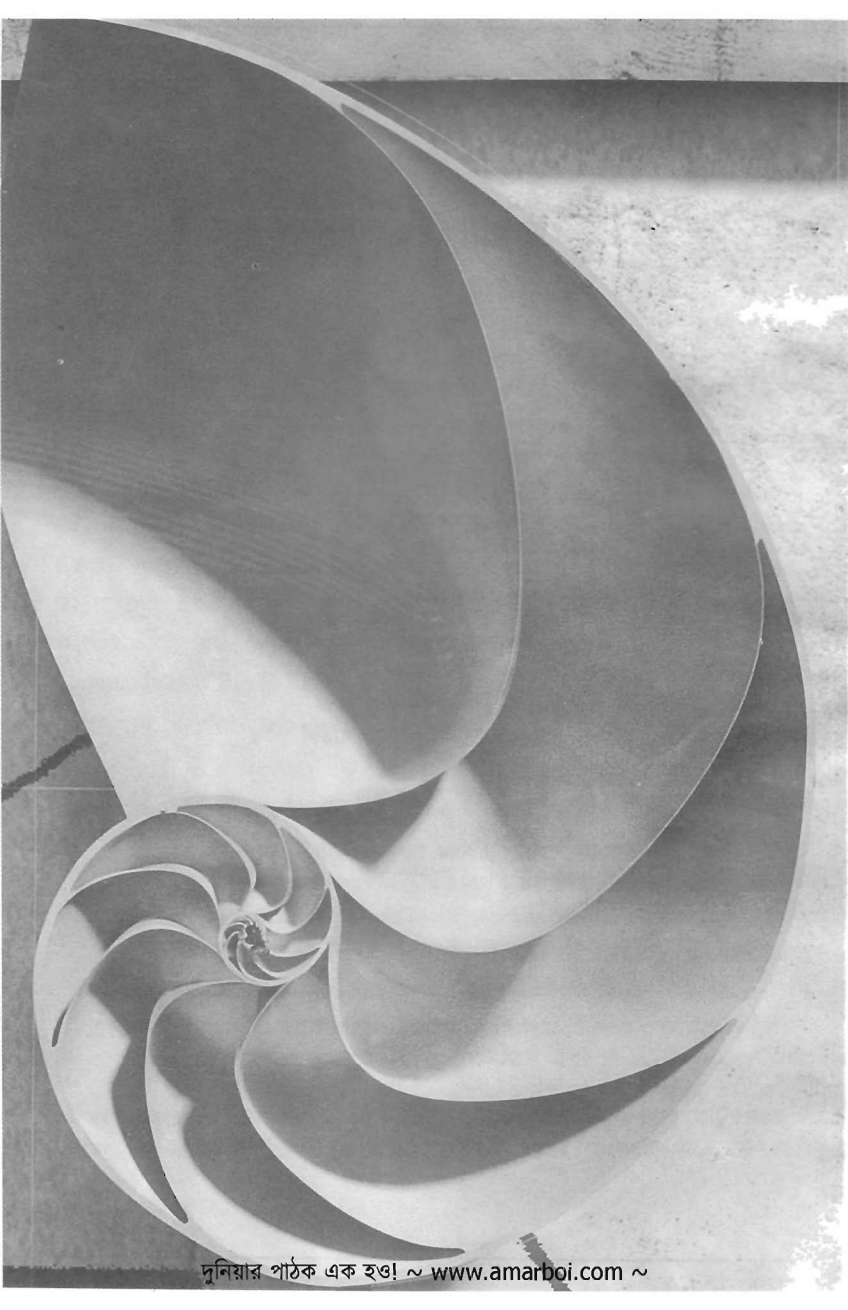
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্তিত্বের রহস্য

আমরা প্রত্যেকেই অল্পসময়কাল বেঁচে থাকি। আর এ সময়কালে আমরা এ মহাবিশ্বের একটা ক্ষুদ্র অংশই আবিষ্কার করতে পারি। কিন্তু মানবপ্রজাতি একটি অনুসন্ধিৎসু প্রজাতি। আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই, আর এর উত্তর খুঁজি। আমাদের বাসস্থান বিশাল এই পৃথিবী কখনো আমাদের প্রতি সদয়, কখনোবা নির্মম। উপরদিকে তাকালেই স্বর্গলোকের যে বিশালতা চোখে পড়ে, তা সর্বদাই মানুষের মনে অগণিত প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যে মহাবিশ্বে আমরা বাস করি, সে মহাবিশ্বের পরিপূর্ণ প্রকৃতি আমরা কীভাবে অনুধাবন করতে পারি? মহাবিশ্ব কীভাবে আচরণ করে? বাস্তবের প্রকৃত রূপটি কী? এ বিশ্বের সবকিছু কোথা থেকে এসেছে? এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য একজন সৃষ্টিকর্তা কী জরুরি? আমাদের বেশির ভাগ মানুষই হয়তো এ সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবি না, তবে জীবনের কোনো না কোনো সময়ে আমাদের অনেকের মাঝেই এগুলো নিয়ে কিছুটা হলেও ভাবনা আসে।

AMARBOI.COM

ঐতিহ্যগতভাবে এ সমস্ত প্রশ্নগুলো দর্শনের আওতাভুক্ত, কিন্তু দর্শন এখন মৃত। আধুনিক বিজ্ঞান, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির সাথে দর্শন তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। ফলে এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিজ্ঞানীরাই এখন অগ্রবর্তী মশালবাহী হয়ে পড়েছেন। এ বইটির উদ্দেশ্য সাম্প্রতিক আবিষ্কার ও তত্ত্বীয় অগ্রগতির আলোকে এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। এগুলো আমাদের নিয়ে যায় মহাবিশ্বের একটি নতুন চিত্রের দিকে, যেখানে আমাদের অবস্থান চিরাচরিত অবস্থান থেকে ভিন্ন। এমনকি একটি বা দুটি দশক আগেও যে চিত্রটি আমাদের জানা ছিল, তা থেকে বর্তমান চিত্রটি ভিন্ন। তবে এই নতুন ধারণাটির উৎস খুঁজতে হলে প্রায় এক শতাব্দী পিছনে ফিরে যেতে হবে।

মহাবিশ্বের চিরাচরিত ধারণা অনুসারে বস্তুসমূহ সুনির্দিষ্ট পথ ধরে চলে এবং তাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট ইতিহাস। আমরা যে কোনো সময়ে তাদের অবস্থানকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এ ধারণাটি সঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

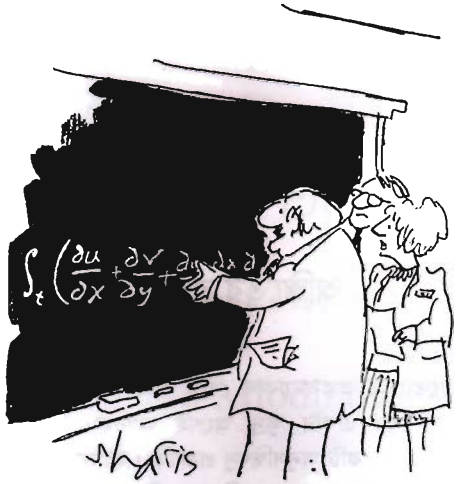

"... এবং এটাই হল আমার দর্শণ"

বিবেচিত হলেও ১৯২০ এর দশকেই চিরাচরিত এ ধারণাটি প্রশ্নের মুখে পড়ে– অণু-পরমাণুর সূক্ষ্মতর জগতের ক্ষেত্রে এ ধারণা অকার্যকর প্রমাণিত হয়। এর পরিবর্তে প্রয়োজন হয়ে পড়ে ভিন্নধর্মী ধারণা-কাঠামো, যার নাম দেয়া হয় কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা। পরমাণুজগতের ঘটনাবলি অনুধাবন করতে কোয়ান্টাম সূত্রসমূহ বিস্ময়করভাবে কার্যকরী প্রতীয়মান হয়। একই সাথে তা দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্যমান ঘটনাসমূহের ধ্রুপদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেও সক্ষম। কিন্তু কোয়ান্টাম ও ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যা বাস্তবপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো ধারণাকে ভিত্তি করে নির্মিত।

কোয়ান্টাম তত্ত্বকে বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করা যায়, কিন্তু এর মধ্য থেকে সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনা যিনি দিয়েছেন, তিনি রিচার্ড (ডিক) ফেইনম্যান– যিনি এক বর্ণাঢ্য চরিত্রের অধিকারী, ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেক্‌নোলজিতে যিনি কাজ করতেন এবং রাস্তার মোড়ে বঙ্গো ড্রাম বাজাতেন। ফেইনম্যানের মতে, একটি পদ্ধতির শুধুমাত্র একটি ইতিহাস থাকেনা; বরং তার একাধিক সম্ভাব্য ইতিহাস থাকে। আমরা যখন আমাদের উত্তর খুঁজবো, তখন ফেইনম্যানের এই ধারণাটিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবো এবং এই ধারণাটিকে উন্মোচিত করবো যে মহাবিশ্বের কোনো একক ইতিহাস নেই, এমনকি তার কোনো স্বাধীন অস্তিত্বও নেই। এমনকি অনেক পদার্থবিদের কাছেও এটি একটি চরম বিতর্কিত মতবাদ বলে মনে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক ধারণা বা

বিনামূল্যে পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকল্পের মতোই এটিও কাণ্ডজ্ঞান বা কমনসেন্সকে লঙ্ঘন করে। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান আমাদের প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই রচিত হয়, মহাবিশ্বকে আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে আবিষ্কারের ফলে নয়– যে আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে পরমাণুর অভ্যন্তরে কিংবা বিশ্বসৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করার।

আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত সাধারণভাবে ধারণা করা হতো যে জগতের সমস্ত জ্ঞান প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব– অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই বলে দিতে পারে কোন জিনিসটি কেমন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ফেইনম্যানের ধারণার মতো এমনসব ধারণার উপর ভিত্তি করে রচিত, যা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সাথে সাংঘর্ষিক এবং তা দেখিয়েছে যে ব্যাপারটি মোটেও সে রকম নয়। বাস্তব জগতের এই অকপট চিত্র আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই বৈপরীত্যকে মোকাবেলা করতে আমাদের এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গির শরণ নিতে হয়, যাকে বলা হয় প্রতিরূপ বা মডেল-নির্ভর বাস্তবতা (Model-dependent realism)। এটি এমন একটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে আমাদের মস্তিষ্ক, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে প্রাপ্ত সঙ্কেত বিশ্লেষণ করে জগৎ সম্পর্কে একটি মডেল বা প্রতিরূপ তৈরি করে নেয়। যখন এ রকম কোনো একটি প্রতিরূপ বা মডেল জাগতিক ঘটনাসমূহকে ব্যাখ্যা করতে সফল বলে বিবেচিত হয়, তখন আমরা তার উপর এবং তার গঠনকারী উপাদান ও ধারণাসমূহের উপর বাস্তবতা বা চূড়ান্ত সত্যের গুণাবলি আরোপ করি। কিন্তু একই ধরনের ভৌত অবস্থাকে বুঝাতে বিভিন্ন ধরনের মডেল বা প্রতিরূপ তৈরি করা সম্ভব, যার প্রতিটিই ভিন্ন মৌলিক উপাদান ও ধারণাকে ভিত্তি করে রচিত। এ রকম দুটি ভৌত তত্ত্ব বা প্রতিরূপ যদি একই ঘটনার সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হয়, তখন এর একটি প্রতিরূপকে অন্যটির চেয়ে বেশি বাস্তব বলা যায় না। বরং আমরা তখন এ দুটো মডেলের মধ্যে যেটি অধিকতর সুবিধাজনক, সেটিকেই ব্যবহার করার ক্ষেত্রে স্বাধীন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা এ রকমই ভালো থেকে আরো ভালো তত্ত্ব বা মডেলের পরম্পরা আবিষ্কার করেছি– প্লেটো থেকে নিউটনের চিরায়ত সূত্র অথবা আধুনিক পদার্থবিদ্যার কোয়ান্টাম সূত্রসমূহ। এ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক এই পরম্পরা কী কোনো শেষবিন্দুতে পৌঁছাবে, যা মহাবিশ্বের একটি চূড়ান্ত সূত্র; যা সমস্ত বলগুলোকে যুক্ত করবে এবং আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য সমস্ত দৃশ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করবে? নাকি আমরা তেমন কোনো চূড়ান্ত সূত্র ছাড়াই সবসময় ভালো থেকে আরো ভালো তত্ত্ব আবিষ্কার করে যেতে থাকবো? এ প্রশ্নের কোনো চূড়ান্ত উত্তর এখনও আমাদের কাছে নেই, কিন্তু বর্তমানে আমাদের হাতে এরকম একটি সার্বিক চূড়ান্ত তত্ত্বের (Ultimate Theory of Evrything) প্রার্থী রয়েছে, যাকে বলা হয় M-তত্ত্ব (M-theory) অবশ্য যদি সত্যি তেমন কিছু একটা থেকে থাকে। এই M-তত্ত্বই

AMARBOI.COM

হচ্ছে একমাত্র মডেল, একটি চূড়ান্ত তত্ত্ব হওয়ার মতো গুণাবলি যার মধ্যে রয়েছে এবং আমাদের পরবর্তী আলোচনার বেশির ভাগ এ তত্ত্বকে নিয়েই ব্যয় হবে।

প্রথাগত অর্থে M-তত্ত্ব কোনো তত্ত্ব নয়। এটি বিভিন্ন তত্ত্বসমূহের একটি গুচ্ছমালা, যার প্রতিটি মতবাদ কোনো ভৌত অবস্থার কিছু অংশের পর্যবেক্ষণলব্ধ একটি যথাযথ বর্ণনা। একে বলা যায় অনেকটা মানচিত্রের মতো। আমরা জানি যে পৃথিবীর পূর্ণাঙ্গ মানচিত্রকে একটি একক মানচিত্রে সঠিকভাবে দেখানো যায় না। পৃথিবীর একটি একক মানচিত্রে (Mercator projection) উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি এলাকাসমূহকে স্বাভাবিকের চেয়ে বৃহত্তর দেখা যায় এবং চূড়ান্ত মেরু এলাকা দুটোকে দেখানো সম্ভব হয় না। পুরো পৃথিবীকে বিশ্বস্তভাবে দেখাতে হলে তাকে খন্ড খন্ড আলাদা মানচিত্র হিসেবে দেখাতে হবে, যার প্রতিটিতে একটি এলাকা নির্দিষ্ট থাকবে। মানচিত্রের প্রতিটি খন্ডাংশের একটি অন্যটির উপর প্রতিস্থাপিত হবে এবং সে সমস্ত এলাকায় একই স্থানকে দুটো মানচিত্রেই দেখা যাবে। M-তত্ত্ব অনেকটা সে রকমই। এই গুচ্ছমালার, M-তত্ত্ব পরিবারের প্রতিটি তত্ত্বই আলাদা রকম দেখা যেতে পারে; কিন্তু সেগুলোকে একটা অন্তর্গত তত্ত্বের অংশবিশেষ বলেই বিবেচনা করা যেতে পারে। সেগুলো সীমিত পরিসরে প্রযোজ্য তত্ত্বের বিবরণ– যেমন পরিমাণে ক্ষুদ্র শক্তির ক্ষেত্রে। বিশ্ব– মানচিত্রের mercator projection-এর মতো, যেখানে বিভিন্ন খন্ডাংশ একে অপরের উপর উপস্থাপিত হয়, এগুলোও একই প্রপঞ্চের ভবিষ্যদ্বাণী করে। কিন্তু কোনো সমতল মানচিত্রই যেমন পৃথিবীর উপরিভাগের প্রকৃতি ধারণা দিতে পারে না, তেমনি কোনো একক তত্ত্বও সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম নয়।

M-তত্ত্ব কীভাবে সৃষ্টিমুহূর্তকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম, তা আমরা বর্ণনা করবো। এই তত্ত্ব অনুসারে, আমাদের এই মহাবিশ্বই একমাত্র মহাবিশ্ব নয়। এর বিপরীতে M-তত্ত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করে যে এরকম আরো অসংখ্য মহাবিশ্ব রয়েছে, যেগুলো শূন্য থেকে সৃষ্ট। তাদের সৃষ্টির জন্য কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ঈশ্বরেরও প্রয়োজন নেই। বরং সেগুলোর স্বাভাবিক জন্ম হয়েছে প্রকৃতির নিয়মগুলো থেকেই। এগুলো হচ্ছে বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী। প্রতিটি মহাবিশ্বেরই রয়েছে সম্ভাব্য ইতিহাস এবং পরবর্তীকালে সম্ভাব্য বহুবিধ অবস্থা– যেমন, সৃষ্টির বহু সময়কাল পর আমাদের বর্তমান অবস্থা। এ সমস্ত অবস্থার বেশির ভাগই আমাদের দৃশ্য মহাবিশ্বের মতো নয় এবং সেগুলো কোনো ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব থাকার অনুপযোগী। এগুলোর মধ্যে খুব কম সংখ্যকই আমাদের মতো প্রাণীকে পোষণ করতে সক্ষম। সুতরাং এটা বলা যায়, আমাদের উপস্থিতি প্রমাণ করে আমরা এরকম অসংখ্য মহাবিশ্ব থেকে আমাদের থাকার উপযোগী একটিকেই বেছে নিয়েছি। যদিও মহাবিশ্বের তুলনায় আমরা তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর, এটা আমাদেরকে এক অর্থে সৃষ্টির অধিপতি হিসেবেই তৈরি করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

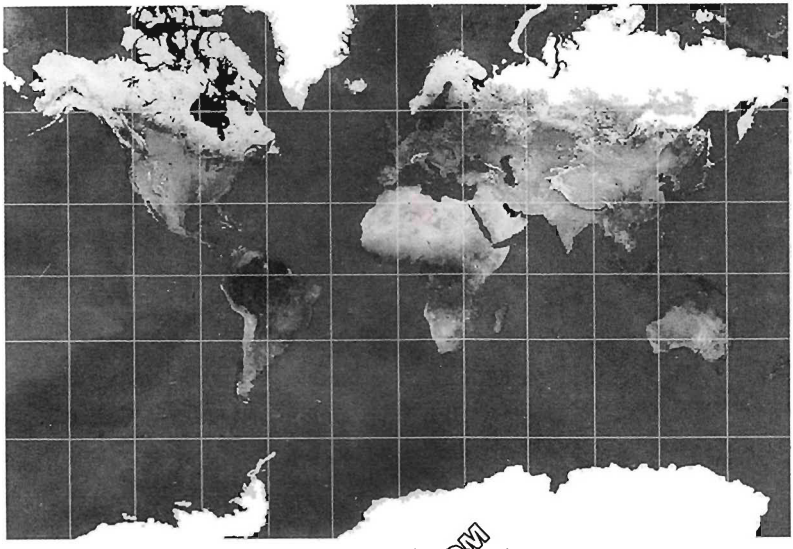

বিশ্ব মানচিত্র : মহাবিশ্বকে বুঝতে গেলে এক ঝাঁক প্রতিস্থাপিত তত্ত্বের প্রয়োজন হয়, যেমন করে পৃথিবীর সার্বিক মানচিত্রকে উপস্থাপন করতে অনেক রকম মানচিত্রের প্রয়োজন।

AMARBOI.COM

মহাবিশ্বকে গভীরভাবে জানতে হলে তা শুধুমাত্র 'কীভাবে' কাজ করে নয়– বরং 'কেন' কাজ করে, তা জানা প্রয়োজন।

কেন কোনো কিছু না থেকে কোনো কিছু অস্তিত্বমান হলো?
কেন আমরা এখানে রয়েছি?
কেন এ সূত্রসমূহই কার্যকর হলো, অন্য কোনো সূত্র নয়?

আর এটাই জীবন, মহাবিশ্ব ও সবকিছুর চূড়ান্ত প্রশ্ন। আমরা এ বইয়ে এরই উত্তর দিতে চেষ্টা করবো। The Hitchhiker's Guide to the Galaxy এর মতো আমাদের উত্তরটি শুধুমাত্র '৪২' হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

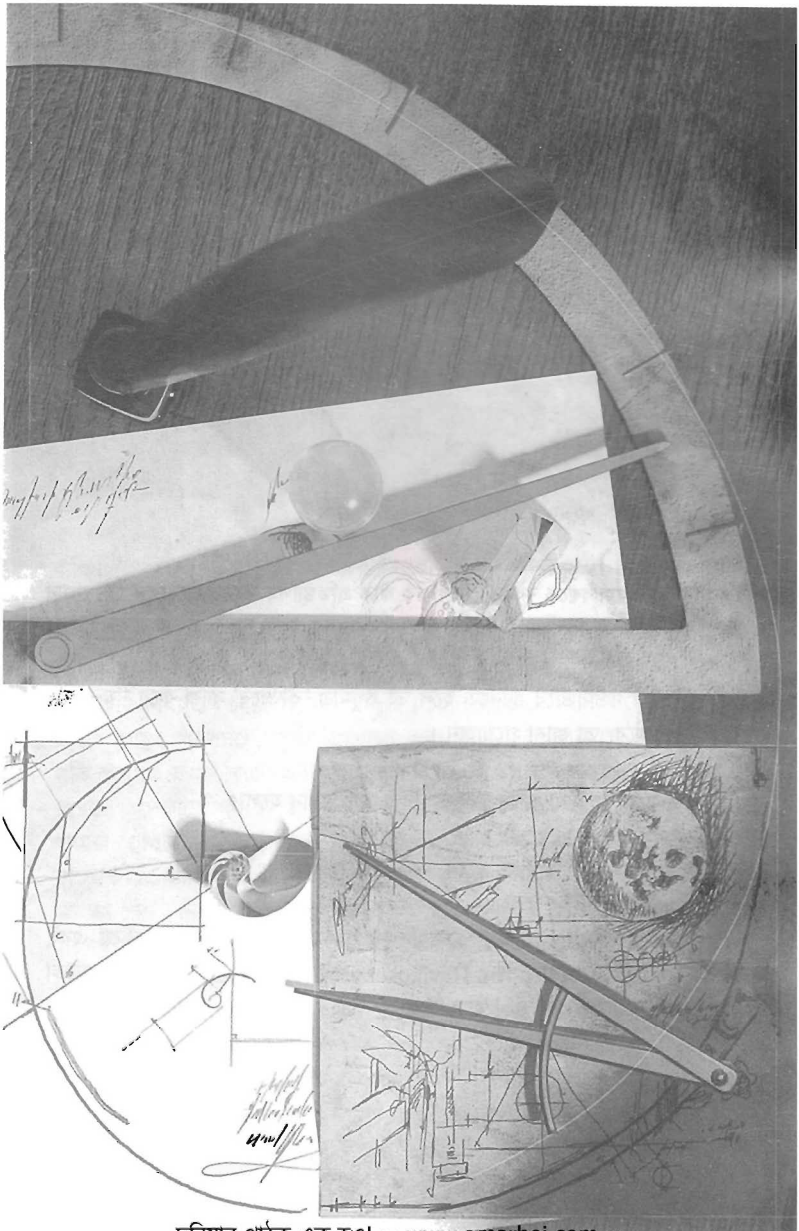

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধিবিধানের শাসন

স্কল নামের নেকড়ে ভয় দেখায় চাঁদকে
যতক্ষণ না সে লুকোয় দুঃখবনের গভীরে
আরেক নেকড়ে হাটি, রিদভিত্‌নিরের স্বজন
সে কিনা তাড়া করে সূর্যকে।
"গ্রিমনিসমাল," দ্য এন্ডার এড্ডা

পুরানে আছে, স্কল ও হাটি সূর্য ও চাঁদকে তাড়া করে। যখনই এ দুই নেকড়ে এদের কোনো একটিকে ধরে ফেলে, তখনই গ্রহণ দেখা দেয়। আর তা ঘটলেই মর্ত্যের মানুষেরা চাঁদ বা সূর্যকে বাঁচাতে শোরগোল আরম্ভ করে, যাতে নেকড়েরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। একই ধরনের পুরাণকাহিনি পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতিতেও রয়েছে। কিন্তু মানুষ ক্রমশ বুঝতে পারলো যে তারা শোরগোল করে বা বাজনা বাজিয়ে নেকড়েদের ভয় দেখাক আর না দেখাক, একসময় না একসময় সূর্য ও চাঁদ গ্রহণ থেকে বেরিয়ে আসেই। এরপর তারা আরো লক্ষ করলো যে গ্রহণ কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়ার মতো বিষয় নয়, বরং তা এক নির্দিষ্ট নিয়মে পুনরাবৃত্তি করা ঘটনা। চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রে এটা বেশি করে সত্য, প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীরা তা লক্ষ্য করে প্রায় সঠিকভাবেই গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হতো– যদিও তারা বুঝতে সক্ষম হয়নি যে পৃথিবী সূর্যের আলোকে আড়াল করার ফলেই এই চন্দ্রগ্রহণ ঘটে থাকে। সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করা আরো কঠিন, কেননা তা পৃথিবীপৃষ্ঠের অতি সংকীর্ণ করিডোরে দৃশ্যমান হয়, যা মাত্র ১০ মাইল চওড়া। এভাবেই মানুষ জানতে সক্ষম হলো যে প্রকৃতি বিধিবিধান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত।

স্বর্গীয় বস্তুসমূহের গমনপথের ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে কিছু সফলতা ঘটলেও আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে তার বেশির ভাগই ছিল সাধ্যাতীত। অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, ঝড়, পঙ্গপাল আক্রমণ কিংবা নখের রোগ ইত্যাদি যে কোনো ব্যাপারেই কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম বুঝে উঠা কঠিন। প্রাচীনকালে প্রকৃতির যে কোনো ধ্বংসাত্মক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

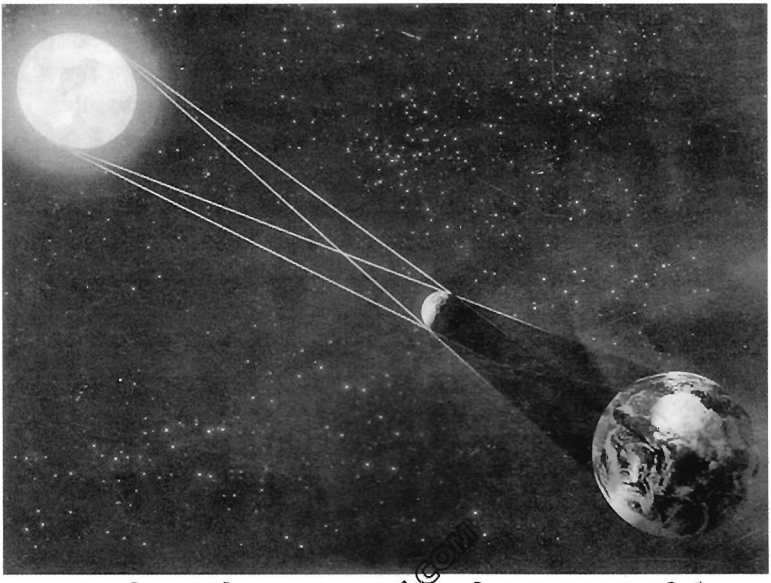

গ্রহণ : প্রাচীন জনগোষ্ঠী জানতেন না কেন গ্রহণ হয়, কিন্তু তারা গ্রহণের নমুনাটি আঁচ করতে পেরেছিলেন।

I.AMARBOI.COM

ঘটনাই অপদেবতাদের কাণ্ড বলে মনে করা হতো। যে কোনো বিপর্যয়কে মনে করা হতো, আমরা কোনো দেবতাকে অসন্তুষ্ট করার ফলেই তা ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রায় ৫,৬০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দের দিকে ওরেগণের মাউন্ট মাজামাতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল– যখন প্রচুর শিলা ও ছাইভস্ম বছরের পর বছর ধরে বেরিয়ে আসে। এরফলে বহু বছরব্যাপী বৃষ্টিপাত এর আগ্নেয় জ্বালামুখে হ্রদের সৃষ্টি করে। ওরেগনের ক্লামাথ ইন্ডিয়ানদের পুরাণ কাহিনিতে এই ভূতাত্ত্বিক ঘটনাটির একটি বিশ্বস্ত চিত্র পাওয়া যায়, যা মানবিক কারণে সৃষ্ট এক বিপর্যয় বলেই চিত্রিত হয়েছে। মানুষের অপরাধবোধ এতটাই প্রবল যে তারা সর্বদাই নিজেদের অপরাধী বলে ভাবার কোনো না কোনো কারণ খুঁজে পায়। পুরাণ কাহিনিটিতে দেখা যায়, পাতালজগতের অধিপতি লাও একজন ক্লামাথ গোত্রপতির সুন্দরী কন্যার প্রেমে পড়ে। সে লাওকে প্রত্যাখ্যান করে, যার প্রতিশোধ হিসেবে লাও ক্লামাথ গোত্রকে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে চায়। পুরাণ কাহিনি অনুসারে, সৌভাগ্যবশত উপরজগতের অধিপতি স্কেল মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পাতাল-অধিপতির সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই দ্বৈরথে লাও আহত হয় এবং মাজামা পাহাড়চূড়ায় আশ্রয়গ্রহণ করে। এর ফলে সেখানে এক বড় গর্ত তৈরি হয়, পরবর্তীকালে যা পানিতে ভরে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাকৃতিক ঘটনাবলির কারণ সম্পর্কে অজ্ঞতা আগেকার দিনের মানুষকে বাধ্য করতো বিভিন্ন দেব-দেবী আবিষ্কার করতে, যারা মানুষের জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করতো। তখন ছিল প্রেম ও যুদ্ধের দেবতা; ছিল সূর্য, পৃথিবী ও আকাশের দেবতা; সাগর আর নদীর দেবতা; ঝড় আর বজ্রের দেবতা; এমনকি ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির দেবতাও। দেবতারা যখন সন্তুষ্ট থাকতেন, মানুষকে তখন তারা উপহার দিতেন ভালো আবহাওয়া ও শান্তি; এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগব্যাধি থেকে মুক্তি। আর যখন তারা রুষ্ট হতেন, তখনই দেখা দিতো খরা, যুদ্ধ, পঙ্গপাল এবং মহামারী। প্রকৃতির কার্যকারণ সম্পর্ক তাদের চোখে অনধীত থাকার ফলেই মনে হত এ সমস্ত দেব-দেবীরা অপ্রতিরোধ্য– মানুষ ছিল তাদের করুণার পাত্র। কিন্তু এ পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করলো প্রায় ২,৬০০ বছর আগে; মিলেটাসের থেলিসের (৬২৪ খ্রিঃ পূঃ-৫৪৬ খ্রিঃ পূঃ) সময় থেকে। সে সময় থেকেই এ ধারণা গড়ে উঠতে লাগলো যে প্রকৃতি নির্দিষ্ট নিয়মাবলি মেনে চলে এবং সে নিয়মগুলোকে অনুধাবন করা সম্ভব। আর তখন থেকেই শুরু হলো সে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মগুলো আবিষ্কার করে দেব-দেবীদের রাজত্বকে বদলে দেয়ার এক দীর্ঘ প্রচেষ্টা। সেই সাথে তৈরি হলো এমন একটি ধারণা যে মহাবিশ্ব প্রকৃতির সূত্রাবলি দিয়ে পরিচালিত হয় এবং তার সৃষ্টি হয়েছিল এমন একটি রূপরেখা দিয়ে, যা আমরা ভবিষ্যতে একদিন জানতে সক্ষম হবো।

মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখি, বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করার পদ্ধতিটি একটি নতুন প্রয়াস। আমাদের প্রজাতি, হোমো সাপিয়েন্সের উদ্ভব হয়েছে প্রায় ২ লাখ বছর আগে, সাব-সাহারান আফ্রিকাতে। লিখিত ভাষার ইতিহাস প্রায় ৭,০০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে, যখন সমাজ ব্যবস্থা দানাশস্যের চাষবাসের উপর নির্ভরশীল হতে শুরু করে (সবচেয়ে পুরোনো লিপিগুলোতে রয়েছে নাগরিকদের প্রাত্যহিক বিয়ারের বরাদ্দ দেয়ার হিসেব)। মহান গ্রিক সভ্যতার সবচেয়ে পুরোনো লিখিত রেকর্ড দেখতে পাই খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতকের, যদিও সে সভ্যতার চূড়ান্ত 'ধ্রুপদী যুগ' আসে আরো কয়েক'শ বছর পর– ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বের সামান্য আগে। এরিস্টোটলের (৩৮৪ খ্রিঃ পূঃ-৩২২ খ্রিঃ পূঃ) মতে, এ সময়টিতেই থেলিস তাঁর ধারণাটি তৈরি করেন যে আমরা জাগতিক ঘটনাবলি বুঝে উঠতে সক্ষম; আমরা আমাদের চারপাশে ঘটতে থাকা জটিল বিষয়গুলোকে সরল সূত্রে আবদ্ধ করতে পারি এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও পৌরাণিক কাহিনি ছাড়াই আমরা সেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারি।

থেলিসকে কৃতিত্ব দেয়া হয় ৫৮৫ খ্রিষ্টপূর্ব সময়ে ঘটা সূর্যগ্রহণের প্রথমবারের মতো ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হওয়ার জন্য; যদিও তাঁর সে সূক্ষ্ম পরিমাপকৃত ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবত তাঁর সৌভাগ্যবশতই ঘটে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন ইতিহাসের এক ছায়া-চরিত্র। তাঁর বাসগৃহটি ছিল একটি সুপরিচিত জ্ঞানকেন্দ্র, যা ছিল আইয়োনিয়া নামক স্থানে; যেখানে গ্রিকরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং সেখান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইয়োনিয়া : প্রাচীন আইয়োনিয়ার পণ্ডিতগণই সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক সংঘটনগুলো প্রকৃতির তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন, কোনোরূপ কল্পকাহিনি বা ধর্মতত্ত্ব বিদ্যা ছাড়াই

AMARBOI.COM

থেকে তাদের প্রভাব তুরস্ক থেকে দূর পশ্চিমে ইতালি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আইয়োনিয়ান বিজ্ঞান প্রাকৃতিক ঘটনাবলিকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম মৌলিক সূত্রাবলি উন্মোচনে প্রচেষ্টা শুরু করে, মানুষের ভাবনার ইতিহাসে যা একটি অভূতপূর্ব মাইলফলক। তাদের পদ্ধতি ছিল যৌক্তিক এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো এমনসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যেগুলো আমরা বর্তমানকালের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছি। সুতরাং, এই শুরুটা ছিল এক মহান প্রচেষ্টার প্রারম্ভ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মহান আইয়োনিয়ান বিজ্ঞানের অনেকটাই পরবর্তীকালে বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যায় এবং পরবর্তী সময় একাধিকবার তা আবার নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়।

লোককাহিনিতে জানা যায়, যাকে আজ আমরা প্রকৃতির সূত্রাবলি (Laws of Nature) বলে আখ্যায়িত করি, তা প্রথমবারের মতো গাণিতিকভাবে সূত্রাবদ্ধ করেন একজন আইয়োনিয়ান বিজ্ঞানী; পিথাগোরাস (৫৮০ খ্রিষ্টপূর্ব-৪৯০ খ্রিঃ পূঃ)। তিনি এখনো তার উপপাদ্যের জন্য বিখ্যাত : সমকোণী ত্রিভুজের অতিবাহুর (সবচেয়ে বড় বাহুটি) উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের আয়তন অন্য বাহু দুটির উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের আয়তনের সমান। মনে করা হয়, পিথাগোরাস এ ছাড়াও আবিষ্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন বাদ্যযন্ত্রের তারের দৈর্ঘ্যের সাথে তার ধ্বনিমাত্রার সম্পর্কটিও। আজকের ভাষায় আমরা সে সম্পর্কটিকে বর্ণনা করতে পারি– একটি নির্দিষ্ট টানে আটক একটি তারের কম্পন-তরঙ্গ (frequency), দৈর্ঘ্যের বিপরীত অনুপাত (inverse proportion) অনুসারে ঘটে। ব্যবহারিক দিক দিয়ে বিচার করলে, কোনো বাস গিটারে একটি সাধারণ গিটার থেকে লম্বা তার থাকে কেন, এটি তা ব্যাখ্যা করে। পিথাগোরাস হয়তো সত্যিই তা আবিষ্কার করেননি– কিন্তু এর প্রমাণ রয়ে গেছে যে তাঁর সময়কালেই তারের দৈর্ঘ্য ও ধ্বনিমাত্রার সম্পর্কটি জানা ছিল। যদি তা-ই হয়, তবে এই সরল গাণিতিক সূত্রকে আমরা পৃথিবীর প্রথম তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা বলে আখ্যা দিতে পারি।

পিথাগোরাসের এই তারের সূত্র ছাড়া প্রাচীন যুগের অন্য আর যে ভৌত সূত্রসমূহ আমরা জানি, সেগুলো হচ্ছে, আর্কিমিডিস (২৮৭ খ্রিঃ পূঃ) প্রণীত তিনটি সূত্র, যিনি নিঃসন্দেহে প্রাচীন যুগের সবচেয়ে নামকরা পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন। বর্তমান যুগের পরিভাষায়, ভারউত্তোলন দন্ডের সূত্রটি (Law of Lever) বোঝায়, প্রয়োগকৃত কম শক্তিকে বহুগুণে বর্ধিত করে ভারী বোঝা তোলা সম্ভব; কারণ তা ভারকেন্দ্র থেকে যত দূরে থাকবে, বলের বৃদ্ধিও তার আনুপাতিক হারে হবে। প্লবতার সূত্র (Law of Buoyancy) ব্যাখ্যা করে যে কোনো কঠিন বস্তুকে তরল পদার্থে নিমজ্জিত করলে তা ঊর্ধ্বমুখী চাপ অনুভব করে, যা সে বস্তুটি কর্তৃক অপসারিত পানির ওজনের সমান। আর প্রতিফলনের সূত্র ব্যাখ্যা করে যে আপতিত রশ্মির কোণ প্রতিফলিত রশ্মির কোণের সমান। আর্কিমিডিস অবশ্য সেগুলোকে সূত্র হিসাবে বর্ণনা করেন নি। এমনকি তিনি সেগুলোকে পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণের ফল বলেও উল্লেখ করেন নি। বরং তিনি সেগুলোকে বিশুদ্ধ গাণিতিক উপপাদ্য (Pure mathematical theorem) বলে গণ্য করেছেন, যেগুলো স্বপ্রমাণিত স্বতঃসিদ্ধ– যেমনটা ইউক্লিড তাঁর জ্যামিতির ক্ষেত্রে মনে করতেন।

আইয়োনিয়ান প্রভাব যতই বিস্তার লাভ করতে লাগলো, অন্যান্য মনীষীরাও ততই অনুধাবন করতে থাকলেন যে মহাবিশ্বের রয়েছে এক আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, যা যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের সহায়তায় আবিষ্কার করা সম্ভব। এ্যানাক্সিমিন্ডার (৬১০ খ্রিঃ পূঃ-৫৪৬ খ্রিঃ পূঃ), যিনি ছিলেন থেলিসের বন্ধু, সম্ভবত তাঁর ছাত্রও; যুক্তি দেখালেন যে মানবশিশু তার জন্মকালে এতটাই অসহায় থাকে যে প্রথম যখন সে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল, তখন তার বেঁচে থাকার কথা ছিল না। এভাবেই বিবর্তনের মূলসূত্র আবিষ্কার করে এ্যানাক্সিমিন্ডার যুক্তি দেন যে মানুষ নিশ্চয়ই অন্য কোনো প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছে, যে প্রাণীদের শাবকেরা আরো কষ্টসহিষ্ণু। সিসিলিতে এম্পেডোক্লেস (৪৯০ খ্রিঃ পূঃ-৪৩০ খ্রিঃ পূঃ) ক্লেপসেডরা নামক যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করলেন। প্রায়শ চামচ বা হাতা হিসেবে ব্যবহৃত এ যন্ত্রটিতে রয়েছে একটি গোলক; যার রয়েছে একটি গলা, যার নিচে রয়েছে একটি ছিদ্র। পানিতে ডুবালে এটি পানিতে ভরে যায়, তখন তার উন্মুক্ত গলা ঢেকে দিলে নিচের ছিদ্র দিয়ে পানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর পড়ে যেতে পারেনা। এম্পেডোক্লেস লক্ষ্য করলেন, যদি এর গলাটিকে পানিতে ডুবানোর আগেই বন্ধ করে রাখা হয়, তবে ক্লেপসেডরাটিতে আর পানি ভরবে না। তিনি যুক্তি দেখালেন যে কিছু একটা বস্তু এর ভেতরে রয়েছে, যার ফলে এরমধ্যে পানি ঢুকতে পারছে না– তিনি সে বস্তুটিই আবিষ্কার করলেন, যাকে আমরা বলি বাতাস।

প্রায় একই সময়ে ডেমোক্রিটাস (৪৬০ খ্রিঃ পূঃ-৩৭০ খ্রিঃ পূঃ), যিনি ছিলেন উত্তর গ্রিসের একটি আইয়োনিয়ান উপনিবেশের অধিবাসী, চিন্তা করলেন একটি বস্তুকে ক্রমাগত ভাঙতে বা কাটতে থাকলে শেষপর্যন্ত তা কী দাঁড়াবে। তিনি যুক্তি দেখালেন যে এই ভাঙন প্রক্রিয়াটি অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চালানো যাবেনা। এর পরিবর্তে তিনি স্বতঃসিদ্ধ বিবেচনা করলেন যে জীবিত পদার্থসহ সবকিছু এমন একটি মৌলিক কণিকা দিয়ে তৈরি, যেগুলোকে আর ভাঙা সম্ভব নয়। তিনি এ সমস্ত চূড়ান্ত কণিকাকে অভিহিত করলেন পরমাণু বা গ্রিক শব্দার্থ (Atom) 'অবিভাজ্য' বলে। ডেমোক্রিটাস বিশ্বাস করতেন যে প্রতিটি বস্তুগত প্রপঞ্চই হচ্ছে পরমাণুর সংঘাতের ফল। তাঁর মতানুসারে, যাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন পরমাণুবাদ (atomism), প্রতিটি পরমাণুই শূন্যে পরিভ্রমণরত এবং তাকে ব্যাঘাত না ঘটানো পর্যন্ত অনির্দিষ্টভাবে তারা তা করতেই থাকে। আমরা আজ এ ধারণাটিকেই অভিহিত করি বস্তুর গতিজড়তার সূত্র (Law of inertia) বলে।

আমরা যে এই মহাবিশ্বের অতি সাধারণ অধিবাসী, এর কেন্দ্রদেশে বাস করা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কিছু নই– এই বৈপ্লবিক ধারণাটির জনক ছিলেন আয়োনিয়ান বিজ্ঞানীদের শেষ প্রজন্মের একজন, এরিষ্টার্কাস (৩১০ খ্রিঃ পূঃ-২৩০ খ্রিঃ পূঃ)। তাঁর একটি মাত্র হিসাব বিবেচনা আজ পর্যন্ত টিকে আছে– চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রপৃষ্ঠে পতিত পৃথিবীর ছায়ার সাবধানী পর্যবেক্ষণলব্ধ একটি জটিল জ্যামিতিক বিশ্লেষণ। তিনি তাঁর উপাত্ত থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে সূর্য অবশ্যই পৃথিবীর থেকে অনেক বড়। বড় বস্তুকেই ছোট বস্তু প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য, এর বিপরীতটি নয়– সম্ভবত এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে যুক্তি দিলেন যে আমাদের পৃথিবী এই গ্রহজগতের কেন্দ্র নয়; বরং তা অন্যান্য গ্রহদের সাথে আয়তনে বৃহত্তর সূর্যকে প্রদক্ষিণরত। আমাদের পৃথিবী যে অন্যান্য গ্রহদের মতোই আর একটি এবং সূর্যও বিশেষ কোনো কিছু নয়, এটা সে উপলব্ধির চেয়ে সামান্যই দূরের পদক্ষেপ। এরিষ্টার্কাস তেমনি একটা কিছু সন্দেহ করলেন এবং বিশ্বাস করলেন যে, রাতের আকাশে আমরা যে তারাদের দেখতে পাই, সেগুলো দূরবর্তী সূর্য ছাড়া আর কিছু নয়।

আইয়োনিয়ানরা ছিল প্রাচীন গ্রিক দর্শনের অনেক মতধারা অনুশীলনের একটি, যার প্রতিটিই একটি অন্যটির চেয়ে ভিন্ন এবং প্রায়শই পরস্পর-বিরোধী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রকৃতি-বিশ্লেষণে এই আইয়োনিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি– যা কিছু সাধারণ সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে ধারণা করা হয়– পরবর্তীকালে এক শক্তিশালী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাব বিস্তার করে রাখলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা মাত্র কয়েকটি শতাব্দী স্থায়ী হয়। এর একটা প্রধান কারণ, আইয়োনিয়ান তত্ত্বসমূহ প্রায়শই দেখায় যে প্রকৃতিতে স্বাধীন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের কোনো ভূমিকা নেই– দেবতারা পৃথিবীতে আমাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মে কোনো হস্তক্ষেপ করে না। এ ধরনের চিন্তা অনেক গ্রিক চিন্তাবিদের কাছেই তখন বিশৃঙ্খল বলে মনে হয়েছে, যেমন আজো তা অনেকের কাছে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, দার্শনিক এপিকিউরাস (৩৪১ খ্রিঃ পূঃ-২৭০ খ্রিঃ পূঃ) পরমাণুবাদকে বিরোধিতা করলেন এই যুক্তিতে যে "প্রাকৃতিক দার্শনিকদের নিয়তির 'দাস' হওয়ার চেয়ে পুরাণ কাহিনির দেবতাদের অনুসরণ করাই উত্তম।" এরিস্টোটল পর্যন্ত পরমাণুর ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ তিনি এটা মেনে নিতে পারছিলেন না যে মানুষ আত্মাহীন, শুধুমাত্র জড়পদার্থের তৈরি। আমাদের মহাবিশ্ব মানব-কেন্দ্রিক কিছু নয়– আইয়োনিয়ান এই ধারণা মহাবিশ্বকে বুঝতে একটি মাইলফলক ছিল; কিন্তু এই ধারণা দ্রুতই পরিত্যাগ করা হয় এবং তা দীর্ঘকাল, অর্থাৎ প্রায় বিশ শতাব্দী পর গ্যালিলিওর সময়কাল পর্যন্ত আর সর্বজন-গৃহীত হয়ে উঠেনি।

প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের অনেক বিবেচনা ছিল গভীর অন্ত:দৃষ্টিসম্পন্ন, তবু প্রাচীন গ্রিকদের বেশির ভাগ ধারণাই আধুনিক বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে প্রকৃত বিজ্ঞান বলে গৃহীত হবেনা। এর কারণ, গ্রিকরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেনি, তাদের মতবাদগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে সত্যতা প্রমাণ করার উপযোগী করে নির্মাণ করা হয়নি। সুতরাং কোনো এক পন্ডিত ব্যক্তি যদি দাবি করেন যে একটি পরমাণু অন্য আর একটি পরমাণুর সাথে ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত সরল পথে চলতে থাকবে, এবং অন্য পন্ডিত ব্যক্তি যদি দাবি করেন যে তা প্রকাণ্ড কিছুর সাথে ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত সরল পথে চলতে থাকবে– এ বিতর্কের সমাধান করার জন্য কোনো ব্যবহারিক পদ্ধতি তখন জানা ছিল না। অধিকন্তু, মানবিক ও ভৌত সূত্রসমূহের মধ্যে কোনো পরিষ্কার পার্থক্য ছিল না। যেমন, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এ্যানাক্সিমিন্ডার লিখলেন যে, সকল পদার্থ একটি প্রাথমিক বস্তু থেকে উদ্ভুত হয় এবং তাতেই প্রত্যাবর্তন করে– এভাবেই তারা "তাদের অন্যায় আচরণের জন্য জরিমানা ও মাশুল প্রদান করে।" আর একজন আইয়োনিয়ান বিজ্ঞানী হেরাক্লিটাসের (৫৩৫ খ্রিঃ পূঃ-৪৭৫ খ্রিঃ পূঃ) মতানুসারে সূর্য যে আচরণ করে, তা এ কারণে যে অন্যথায় ন্যায়বিচারের দেবী তার পশ্চাদ্ধাবন করবে। এর কয়েক শতক পর প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের একটি মতধারা ষ্টয়িক দার্শনিকেরা, যাদের খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতকে দেখা গিয়েছিল, তারা মানবিক সংবিধির সাথে প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের একটি পার্থক্য রচনা করলেন। তবে তারা মানুষের আচরণের নিয়মকে সার্বজনীন বলে বিবেচনা করলেন– এগুলোকে প্রাকৃতিক নিয়মের সারণীতে রাখলেন। অন্যদিকে তারা প্রায়শ ভৌত পদ্ধতিসমূহকে আইনের ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন এবং বিশ্বাস করলেন যে সেগুলোর জন্য প্রয়োজন শক্তিপ্রয়োগ, যদিও এ সমস্ত নিয়ম যাদের পালন করার কথা, তারা জড়বস্তু। যদি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ মনে করেন যে মানুষকেই ট্রাফিক সংকেত মানতে বাধ্য করানো কঠিন, তাহলে কোনো একটি গ্রহাণুকে উপবৃত্তাকার পথ চলতে বাধ্য করানোর বিষয়টি কল্পনা করুন!

গ্রিকদের পর তাদের উত্তরসূরি অন্যান্য চিন্তাবিদদের মাঝেও এই ঐতিহ্য পরবর্তী বহু শতাব্দীব্যাপী চলতে লাগলো। ত্রয়োদশ শতকের আদি খ্রিস্টান দার্শনিক থমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪ খ্রি:) এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই গ্রহণ করলেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণকল্পে একে ব্যবহার করলেন। তিনি লিখলেন, "এটা পরিষ্কার যে (জড়বস্তু) তাদের গন্তব্যে পৌঁছে কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা সুযোগের কারণে নয়, বরং তাদের নিজস্ব ইচ্ছানুসারে। সুতরাং এমন একজন বুদ্ধিমান সত্তা রয়েছেন, যিনি প্রকৃতির সবকিছুকে চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে যাচ্ছেন।" এমনকি আরো পরে, ষোড়শ শতকেও মহান জার্মান জ্যোতির্বিদ জোহানেস কেপলার (১৫৭১–১৬৩০) বিশ্বাস করতেন যে গ্রহসমূহের অনুভূতি ক্ষমতা রয়েছে এবং তাদের মনের ইচ্ছানুসারেই তারা সচেতনভাবে গতির সূত্রসমূহ অনুসরণ করে চলে।

প্রকৃতির সূত্রসমূহ সচেতনভাবে মেনে চলার এই ধারণা থেকে প্রাচীনকালের মনীষীদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রকৃতি 'কেন' এরকম আচরণ করে, তা দেখতে; 'কীভাবে' আচরণ করে, তা দেখতে নয়। এরিস্টোটল এই দৃষ্টিভঙ্গির একজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন, যিনি পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক বিজ্ঞানের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সূক্ষ্ম পরিমাপ ও গাণিতিক হিসাব-নিকাশের উপায় সেই প্রাচীনযুগে খুবই কঠিন ছিল। পাটিগণিতের দশ-ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতি, যাকে আমরা বর্তমানে এতটা কার্যকর বলে দেখতে পাচ্ছি, তা মাত্র ৭০০ বছরের পুরোনো; যখন ভারতীয়রা প্রথম এটাকে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার বলে প্রতিষ্ঠিত করলো। যোগ ও বিয়োগের সঙ্কেতচিহ্ন (abbreviation) পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। একইভাবে সমতাচিহ্ন (equal sign) কিংবা সেকেন্ড পর্যন্ত সময় মাপক ঘড়ির আবিষ্কারও ষোড়শ শতকের আগে হয়নি।

এরিস্টোটল অবশ্য পরিমাণগত ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম একটি পদার্থবিদ্যা নির্মাণ করতে পরিমাপ ও গণিতের হিসাবের সীমাবদ্ধতাকে কোনো প্রতিবন্ধক বলে মনে করতেন না। এমনকি তিনি এটাকে অপ্রয়োজনীয় বলেই বিবেচনা করতেন। এর বিপরীতে তিনি এমন এক পদার্থবিদ্যা নির্মাণ করলেন, যার ভিত্তি তাঁর নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক আবেদনের উপর। যে সমস্ত তথ্য উপাত্ত তাঁর নিজের কাছে অস্বস্তিকর বলে মনে হলো, তিনি সেগুলোকে অবদমিত করে রাখলেন। তিনি তাঁর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখলেন ঘটনাসমূহ ঘটার কারণগুলো আবিষ্কার করতে; ঘটনাসমূহ ঘটার পদ্ধতিটি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করার দিকে নয়। অবশ্য যখন পর্যবেক্ষণের ফলে কোনো ঘটনা তাঁর সিদ্ধান্তের বিপরীত বলে দেখা গেল, তখন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্মূল্যায়ন করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু এই সমন্বয়সাধন প্রায়শই ছিল একটি সাময়িক ব্যাখ্যা, যা জোড়াতালি দেবার মতোই। এভাবে তাঁর তত্ত্বসমূহ প্রকৃত সত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

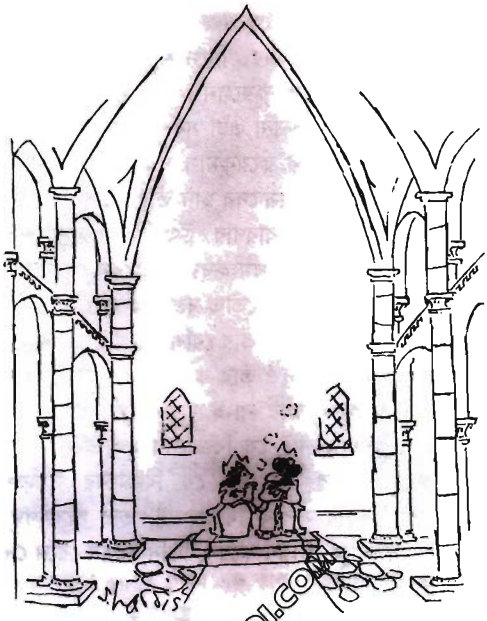

"আমার দীর্ঘ শাসনকালে যদি একটি বিষয়েও আমি জানতে পেরে থাকি, তা হচ্ছে এই যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।"

থেকে যতই দূরে যাক না কেন, সেগুলোর অসঙ্গতি দূর করার প্রয়োজনে তিনি সর্বদাই সেগুলোকে পরিবর্তন করতে রাজি ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর গতির সূত্র বলে যে, ভারী বস্তু তার ভরের আনুপাতিক হারে সমবেগে পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হবে। কিন্তু যখন এটা পরিষ্কারভাবে দেখা গেল যে বস্তুটি যতই পৃথিবীর কাছে আসে, এই পতন ততই দ্রুততর হয়; তখন তিনি একটি নতুন সূত্র আবিষ্কার করলেন– বস্তু তার স্বাভাবিক আশ্রয়স্থলের কাছাকাছি আসলে আরো উৎসাহভরে চলতে থাকে, সুতরাং তার গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের ব্যাখ্যা বর্তমানে জড়বস্তুর জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং কিছুসংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রেই যথাযথ বলে বিবেচিত। এরিস্টোটলের মতবাদগুলোর ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা খুব কম থাকলেও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর মনোভঙ্গি পাশ্চাত্য চিন্তাজগৎকে পরবর্তী প্রায় দু'হাজার বছর ধরে শাসন করে এসেছে।

গ্রিকদের ক্রিস্টান উত্তরসূরিরা এ মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করলো যে মহাবিশ্ব কিছু নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে পরিচালিত হয়। তারা এটাও প্রত্যাখ্যান করলো যে, এ মহাবিশ্বে মানুষ কোনো বিশেষ স্থান অধিকার করে নেই। যদিও মধ্যযুগে কোনো একক সামঞ্জস্যপূর্ণ দার্শনিক মতবাদ ছিল না, কিন্তু একটি

AMARBOI.COM

সার্বজনীন মূলভাব ছিল যে মহাবিশ্ব হচ্ছে ঈশ্বরের পুতুল-খেলাঘর এবং ধর্মের অধ্যয়ন প্রকৃতির অধ্যয়নের চেয়ে অনেক ফলপ্রদ বিষয়। প্যারিসের বিশপ টেম্পিয়ার পোপ একবিংশ জন-এর নির্দেশে নিন্দনীয় ২১৯টি ভ্রান্তি বা ধর্মবিরোধিতার এক তালিকা প্রস্তুত করলেন। এর মধ্যে এ ভাবনাটিও ছিল যে প্রকৃতি নিয়মানুসারে চালিত হয়, কেননা এটা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এর কয়েকমাস পরই পোপ জন মধ্যাকর্ষণ শক্তির ক্রিয়ায় নিহত হলেন; কেননা তাঁর প্রাসাদের ছাদ তাঁরই উপর ভেঙ্গে পড়েছিল।

প্রকৃতির সূত্রসমূহের আধুনিক ধারণার উৎপত্তি সপ্তদশ শতকে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এই ধারণাটিকে প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেন যে বিজ্ঞানী, তিনি হচ্ছেন কেপলার; যদিও আমরা জানি যে তিনি ভৌত বস্তুসমূহকেও সর্বপ্রাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন। গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) তাঁর বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিক কাজসমূহে 'সূত্র' নামক কথাটি উল্লেখ করেন নি (যদিও তাঁর কাজসমূহের অনুবাদে তা দেখা যায়)। তিনি এ শব্দটির ব্যবহার করুন আর না-ই করুন, গ্যালিলিও অনেক মহান সূত্র আবিষ্কার করেছেন এবং পর্যবেক্ষণই যে বিজ্ঞানের মূলভিত্তি, এ মতবাদকে প্রচার করেছেন। তিনি আরো প্রচার করেছেন যে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো ভৌত প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক বিরাজমান, তার গবেষণা করা। কিন্তু যে ব্যক্তিটি প্রথম প্রকৃতির সূত্রসমূহ প্রণয়ন করেন, তিনি হলেন রেনে দেকার্তে (১৬৯৬-১৬৫০)।

দেকার্তে বিশ্বাস করতেন যে প্রতিটি ভৌত প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করতে হবে চলমান বিভিন্ন বস্তুর সংঘর্ষের ফল হিসেবে; যা তিনটি সূত্র দিয়ে ঘটে থাকে– যেগুলো নিউটনের বিখ্যাত তিনটি সূত্রের পূর্বসূরি। তিনি দৃঢ়ভাবে দাবি করেন যে প্রকৃতির এই সূত্রসমূহ সর্বসময়ে, সর্বত্র প্রযোজ্য এবং ব্যাখ্যা করলেন যে এই সূত্রসমূহের প্রতি অনুগত হওয়া মানে এটা বোঝায় না যে এই চলন্ত বস্তুসমূহের মন বলে কিছু রয়েছে। দেকার্তে আরো উপলব্ধি করতে পারলেন তার গুরুত্ব, যাকে আজকাল আমরা 'প্রাথমিক অবস্থা' বলে থাকি। সেগুলোই এমন একটা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে, যা প্রাথমিক অবস্থার উপর নির্ভর করে পরবর্তী যে কোনো সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা দেয়। নির্ধারিত একটি প্রাথমিক অবস্থায় প্রকৃতির সূত্রসমূহ নির্ধারণ করে যে পরবর্তীকালে সময়ের সাথে সাথে একটি পদ্ধতি কীভাবে বিবর্তিত হবে; কিন্তু সেরকম কোনো নির্ধারিত প্রাথমিক অবস্থা ছাড়া এই বিবর্তনকে নির্দিষ্ট করা কিছুতেই সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ, একটি কবুতর শূন্য সময়ে উপর থেকে কিছু একটা সরাসরি নিচে ফেললে সে বস্তুটির পতনের পথটি নিউটনের সূত্রসমূহ দিয়েই নির্ধারিত হবে। তবে শূন্য সময়ে কবুতরটি কী একটি টেলিফোনের তারের উপর স্থির হয়ে বসেছিল, নাকি তা মাথার উপর দিয়ে ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে উড়ে চলেছে– তার উপর নির্ভর করে ফলটি ভিন্ন হবে। পদার্থবিদ্যার নিয়মসমূহ প্রয়োগ করতে হলে একজনকে জানতে হবে কীভাবে একটি পদ্ধতির সূচনা হয়েছে, অথবা

আমার বই পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তত পক্ষে কিছু নির্দিষ্ট সময়ে তার অবস্থা কিরকম (একজন এই সূত্রসমূহকে ব্যবহার করে সময়ের পিছন দিকের ঘটনাও অনুসরণ করতে পারেন)।

প্রকৃতির সূত্রসমূহের অস্তিত্বের এই পুনঃনবায়িত ব্যাখ্যার সাথে সাথে এই সূত্রসমূহকে ঈশ্বর-ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার নতুন প্রচেষ্টাও চালানো হলো। দেকার্তের মতে, ঈশ্বর যে কোনো সময় তাঁর ইচ্ছানুসারে যে কোনো গাণিতিক উপপাদ্য কিংবা নীতিবিদ্যার প্রতিজ্ঞার সত্য বা মিথ্যাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম, কিন্তু প্রকৃতিকে নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির সূত্রসমূহকে ঈশ্বরই প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর কোনো স্বাধীনতা ছিলনা– তাকে এগুলোই বেছে নিতে হয়েছে, কারণ আমরা যেগুলো অনুভব করি, শুধুমাত্র এ সূত্রসমূহেরই অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর। এটা যদিও ঈশ্বরের কর্তৃত্বের উপর আঘাত বলে মনে হয়, কিন্তু দেকার্তে যুক্তি দেখালেন যে এই সূত্রসমূহ অপরিবর্তনীয়, কারণ এগুলো ঈশ্বরেরই সুসঙ্গত প্রকৃতির প্রতিফলন। যদি তা-ই সত্য হয়, তাহলে যে কেউ চিন্তা করতে পারেন যে, প্রতিটি ভিন্ন প্রাথমিক অবস্থার সূত্রসমূহ নিয়ে ভিন্ন প্রকার বিশ্ব সৃষ্টিতে ঈশ্বরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকছে। কিন্তু দেকার্তে সেটিকেও প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন, মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়ে পদার্থের বিন্যাস যা-ই হোক না কেন, সময়ের প্রবাহে আমাদের বর্তমান মহাবিশ্বের সাথে অভিন্ন একটি মহাবিশ্বই হুবহু তেমনি আবির্ভূত হবে। অধিকন্তু দেকার্তে অনুভব করলেন, ঈশ্বর এই বিশ্বকে সূচনা করার পর একে তার নিজস্ব নিয়মে চলতে দিয়েছেন।

প্রায় একই ধরনের অবস্থান (সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া) নিয়েছিলেন আইজাক নিউটন (১৬৪৩-১৭২৭)। নিউটন ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁর গতির ৩টি সূত্র ও মহাকর্ষ বলের আধুনিক ধারণা ও তত্ত্বের জন্য সর্বজনস্বীকৃতি পেয়েছিলেন; যেগুলো পৃথিবী, চাঁদ ও গ্রহসমূহের আবর্তন ও জোয়ার-ভাঁটার কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। যে মুষ্টিমেয় ক'টি সমীকরণ তিনি প্রণয়ন করেছিলেন এবং সেগুলো থেকে আমরা যেসব গাণিতিক কাঠামো রচনা করেছি, সেগুলো এখন পর্যন্ত পড়ানো হয়। এখনো কোনো স্থপতি ইমারত নির্মাণে, কোনো প্রকৌশলী গাড়ি তৈরির নকশায় বা পদার্থবিদ মঙ্গলগ্রহে অবতরণের জন্য নভোযান নির্মাণে এ সমস্ত সমীকরণ ব্যবহার করেন। আলেকজান্ডার পোপ যেমন বলেছেন :

> প্রকৃতি ও তার সূত্রগুলো ঢাকা ছিলো আঁধারে কালো
> ঈশ্বর বললেন 'নিউটন হোক'! আর সব হলো আলো।

বর্তমানে সব বিজ্ঞানীই বলবেন যে প্রকৃতির একটি সূত্রই হচ্ছে নিয়ম, যা সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করে রচিত এবং তাকে ভিত্তি করেই বর্তমান অবস্থা থেকে সামনে এগিয়ে ভবিষ্যতে কী ঘটবে, তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ আমরা আমাদের জীবনে প্রতিদিন সকালে দেখি যে সূর্য পূর্বদিকে উঠে এবং তা থেকেই আমরা এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়মটিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছি যে "সূর্য সর্বদাই পূর্বদিকে উদিত হয়।" এটি একটি সরলীকরণ, যা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের প্রতিদিনকার পর্যবেক্ষণলব্ধ পূর্বাভাস। অন্যদিকে অন্য একটি বক্তব্য– "এ অফিসের কম্পিউটারগুলো কালো"– এটি প্রাকৃতিক সূত্র নয়; কেননা এটি শুধু একটিমাত্র অফিসের ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য। এটি এমন কোনো পূর্বাভাস দেয়না– "যদি এ অফিসটি একটি নতুন কম্পিউটার ক্রয় করে, তবে তা কালো হবে।"

"প্রকৃতির সূত্র" সম্পর্কে আমাদের আধুনিক জ্ঞান এমন একটি বিষয়, যা নিয়ে দার্শনিকেরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, এবং প্রথম ভাবনায় যা মনে হয়, এটা তার চেয়ে অনেক অন্তর্ভেদী প্রশ্ন। উদাহরণস্বরূপ, দার্শনিক জন ডব্লিও ক্যারল দুটো বক্তব্যকে তুলনা করলেন "সমস্ত স্বর্ণগোলক এক মাইলের চেয়ে কম ব্যাসের" এবং অন্যটি "সব ইউরেনিয়াম-২৩৫ গোলক এক মাইলের চেয়ে কম ব্যাসের।" আমাদের বিশ্ববীক্ষণ বলে যে কোনো স্বর্ণগোলকই এক মাইলের চেয়ে বেশি ব্যাসের নয় এবং আমরা যথেষ্ট নিশ্চিত হতে পারি যে তা কখনো হবেনা। তারপরও আমরা পুরোপুরি দৃঢ়মত হতে পারিনা যে সেরকম কোনো একটা গোলক হবেনা, তাই এ বক্তব্যটি কোনো সূত্র বলে বিবেচনা করা হয়না। অন্যদিকে, "সমস্ত ইউরেনিয়াম-২৩৫ গোলকই একমাইল ব্যাসের চেয়ে ছোট"– এ বক্তব্যটিকে একটি প্রাকৃতিক সূত্র বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ যাকে আমরা পরমাণু পদার্থবিদ্যা বলে জানি, তা অনুসারে যে কোনো ইউরেনিয়াম-২৩৫ গোলক ৬ ইঞ্চির চেয়ে বড় হলেই তা একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিজের বিলুপ্তি ঘটাবে। সুতরাং আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে এরকম বৃহৎ কোনো গোলকের অস্তিত্ব নেই (আর সেরকম একটি গোলক বানানোর প্রচেষ্টা কখনো শুভ হবেনা!)। এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি প্রমাণ করে যে আমাদের পর্যবেক্ষণলব্ধ যে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তকে আমরা প্রকৃতির সূত্র বলে চিন্তা করতে পারিনা এবং প্রকৃতির বেশির ভাগ সূত্রই তার একটি বৃহত্তর, আন্তঃসংযুক্ত নিয়ম-পদ্ধতির উপর অস্তিত্বশীল।

আধুনিক বিজ্ঞানে প্রকৃতির সূত্রসমূহকে সাধারণত গাণিতিক পরিভাষায় প্রকাশ করা হয়। সেগুলো হতে পারে হুবহু (exact) অথবা কাছাকাছি (approximate); কিন্তু তাদেরকে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই পর্যবেক্ষণযোগ্য হতে হবে– বিশ্বজনীনভাবে না হলেও অন্ততপক্ষে এক গুচ্ছ শর্তাধীন পরিস্থিতির অধীনে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা এখন জানি যে যদি কোনো বস্তু আলোকবেগের কাছাকাছি গতিতে চলতে থাকে, তবে নিউটনের সূত্রসমূহকে পরিবর্তন করতে হবে। তারপরও আমরা নিউটনের সূত্রগুলোকে সূত্র বলে অভিহিত করি, কারণ যেখানে আলোকবেগের চেয়ে অনেক কম গতিতে ঘটনাবলি ঘটে, সেই প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা ব্যাখ্যায় সেগুলো একটি ভালো সহায়তাকারী।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতি যদি এ সমস্ত সূত্র দিয়েই পরিচালিত হয়ে থাকে, তবে এখানে তিনটি প্রশ্ন দেখা দেবে :

১) সূত্রসমূহের উৎপত্তি কোথা থেকে?
২) সূত্রসমূহের কী কোনো ব্যতিক্রম ঘটা সম্ভব, যেমন অলৌকিক ঘটনা ঘটা?
৩) সম্ভাব্য সূত্রসমূহ কী কেবল একপ্রস্থই (set) রয়েছে?

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর জবাব বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদেরা নানাভাবে দিয়ে এসেছেন। প্রথম প্রশ্নটির চিরায়ত উত্তর– কেপলার, গ্যালিলিও, দেকার্তে ও নিউটন যা দিয়েছেন– যে এ সমস্ত সূত্রগুলো ঈশ্বরের প্রস্তুতকৃত বিধান। কিন্তু এটা ঈশ্বরকে এক প্রাকৃতিক নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ করার মতোই। যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরকে অন্য কোনোভাবে চিত্রিত করা না যায়, যেমন ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর; প্রথম প্রশ্নটির কারণ খুঁজতে ঈশ্বরকে নিয়ে আসাটা একটি রহস্যকে অন্য রহস্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করার মতোই একটা কিছু। সুতরাং আমরা যদি প্রথম প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে ঈশ্বরকে নিয়ে আসি, তাহলে প্রকৃত সমস্যা আসবে দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে : নিয়মের বাইরে গিয়ে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটা কী সম্ভব?

এখানে দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে খুব পরিষ্কার বিভক্তি এসেছে। প্লেটো এবং এরিস্টোটল, অতীতের দুই গুরুত্বপূর্ণ গ্রিক দার্শনিক মনে করতেন যে নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেয়, তাহলে ঈশ্বর শুধু নিয়মসমূহ সৃষ্টিই করেনি; তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি তা মঞ্জুর করে নিয়মের ব্যত্যয়ও ঘটাতে পারেন– যেমন মারাত্মক অসুস্থ রোগিকে সুস্থ করে দেয়া, খরার কারণ দূর করা অথবা অলিম্পিক ক্রীড়া হিসেবে ক্রকেটকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। দেকার্তের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে, সমস্ত খ্রিস্টান চিন্তাবিদেরাই মনে করেন যে, ঈশ্বর অবশ্যই এ সমস্ত নিয়মসমূহ স্থগিত রেখে অলৌকিক কিছু একটা করার ক্ষমতা রাখেন। এমনকি নিউটনও এরকম অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করতেন। তিনি চিন্তা করলেন যে গ্রহগুলোর কক্ষপথ হবে অস্থিতিশীল, কারণ মহাকর্ষবলের আকর্ষণশক্তি সময়ের প্রবাহে গ্রহগুলোকে তাদের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করবে এবং হয় তারা সূর্যের উপর আপতিত হবে অথবা সৌরজগতের বাইরে উড়ে যাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরকে অবশ্যই গ্রহগুলোর কক্ষপথ ঠিক রাখতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে অথবা তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় "স্বর্গীয় ঘড়িকে দম দিতে হবে"। যাহোক, লাপ্লাসের মার্কুইস পিয়েরে সাইমন (১৭৪৯-১৮২৭), যিনি সাধারণ্যে লাপ্লাস নামেই পরিচিত ছিলেন, তিনি যুক্তি দেখালেন যে সময়ের প্রবাহে এই পরিবতন হবে পর্যায়ক্রমিক, পুঞ্জীভূত নয়। এভাবেই সৌরজগৎ নিজেকে পুনর্বিন্যাস করে নেয় এবং তা বর্তমানকাল পর্যন্ত কীভাবে টিঁকে আছে, তা ব্যাখ্যা করতে স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই।

www.amarboi.com

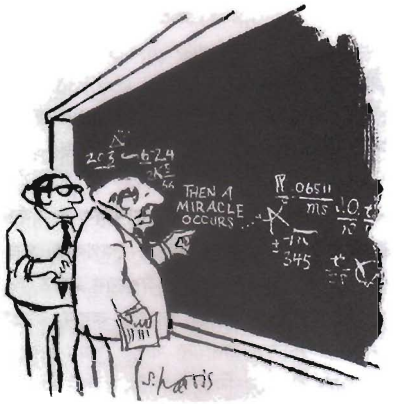

আমার মনে হচ্ছে আপনার দ্বিতীয় ধাপের বর্ণনায় আরো স্পষ্টতা থাকা উচিত।

লাপ্লাসকেই প্রথম কৃতিত্ব দেয়া হয় বৈজ্ঞানিক নিমিত্তবাদ (Scientific determinism) প্রণয়নের : কোনো মুহূর্তে মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট অবস্থা জানা থাকলে সূত্রসমূহের পুরো একটি প্রস্থ (set) মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ এবং অতীত ঘটনাসমূহকে নির্দেশ করতে সক্ষম। এতে সম্ভাব্য কোনো অলৌকিক ঘটনা বা ঈশ্বরের সক্রিয় ভূমিকাকে বর্জন করে। লাপ্লাস আবিষ্কৃত এই বৈজ্ঞানিক নিমিত্তবাদ প্রশ্ন নং ২ এর উত্তরে আধুনিক বিজ্ঞানীদের প্রদত্ত উত্তর। প্রকৃতপক্ষে এটাই সমস্ত আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি এবং এ বইটি জুড়েই একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। একটি বৈজ্ঞানিক সূত্র প্রকৃত সূত্র হতে পারেনা, যদি তা কেবল কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির হস্তক্ষেপ না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকে। এটি অনুভব করেই নেপোলিয়ান একসময়ে লাপ্লাসকে প্রশ্ন করেছিলেন, ঈশ্বর তাঁর চিত্রে কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন? লাপ্লাস উত্তর দিয়েছিলেন : "মহাশয়! আমার এ প্রকল্পের কোনো প্রয়োজন নেই।"

যেহেতু মানুষ এ মহাবিশ্বে বাস করে এবং এর বিভিন্ন বস্তুর সাথে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়, কাজেই বৈজ্ঞানিক নিমিত্তবাদ অবশ্যই তার জন্যও প্রযোজ্য হবে। অবশ্য, অনেকেই মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক নিমিত্তবাদ ভৌত পদ্ধতিসমূহকে পরিচালিত করলেও মানব আচরণের জন্য তা একটি ব্যতিক্রম; কেননা আমাদের রয়েছে স্বাধীন ইচ্ছাক্ষমতা। উদাহরণস্বরূপ, দেকার্তে এই ইচ্ছাক্ষমতার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে দাবি করলেন যে মানবমন ভৌত বিশ্ব থেকে পৃথক একটি বস্তু, যা এর নিয়মসমূহ মেনে চলে না। তাঁর মতে, কোনো বস্তুর দুটো উপাদান রয়েছে– শরীর ও মন। শরীর সাধারণ একটি যন্ত্র ছাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কিছুই নয়, কিন্তু মন কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্রের অধীন বস্তু নয়। দেকার্তে দেহব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও শরীরবিদ্যায় খুবই উৎসাহী ছিলেন এবং মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থি, পিনিয়েল গ্ল্যান্ডকে আত্মার আবাস বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই গ্ল্যান্ডেই আমাদের সমস্ত চিন্তা তৈরি হয় এবং সেখান থেকেই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা উৎসারিত হয়।

মানুষের কী স্বাধীন ইচ্ছাক্ষমতা রয়েছে? যদি তা থেকে থাকে, তবে বিবর্তনের কোন পর্যায়ে তা আবির্ভূত হয়েছে? এ ইচ্ছাক্ষমতা কী নীল-সবুজ শৈবাল অথবা জীবাণুর মধ্যেও রয়েছে; নাকি তাদের আচরণ স্বতশ্চল যান্ত্রিক, যা বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহের আওতাধীন? বহুকোষী জীব সবার মধ্যেই ইচ্ছাক্ষমতা রয়েছে, অথবা তা আছে শুধু স্তন্যপায়ী জীবদের? শিম্পাঞ্জি যখন কলার দিকে ঝাঁপ দেয়, তখন আমরা মনে করতে পারি যে তারা তাদের ইচ্ছাক্ষমতার প্রয়োগ ঘটাচ্ছে। কিন্তু একটি কৃমি Caenorhabditis elegans– যা মাত্র ৯৫৯ কোষ দিয়ে গঠিত একটি সরল জীব, তার ক্ষেত্রে কী হবে? সম্ভবত এটি কখনো চিন্তা করেনা "ওখানে যে জীবাণুটি খেয়েছিলাম, তা ছিল খুবই সুস্বাদু"; কিন্তু তবু দেখা যায় যে তার বিশেষ খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে। হয় সেটি কোনো অনাকর্ষণীয় খাদ্য খেতে স্থির হবে, অথবা তার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে অন্যত্র আরো সুস্বাদু কিছুর সন্ধানে ব্যস্ত হবে। এটাকে কী স্বাধীন ইচ্ছা বলা যাবে?

যদিও আমরা অনুভব করি যে আমরা যা-ই করে থাকি, তা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায়; কিন্তু জীববিজ্ঞানের আণবিক পর্যায়ের জ্ঞান আমাদের জানায় যে জৈব ক্রিয়াসমূহ পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের সূত্রসমূহ দিয়েই পরিচালিত হয়। সুতরাং এ সমস্ত ক্রিয়া গ্রহসমূহের কক্ষপথের মতোই নির্ধারিত। স্নায়ুবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে যে আমাদের ভৌত মস্তিষ্ক জ্ঞাত বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ অনুসরণ করে আমাদের ক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করে– এ সূত্রসমূহের বাইরের কোনো শক্তি তা করেনা। উদাহরণস্বরূপ, জাগ্রত অবস্থায় মস্তিষ্কে অপারেশন করার সময় দেখা গেছে যে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্থানকে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রদান করে রোগিকে হাত, বাহু বা পা নাড়াতে; ঠোঁট নাড়াতে বা কথা বলতে প্রণোদিত করা যায়। আমাদের আচরণ যদি ভৌত সূত্রসমূহ দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে স্বাধীন ইচ্ছা কীভাবে কাজ করবে, তা বোঝা দুষ্কর। তাই মনে করা যায় যে আমরা জৈবযন্ত্র ছাড়া আর কিছু নই এবং আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা একটি বিভ্রম মাত্র।

যদি মানুষের আচরণ প্রকৃতির সূত্রসমূহ দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয় বলে স্বীকার করে নেয়া হয়, তবু এটা যুক্তিপূর্ণ যে চূড়ান্ত বিচারে সেটা এতই জটিল ও শর্ত-নির্ভর যে তার কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। সেটা করতে হলে কাউকে মানবশরীরের হাজার ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন অণুসমূহের প্রাথমিক অবস্থা জানতে হবে এবং সমপরিমাণ সমীকরণ সমাধান করতে হবে। আর তা করতে হলে কয়েক বিলিয়ন বছর প্রয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে, যা সামনের ব্যক্তির করা আঘাত এড়াবার জন্য মাথা নিচু করতে একটু দেরি হয়ে যাওয়ার মতোই ব্যাপার।

যেহেতু অন্তর্গত ভৌত (Effective theory) সূত্রসমূহ ব্যবহার করে মানবিক আচরণের ভবিষ্যদ্বাণী করা একটি অবাস্তব জিনিস, সেক্ষেত্রে আমরা এমন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করি, যাকে বলা হয় কার্যকর তত্ত্ব। পদার্থবিদ্যার এই তত্ত্ব হচ্ছে এমন একটি কাঠামো, যা তার অন্তর্গত সব পদ্ধতিকে বর্ণনা না করেই কিছু দৃশ্য প্রপঞ্চের মডেল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর প্রতিটি পরমাণুর সাথে কোনো ব্যক্তির শরীরের প্রতিটি পরমাণুর মহাকর্ষবলের সমীকরণ করা অসম্ভব। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে পৃথিবী এবং একজন মানুষের মধ্যে মহাকর্ষ বলের আকর্ষণ কিছু সংখ্যা দিয়েই বর্ণনা করা যায়, যেমন ব্যক্তিটির শরীরের মোট ভর। একইভাবে, আমরা জটিল পরমাণু ও অণুর আচরণ বিশ্লেষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমীকরণগুলোর সমাধান করতে পারিনা, কিন্তু আমরা একটি কার্যকর তত্ত্ব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি, যাকে বলা হয় রসায়ন বিদ্যা। এই বিদ্যা আমাদেরকে প্রতিটি অণু-পরমাণুর আচরণ ব্যাখ্যা না করেই কীভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অণু-পরমাণুগুলো আচরণ করে, তা যথেষ্ট ভালো ব্যাখ্যা করে। যেহেতু আমরা আমাদের আচরণ সম্পর্কিত সব সমীকরণ সমাধান করতে অক্ষম, সেখানে মানুষের ক্ষেত্রে আমরা একটি কার্যকর তত্ত্ব ব্যবহার করি যে, মানুষের রয়েছে স্বাধীন ইচ্ছা। আমাদের এই স্বাধীন ইচ্ছা ও তা থেকে উদ্ভূত আচরণ বিশ্লেষণ করাকে বলা হয় মনোবিজ্ঞান। অর্থনীতিও এমন একটি কার্যকর তত্ত্ব, যা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্ভাব্য বিকল্প বিবেচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপে সবচেয়ে উত্তম পন্থাটি বেছে নেয়। সম্ভাব্য আচরণের ভবিষ্যদ্বাণী করতে এই কার্যকর তত্ত্ব শুধুমাত্র আংশিক কার্যকর, কারণ আমরা জানি যে আমাদের সিদ্ধান্ত অনেক সময়ই যৌক্তিক নয় অথবা সেগুলো ঘটনাপ্রবাহের ভুল বিশ্লেষণের মাধ্যমে গৃহীত হয়। আর এজন্যেই পৃথিবী আজ এত সমস্যা ভারাক্রান্ত।

তৃতীয় প্রশ্নটি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে তা হল, মহাবিশ্ব ও মানুষের আচরণসমূহকে যে সূত্রগুলো নির্ধারণ করে, সে সূত্রগুলো অদ্বিতীয় (unique) কিনা। যদি প্রথম প্রশ্নটিতে আপনার উত্তর হয় যে ঈশ্বর এ সমস্ত সূত্র নির্মাণ করেছেন, তাহলে এ প্রশ্নটিও চলে আসে- এ সমস্ত সূত্র বেছে নিতে ঈশ্বরের কী কোনো স্বাধীনতা ছিল? এরিস্টোটল এবং প্লেটো, দুজনেই; পরবর্তীকালে দেকার্তে এবং আইনস্টাইনও বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির নীতিসমূহ শুধুমাত্র 'প্রয়োজনের' খাতিরেই বিদ্যমান। অর্থাৎ এগুলোই হচ্ছে একমাত্র যৌক্তিক বিধিমালা। প্রকৃতির সূত্রসমূহের উদ্ভবের ক্ষেত্রে যুক্তিবিদ্যায় বিশ্বাসের কারণে এরিস্টোটল ও তাঁর শিষ্যরা মনে করতেন যে প্রকৃতি কীভাবে কাজ করে, তার বিশদ অনুসন্ধান না করেই একজন এ সূত্রসমূহ আবিষ্কারে সক্ষম। এ কারণটি এবং কেন বস্তুসমূহ বিধিমালাকে মেনে চলে, তার পরিবর্তে বিধিসমূহ কী, তা নয়- এর উপর নিবদ্ধ দৃষ্টিই তাঁদের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে যায় গুণগত সূত্রের দিকে। সেগুলো প্রায়শ ছিল ভুল এবং অনেক ক্ষেত্রেই খুব কার্যকরী কিছু নয়, যদিও সেগুলো আমাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তায় বহু শতাব্দী ধরে প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। এর অনেক পরে গ্যালিলিওর মতো একজন মানুষ এরিস্টোটলের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহস করলেন এবং প্রকৃতি সত্যিকারভাবে কী করে, তার দিকে দৃষ্টি দিলেন; তার কী করা উচিত, যে যুক্তি সেটার বর্ণনা করে, তার দিকে নয়।

এ বইটির মূল প্রোথিত বৈজ্ঞানিক নিমিত্তবাদের ধারণায়, যা বোঝায় যে ২ নং প্রশ্নের উত্তরটিতে কোনো অলৌকিকত্ব কিংবা নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। আমরা অবশ্য ১ এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের গভীরে যেতে চেষ্টা করবো, কীভাবে বিধিসমূহের উদ্ভব হয় এবং সেগুলোই একমাত্র সূত্র কিনা, তা জানতে। কিন্তু পরবর্তী পরিচ্ছদে প্রথমেই আমরা ব্যাখ্যা করবো, প্রকৃতির নিয়ম বলতে কী বুঝায়? বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই বলবেন যে এগুলো বাইরের বাস্তবতার গাণিতিক প্রতিফলন, যা কোনো দর্শকের অস্তিত্ব ব্যতিরেকেই বিরাজমান। কিন্তু আমরা যেভাবে প্রত্যক্ষ করি এবং পরিপার্শ্ব হতে ধারণা লাভ করি, তাতে আমাদের সেরকম বিশ্বাস করার কী কোনো কারণ রয়েছে যে, একটি বিষয়গত বাস্তবতার অস্তিত্ব সত্যিই রয়েছে? চলুন, এবারে সে প্রশ্নটিতেই ঝাঁকুনি দেয়া যাক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তবতা কী?

কয়েকবছর আগে ইতালির মোনজা শহরের পৌরসভা নাগরিকদের জন্য আইন করে কাঁচের গোলাকৃতি পাত্রে গোল্ডফিস রাখা নিষিদ্ধ করেছে। এ আইনের উদ্যোক্তারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে এরকম বাঁকানো পাশওয়ালা পাত্রে আবদ্ধ মাছগুলো বাইরের পৃথিবীর দৃশ্য বা বাস্তবতাকে বিকৃতভাবে দেখতে পাবে। কিন্তু আমরা কী করে জানি যে আমরা নিজেরাই এই বাস্তবতাকে সঠিকভাবে দেখছি? আমরা নিজেরাই কী এ সমস্ত গোল্ডফিসের মতো কোনো পাত্রে আবদ্ধ নই, যেখানে আমাদের দৃষ্টি, বাইরের কোনো বিশাল লেন্সের ভেতর দিয়ে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে? গোল্ডফিসের বাস্তবতার চিত্র আমাদের চেয়ে আলাদা, কিন্তু আমরা কীভাবে নিশ্চিত হবো যে তা আমাদের চেয়ে কম বাস্তব?

গোল্ডফিসের দৃষ্টি আমাদের দৃষ্টির মতো কিন্তু গোল্ডফিস তার পাত্রের বাইরের পৃথিবীতে বস্তুর গতি যেমন দেখে, তার উপর ভিত্তি করেই বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ নির্মাণ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, বাধা না পাওয়া একটা চলন্ত বস্তু, যাকে আমরা সরলপথে চলতে দেখছি, তা এই বিকৃতির ফলে বাঁকাপথে চলছে বলে গোল্ডফিসের কাছে মনে হবে। যাই হোক না কেন, গোল্ডফিস তার বিকৃত কাঠামো থেকেই বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ তৈরি করতে পারে, যা তার কাছে সঠিক বলে মনে হবে এবং সে সূত্রসমূহে পাত্রের বাইরের বস্তুর চলন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতাও থাকবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তৈরি সূত্রসমূহ জটিলতর হবে, কিন্তু সরলতা শুধুমাত্র একটি রুচির ব্যাপার। গোল্ডফিস যদি এরকম কোনো তত্ত্ব তৈরি করে, আমাদের এটা মেনে নিতে হবে যে, গোল্ডফিসের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে বাস্তবতার একটি যথাযথ চিত্র।

বাস্তবতার বিভিন্ন চিত্রের একটি বিখ্যাত উদাহরণ হচ্ছে ১৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে টলেমির (৮৫-১৬৫ খ্রি:) তৈরি মডেল, যা স্বর্গীয় বস্তুসমূহের গতিপথকে বর্ণনা করে। টলেমি তার সম্পূর্ণ রচনা গ্রন্থবদ্ধ করেন তেরোটি খন্ডে, যার আরবী নাম আলমাজেস্ত। আলমাজেস্ত শুরু হয় সে ধারণার কারণটি ব্যাখ্যা করে; কেন পৃথিবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাকার, স্থির, মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং স্বর্গীয় বস্তুসমূহের দূরত্বের তুলনায় আয়তনে কেন অকিঞ্চিৎকর। এরিষ্টার্কাসের সূর্যকেন্দ্রিক মডেল সত্ত্বেও বেশির ভাগ শিক্ষিত গ্রিকদের মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল, অন্তত এরিষ্টোটলের যুগ হতে, যিনি আধ্যাত্মিক কারণে বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীকে অবশ্যই মহাবিশ্বের কেন্দ্র হতে হবে। টলেমির মডেলে পৃথিবী রয়েছে কেন্দ্রে এবং তারকা ও গ্রহগুলো এর চারদিকে উপবৃত্তের (epicycle) এক জটিল কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে, যা দেখতে চাকার ভিতরে চাকার মতো।

এই মডেলকে আমাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়, কারণ আমরা অনুভব করি না যে আমাদের পায়ের নিচের এই পৃথিবী নড়ছে (শুধুমাত্র মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হলে, অথবা কোনো সময়ে আবেগের বশবর্তী হলে)। পরবর্তীকালে, ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান যেহেতু গ্রিক উৎস থেকেই নির্মিত হয়েছিল, তাই

AMARBOI.COM

টলেমির মহাবিশ্ব : টলেমির মতে আমরা মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরিস্টোটল ও টলেমির এই ধারণাসমূহ পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। টলেমির মহাবিশ্ব মডেল ক্যাথলিক চার্চ অনুমোদন করে এবং পরবর্তী ১৪০০ বছর ধরে চার্চ-স্বীকৃত মতবাদ বলে গৃহীত হয়। যে বছর কোপার্নিকাসের মৃত্যু হয়, সে বছর (যদিও তিনি তাঁর প্রকল্পের উপর কয়েক দশক ধরেই কাজ করছিলেন) যখন তাঁর De Revolutionibus Orbium Coelestium (On the Revolutions of the Celestial Spheres) প্রকাশিত হয়, সেই ১৫৪৩ সনের আগে পর্যন্ত আর কোনো বিকল্প মডেল উপস্থাপন করা হয়নি।

কোপার্নিকাস তাঁর সতের শতক পূর্ববর্তী এরিষ্টার্কাসের মতোই এ বিশ্বকে উপস্থাপন করলেন, সূর্যকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে গ্রহদের পরিভ্রমণরত এক মডেল হিসেবে। যদিও এই ধারণা নতুন কিছু ছিলনা, তবে এই পুনর্জীবন-প্রচেষ্টাকে প্রবল বাধার মুখোমুখি হতে হয়। কোপার্নিকাসের মডেল বাইবেলের মতের বিরুদ্ধাচারণ করে– যাতে বলা হয়েছে যে গ্রহসমূহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে, যদিও বাইবেলে পরিষ্কারভাবে কখনো তা উল্লেখ করা হয়নি। সত্যিকার অর্থে, বাইবেল যখন লেখা হয়, তখন মানুষ বিশ্বাস করতো যে পৃথিবী সমতল। পৃথিবী স্থির কিনা, সে বিষয়ে কোপার্নিকাসের মডেল এক প্রবল বিতর্কের জন্ম দেয়; যার ফলে ১৬৩৩ সনে গ্যালিলিওকে কোপার্নিকাসের মডেল সমর্থন করার অভিযোগে এবং "পবিত্র গ্রন্থের বিপরীত কোনো মতবাদে বিশ্বাস করা ও তাকে রক্ষা করার অপরাধে" অভিযুক্ত করা হয়। তিনি দোষি প্রমাণিত হলেন, আজীবনের জন্য গৃহবন্দি হলেন এবং তাঁকে তাঁর মতবাদ প্রত্যাহার করতে আদেশ দেয়া হলো। বলা হয়ে থাকে, তিনি অস্ফুটস্বরে একবার বলেছিলেন "Eppur si mouve" "কিন্তু তা এখনও ঘুরছে"। রোমান ক্যাথলিক চার্চ ১৯৯২ সনে চূড়ান্তভাবে স্বীকার করে নেয় যে গ্যালিলিওকে অভিযুক্ত করাটা ভুল হয়েছিল।

সুতরাং টলেমি, নাকি কোপার্নিকাসের পদ্ধতি; কোনটা সত্যি? যদিও এটা প্রায়শ দেখা যায় যে কোপার্নিকাস টলেমিকে ভুল প্রমাণ করেছেন বলে মানুষ মনে করে, তবে তা সঠিক নয়। স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গোল্ডফিসের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে আমরা যে রকমটা দেখেছি, একজন এর যে কোনো একটিকে বিশ্বের স্বাভাবিক মডেল বলে ধরে নিতে পারে; কেননা স্বর্গীয় বস্তুসমূহের পর্যবেক্ষণকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি পৃথিবী অথবা সূর্যকে স্থির ধরেই। আমাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কে দার্শনিক বিতর্ক ছাড়াও কোপার্নিকাসের মডেলের প্রকৃত সুবিধা হলো যে সূর্যকে স্থির ভাবলে সে কাঠামোতে গতির সমীকরণ অনেক সহজ বলে প্রতীয়মান হয়।

একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিভিত্তিক ছায়াছবি 'ম্যাট্রিক্স' অনুসারে একটি ভিন্ন ধরনের বিকল্প বাস্তবতা দেখা যায়। এতে মানবজাতি অজ্ঞাতসারেই বসবাস করছে একটি অনুকরণকৃত কার্যতঃ বিচারিত বাস্তবতা (Simulated virtual reality)-এর মধ্যে, যা বুদ্ধিমান কম্পিউটারেরা তাদেরকে শান্ত-সুবোধ ও তুষ্ট করে রাখার জন্য তৈরি করেছে এবং তাদের জৈব-বৈদ্যুতিক শক্তি (তা যা-ই হোক না কেন!) শুষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচ্ছে। সম্ভবত এটা খুব একটা দূরের ব্যাপার নয়, কারণ অনেকেই সিমুলেটেড রিয়ালিটির ওয়েবসাইট, যেমন দ্বিতীয় জীবনে তাদের সময় কাটাতে পছন্দ করেন। আমরা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে, আমরা সত্যি সত্যি কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত কোনো সোপ-অপেরার কুশীলব নই? আমরা যদি কোনো কৃত্রিম কল্পনা-জগতে বাস করি, তাহলে ঘটনাসমূহের কোনো যুক্তি বা সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থিরতা থাকতেই হবে, কিংবা নিয়ম মেনে চলতেই হবে— তা বলা যায়না। সে ক্ষেত্রে যেসব অজানা শক্তি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা আমাদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া, যেমন পূর্ণচাঁদ দু'টুকরো করা কিংবা পৃথিবীতে যারা ডায়েট পালন করছে, তাদের মাঝে ব্যানানা ক্রিম কেকের জন্য অপ্রতিরোধ্য আকুতি দেখে আরো চমৎকৃত হবে। কিন্তু এ সমস্ত অজানাশক্তি যদি প্রকৃতই সুস্থির নিয়মসমূহ আমাদের উপর প্রয়োগ করে, আমরা কিছুতেই বলতে পারবো না এই অনুকরণকৃত বাস্তবতার পিছনেও অন্য কোনো বাস্তবতা রয়েছে কিনা। সে ক্ষেত্রে এটা বলা সহজ যে অজানা শক্তির জগৎটি একটি 'প্রকৃত' জগত এবং কৃত্রিম জগৎটি একটি 'ভুয়া' জগত। কিন্তু যদি সিমুলেটেড জগতের বাসিন্দারা আমাদের মতোই তাদের জগৎকে বাইরে থেকে দেখতে না পারে, তাদের নিজ বাস্তবতার চিত্রকে সন্দেহ করার কোনো কারণ তখন থাকবে না। এটাই এ ধারণার আধুনিক রূপায়ন, যাতে আমরা সবাই অন্য কারো স্বপ্নের কল্পনা মাত্র।

এসমস্ত উদাহরণগুলো আমাদেরকে এ উপসংহারে নিয়ে আসে, যা এ বইয়ে গুরুত্বপূর্ণ : বাস্তবতার কোনো ছবি, বা তত্ত্ব-নিরপেক্ষ ধারণা নেই। তার বদলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবো, যাকে আমরা বলবো মডেল বা প্রতিরূপ-নির্ভর বাস্তবতা : এমন একটি ধারণা যে ভৌত তত্ত্ব বা বিশ্বচিত্র একটি মডেল (সাধারণত একটি গাণিতিক ধরনের) এবং এমন একপ্রস্থ নিয়ম, যা মডেলটির উপাদানসমূহকে পর্যবেক্ষণের সাথে যুক্ত করে। এটি এমন একটি কাঠামো প্রদান করে, যার দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

প্লেটো-পরবর্তী দার্শনিকেরা বাস্তবতার প্রকৃতি সম্পর্কে বহুবছর ধরে বিতর্ক করেছেন। ধ্রুপদী বিজ্ঞান এ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে একটি সত্যিকারের বাস্তব বহির্জগৎ বিরাজমান, যার ধর্মগুলো নির্দিষ্ট এবং যে দর্শক তাকে প্রত্যক্ষ করছে, তার উপর নির্ভরশীল নয়। ধ্রুপদী বিজ্ঞান অনুসারে, কিছু বস্তু বিরাজমান এবং তাদের ভৌতধর্ম রয়েছে, যেমন ভর ও বেগ– যার রয়েছে সুনির্দিষ্ট পরিমাপ। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের তত্ত্বসমূহ হচ্ছে সে সমস্ত বস্তু ও তাদের ধর্মকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা এবং আমাদের পরিমাপ ও অনুভূতি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দর্শক ও দৃশ্যবস্তু– দুটোই এমন এক জগতের অংশ, যার একটি বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে এবং এ দুয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের কোনো অর্থপূর্ণ গুরুত্ব নেই। অন্যকথায়, যদি আপনি দেখতে পান যে পার্কিংয়ের জায়গায় একদল জেব্রা স্থান দখল করার জন্য সংগ্রাম করছে, তাহলে এটি একটি সত্যি ঘটনা যে পার্কিংয়ের জায়গায় একদল জেব্রা স্থান দখল করার জন্য সংগ্রাম করছে। অন্য সমস্ত দর্শকও ঘটনাটিকে একইভাবে দেখবে এবং ঘটনাটি একই রকম থাকবে, যদি তা প্রত্যক্ষ করার জন্য সেখানে কোনো দর্শক না-ও থাকে। এই বিশ্বাসকে দর্শনে বলা হয়ে থাকে বাস্তবতা (Realism)।

বাস্তবতা যদিও একটি প্রলুব্ধকারী দৃষ্টিভঙ্গি বলে বোধ হয়, একে রক্ষা করা আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষে সত্যি দুরূহ, যেমনটা আমরা পরে দেখতে পাবো। উদাহরণস্বরূপ, কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র, যা প্রকৃতির একটি যথাযথ ব্যাখ্যা, তা অনুসারে একটি কণিকার কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান বা বেগ থাকে না, যতক্ষণ সেগুলো কোনো দর্শক পরিমাপ না করে। সুতরাং এটা বলা সঠিক নয় যে একটি পরিমাপ একটি নির্দিষ্ট ফল জন্ম দিচ্ছে, এর কারণ পরিমাপকৃত বস্তুটির মান পরিমাপের সময়টিতে তেমনই ছিল। সত্যিকারভাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কিছু বস্তুর স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্বই নেই, সেগুলো শুধুমাত্র অন্য বস্তুসমূহের সামগ্রিক দৃশ্যের অংশ হিসেবে অস্তিত্বমান। এবং যদি একটি তত্ত্ব, যাকে হোলোগ্রাফিক সূত্র বলা হয়, তা সঠিক প্রমাণিত হয়– তাহলে আমরা এবং আমাদের চতুর্মাত্রিক জগৎ হয়তো একটি বৃহত্তর, পঞ্চমাত্রিক স্থান-কালের পার্শ্বদেশে পতিত ছায়ামাত্র। সে রকম ক্ষেত্রে, মহাবিশ্বে আমাদের স্থান সেই গোল্ডফিসের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রকৃত বাস্তববাদীরা প্রায়শ তর্ক করেন যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ যে বাস্তবতাকে প্রতিনিধিত্ব করে, তার প্রমাণ তাদের সাফল্যের মধ্যে নিহিত। কিন্তু বিভিন্ন তত্ত্ব একই ঘটনাকে বিভিন্ন বিসদৃশ ধারণার কাঠামোর মাধ্যমে সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। সত্যিকার অর্থে, অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যেগুলোকে সত্য বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরে নেয়া হয়েছিল, সেগুলো পরবর্তীকালে আরো অধিক সফল ব্যাখ্যা দ্বারা অধিকতর কার্যকরী, সম্পূর্ণ নতুন বাস্তবতার ধারণার মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

ঐতিহ্যগতভাবে যারা বাস্তবতার ধারণাকে মেনে নেন না, তাদের বলা হয়ে থাকে প্রতিবাস্তবতাবাদী (antirealist)। প্রতিবাস্তবতাবাদীরা তাত্ত্বিক জ্ঞান ও প্রকৃত জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পান। তারা সাধারণত তর্ক করেন যে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ফলপ্রদ, কিন্তু এই তত্ত্বসমূহ প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজের চেয়ে বেশি কিছু নয়, সুতরাং সেগুলো দৃশ্য প্রপঞ্চের গভীরের গুঢ় ব্যাখ্যা প্রদানে অক্ষম। কোনো কোনো প্রতিবাস্তববাদী এমনকি বিজ্ঞানকে শুধুমাত্র দৃশ্যমান বস্তুর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান। সে কারণেই উনিশ শতকের অনেকেই পরমাণুর ধারণাকে এ যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে আমরা কখনও কোনো পরমাণুকে চর্মচক্ষে দেখতে সমর্থ হবো না। জর্জ বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩) এমনকি এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন যে শুধুমাত্র মন ও ভাবনা ছাড়া অন্য কিছুরই অস্তিত্ব আছে বলে মনে করতেন না। খ্যাতনামা বৃটিশ লেখক ও শব্দকোষ-সংকলক ড. স্যামুয়েল জনসনের (১৭০৯-১৭৮৪) এক বন্ধু যখন তাঁকে বললেন যে সম্ভবত মিঃ বার্কলির ধারণাকে অপ্রমাণ করা যাবে না; বলা হয়ে থাকে যে মিঃ জনসন তখন একটি বড় পাথরের কাছে গিয়ে তাকে লাথি মেরে বললেন– "আমি এটাকে এভাবেই অপ্রমাণ করি।" অবশ্যই ড. জনসন তাতে তাঁর পায়ে যে ব্যাথা পেয়েছিলেন, তা তাঁর মনেরই একটি ধারণা; কাজেই তিনি সত্যিকারভাবেই মিঃ বার্কলির ধারণাটিকে অপ্রমাণ করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর এই কাজ আরেক দার্শনিক ডেভিড হিউমের (১৭১১-১৭৭৬) ধারণাকেই ব্যক্ত করে, যিনি লিখেছিলেন যে, যদিও বিষয়গত বাস্তবতাকে (objective reality) বিশ্বাস করার মতো কোনো যৌক্তিক প্রমাণ আমাদের কাছে নেই, সেক্ষেত্রে এটাকে সত্য বলে ধরে নেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায়ও নেই।

মডেল-নির্ভর বাস্তবতা এ সমস্ত বাস্তবতাবাদী ও প্রতিবাস্তবতাবাদী চিন্তাধারার যুক্তিসমূহকে প্রতিদ্বন্দ্বি মডেল-নির্ভর বাস্তবতা অনুসারে মডেলটি সত্য কিনা, সে প্রশ্ন করা গুরুত্বহীন– সেটি পর্যবেক্ষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, শুধুমাত্র তা-ই গুরুত্বপূর্ণ। দুটো পৃথক মডেল যদি একটি পর্যবেক্ষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, যেমন গোল্ডফিসের দেখা ছবি ও আমাদের দেখা ছবি; তখন কেউই বলতে পারেন না যে এর একটি অন্যটির চেয়ে অধিক বাস্তব। সে পরিস্থিতিতে কোনটি অধিক সুবিধাজনক, একজন শুধুমাত্র সে মডেলটি ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ যদি পাত্রের ভিতরে অবস্থান করে, তাহলে গোল্ডফিসের দৃষ্টিভঙ্গিই অধিকতর উপযোগী। কিন্তু যারা এর বাইরে রয়েছে, যেমন বহুদূর জগতের কোনো ছায়াপথ থেকে পৃথিবীর বুকে গোলাকার পাত্রের কাঠামোতে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে সেটি হবে অসুবিধাজনক– কেননা পাত্রটি চলনশীল; পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে এবং তার নিজের অক্ষের চারপাশে ঘূর্ণনরত বলে।

AMARBOI.COM

বিনামূল্যে পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞানে আমরা যেমন মডেল তৈরি করি, তেমনি তা প্রাত্যহিক জীবনেও তৈরি করি। মডেল-নির্ভর বাস্তবতা শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক মডেলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় না, প্রাত্যহিক ঘটনাবলি বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতেও আমরা সজ্ঞান ও অবচেতন মনে মডেল তৈরি করি। জগৎ সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি, যে অনুভূতি তৈরি হয় গ্রাহক স্নায়ু, সেই সাথে আমাদের চিন্তাধারা ও যুক্তি ব্যবহার করে; তা থেকে দর্শক, অর্থাৎ আমাদের নিজেদেরকে বিযুক্ত করার কোনো উপায় আমাদের জানা নেই। আমাদের অনুভূতি এবং যে পর্যবেক্ষণকে ভিত্তি করে আমাদের তত্ত্বসমূহ নির্মিত হয়, সেগুলো প্রত্যক্ষ নয়, বরং তা আমাদের মস্তিষ্কের বিশ্লেষণ-ক্ষমতার লেন্সের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠা।

আমরা যেভাবে বস্তুসমূহকে অনুভব করি, মডেল-নির্ভর বাস্তবতা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। দৃষ্টির ক্ষেত্রে বলা যায়, কারো মস্তিষ্ক তার চোখের স্নায়ু থেকে একটি সিরিজ-সংকেত পায়। টেলিভিশনে যে রকম প্রতিবিম্ব দেখা যায়, এই সংকেতগুলো সেরকম নয়। চোখের স্নায়ু অপটিক নার্ভ যেখানে রেটিনাতে যুক্ত হয়, সেখানে রয়েছে একটি অন্ধকার স্থান। আর দৃষ্টিক্ষেত্রের সবচেয়ে স্বচ্ছ জায়গা হচ্ছে রেটিনার কেন্দ্রস্থলে ১ ডিগ্রির একটি সংকীর্ণ স্থান, যে স্থানটি প্রসারিত হাতের দূরত্বে বুড়ো আঙ্গুলের দখল করা জায়গার সমান। সুতরাং মস্তিষ্কে প্রেরিত স্থূল উপাত্ত হচ্ছে কিছু খারাপভাবে চিত্রিত (badly pixilated) ছবি, যার মাঝখানে একটি ছিদ্র রয়ে গেছে। আমাদের সৌভাগ্যবশত, মানবমস্তিষ্ক সেই উপাত্তকে পুনর্গঠিত করে– দুটো চোখ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তকে মিলিয়ে যার মাধ্যমে সে খালি জায়গাগুলোকে পূরণ করে

AMARBOI.COM

"আপনাদের দুজনেরই একটি বিষয়ে মিল আছে। ড. ডেভিস একটি কণিকা আবিষ্কার করেছেন, যা কেউ দেখেন নি এবং অধ্যাপক হিগ্‌বে একটি গ্যালাক্সি আবিষ্কার করেছেন, যা-ও কেউই দেখেন নি।"

নেয়। অধিকন্তু, একটি দ্বিমাত্রিক উপাত্ত থেকে সে তাকে ত্রিমাত্রিক সংস্করণে পরিবর্তিত করে। অন্যকথায়, আমাদের মস্তিষ্ক সত্যিকারভাবেই একটি মানসিক প্রতিরূপ বা মডেল তৈরি করে নেয়।

আমাদের মস্তিষ্ক এই মডেল তৈরিতে এতটাই সিদ্ধহস্ত যে যদি কাউকে এমন চশমা পরিয়ে রাখা হয় যে সে সবকিছু উল্টো করে দেখবে, কিছু সময় পর তার মস্তিষ্ক সে মডেলটিকে দূরে সরিয়ে নেয়– যার ফলে সে জিনিসগুলোকে আবার সোজাভাবে দেখতে শুরু করে। যদি আবার চশমাটি সরিয়ে নেয়া হয়, তখন সে আবার জগৎকে উল্টো করে দেখতে শুরু করে এবং কিছু সময় পর আবার তাকে শুধরে নেয়। এটা বোঝায় যে, যখন কেউ বলে "আমি একটি চেয়ার দেখি" তখন চেয়ার থেকে ছড়ানো আলোক রশ্মিকে ব্যবহার করে তিনি চেয়ারের একটি মানসিক প্রতবিম্ব বা মডেল তৈরি করেছেন। যদি সে মডেলটি উল্টোভাবে থাকে, কেউ একজন তাতে বসার চেষ্টা করার আগেই তার মস্তিষ্ক তাকে সোজা করে নেবে।

মডেল-নির্ভর বাস্তবতা আরেকটি সমস্যার সমাধান করে, অথবা অন্তত সমস্যাটিকে পরিহার করে; তা হচ্ছে অস্তিত্বের গূঢ় অর্থ। আমি ঘরে যে টেবিলটিকে দেখছি, আমি ঘর থেকে বাইরে চলে গেলেও তা সেখানে রয়েছে কিনা, তা না দেখে আমি কী করে জানবো? আমরা যে বস্তুকণিকাকে দেখতে পাই না, যেমন ইলেকট্রন

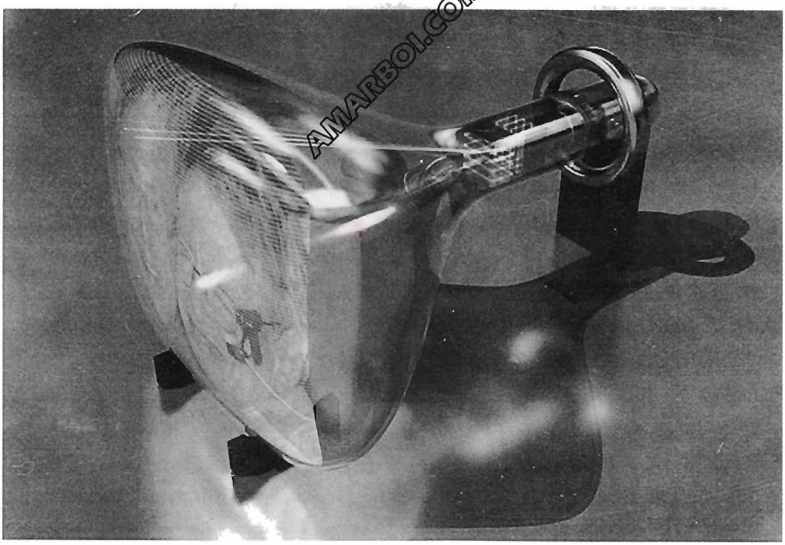
AMARBOI.COM

ক্যাথোড রশ্মি : আমরা প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন ইলেক্ট্রনকে দেখতে পাই না; কিন্তু ইলেক্ট্রন প্রবাহের ফলাফল দেখতে পারি।"

পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও কোয়ার্ক, যেগুলো মিলে তৈরি হয় প্রোটন ও নিউট্রন– একটা মডেল থাকতে পারে, যাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেই টেবিলটি অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং আবার ঘরে ফিরলেই টেবিলটি স্বস্থানে ফিরে আসবে। কিন্তু সেটি হবে বিসদৃশ; আর এ চিত্রটি কেমন হবে– যখন আমি ঘরের বাইরে গেলাম তখন ঘরের ছাদটি ধ্বসে পড়লো? কীভাবে তখন বাইরে-চলে-গেলেই-অদৃশ্য-হয়ে-যাওয়া-টেবিলের মডেলে ঘরে ফিরে আবার টেবিলটিকে দেখতে পাবো, তখন তা কীভাবে ভাঙ্গা ছাদের নিচ থেকে টেনে বের করা ভাঙ্গা টেবিল হবে? কাজেই টেবিলটি তার স্বস্থানেই রয়েছে– এ মডেলটিই বেশি সরল ও পর্যবেক্ষণের সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ মডেলটিকেই আমরা সঠিক মনে করতে পারি।

যাদেরকে আমরা দেখতে অক্ষম, সেই পরমানু-জগতের বস্তুকণিকার ক্ষেত্রে ইলেকট্রন হচ্ছে একটি কার্যকর মডেল, যা বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ, যেমন একটি মেঘ-প্রকোষ্ঠে (cloud chamber) কণিকার গতিপথ, একটি টেলিভিশন টিউবে আলোর বিন্দু এবং সেই সাথে আরো অনেক প্রপঞ্চকেও ব্যাখ্যা করে। বলা হয়ে থাকে, ব্রিটিশ পদার্থবিদ জে. জে. থম্পসন ১৮৯৭ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেনডিস গবেষণাগারে ইলেকট্রন আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বায়ুশূন্য গ্লাস টিউবের ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, যা পরিচিত ক্যাথোড রশ্মি নামে। তাঁর এই পরীক্ষা তাঁকে এক সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে যে এই রহস্যপূর্ণ আলোকরশ্মি ক্ষুদ্র কণিকা (corpuscles) দিয়ে গঠিত, যেগুলো পরমাণুর আভ্যন্তরীণ বস্তুকণিকা– যদিও তখন পরমাণুকেই পদার্থের চূড়ান্ত একক বলে বিবেচনা করা হতো। থম্পসন কোনো ইলেক্ট্রনকে দেখতে পান নি, তাঁর বিবেচনা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিতও হয় নি। কিন্তু তাঁর এই মডেল মৌলিক বিজ্ঞান থেকে প্রকৌশলের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রমাণিত হলো এবং বর্তমানে প্রতিটি পদার্থবিদ এই ইলেক্ট্রনে বিশ্বাস করেন, যদিও তা কেউই দেখতে পায় না!

যাকে আমরা দেখতে পাই না, সেই কোয়ার্কও এমন একটি মডেল, যা পরমাণু কেন্দ্রে প্রোটন ও নিউট্রনের আচরণ ব্যাখ্যা করতে সহায়ক। যদিও বলা হয়ে থাকে যে প্রোটন ও নিউট্রন কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত, আমরা কখনো কোনো কোয়ার্ককে দেখতে পাবো না। কারণ কোয়ার্কগুলো বিচ্ছিন্ন হলেই তাদের আভ্যন্তরীণ বন্ধনশক্তি বাড়তে থাকে– ফলে প্রকৃতিতে কোনো বিচ্ছিন্ন কোয়ার্ক অস্তিত্বমান থাকতে পারে না। এর পরিবর্তে, সেগুলো সবসময় ৩টির একটি দলে থাকে (প্রোটন ও নিউট্রন) অথবা কোয়ার্ক ও এন্টিকোয়ার্কের জোড়ায় (পাই মেসন) থাকে। তারা এমন আচরণ করতে থাকে যেন তারা রাবার ব্যান্ড দিয়ে জোড়া লাগানো।

কোয়ার্ককে কখনো আলাদা করে পাওয়া যাবে না, তাই প্রথম কোয়ার্ক মডেল আসার পর কোয়ার্ক সত্যিকার অর্থে অস্তিত্বশীল কিনা, এ প্রশ্ন উত্থাপন সত্যি একটি বিতর্কিত বিষয় ছিল। কিছু বস্তুকণিকা অব-অবকেন্দ্রিণ কণিকার (sub-sub nuclear particle) বিভিন্ন উপাদান সহযোগে তৈরি– এই প্রস্তাবনাটি তাদের আচরণ ও ধর্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে সরল ও আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম হলো। শুধুমাত্র পরিসংখ্যানগত উপাত্ত থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা বস্তুকণিকার ধারণায় পদার্থবিদেরা অভ্যস্ত হলেও যাকে কখনো চোখে দেখা সম্ভব নয়, তার অস্তিত্ব দাবি করা অনেক পদার্থবিদের কাছেই খুব বেশি চাওয়া মনে হতে লাগলো। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই কোয়ার্ক মডেল আরো যত বেশি করে কার্যকর ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হলো, ততই এই বিরোধিতা ম্লান হতে লাগলো। নিশ্চিতভাবে কোনো ভিন্নগ্রহের তাদের ১৭টি বাহু, অবলোহিত চোখ এবং কান দিয়ে জমানো ক্রিম নিঃসরণ করার মতো কিছু ভিন্নগ্রহের আগন্তুক আমাদের মতো একই ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম, কিন্তু কোয়ার্ক ছাড়াই তারা হয়তো এটাকে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ। তা সত্ত্বেও মডেল-নির্ভর বাস্তবতা অনুসারে এমন একটি মডেলে কোয়ার্ক অস্তিত্বমান, যা অবকেন্দ্রিণ বস্তুকণিকার আচরণের ক্ষেত্রে আমাদের পর্যবেক্ষণকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করে।

মডেল-নির্ভর বাস্তবতা এ প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটি কাঠামো প্রদান করে : যদি একটি নির্দিষ্ট সময় আগে বিশ্ব সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তাহলে তার আগে কী ছিল? প্রথম দিককার একজন খ্রিস্টান দার্শনিক সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০ খ্রিঃ) এর উত্তরে বললেন যে এ প্রশ্নের উত্তর এটা নয় যে ঈশ্বর সে সময়ে এ ধরনের প্রশ্নকারীদের জন্য নরক তৈরি করছিলেন। বরং সময় হচ্ছে সৃষ্ট মহাবিশ্বেরই একটি ধর্ম

AMARBOI.COM

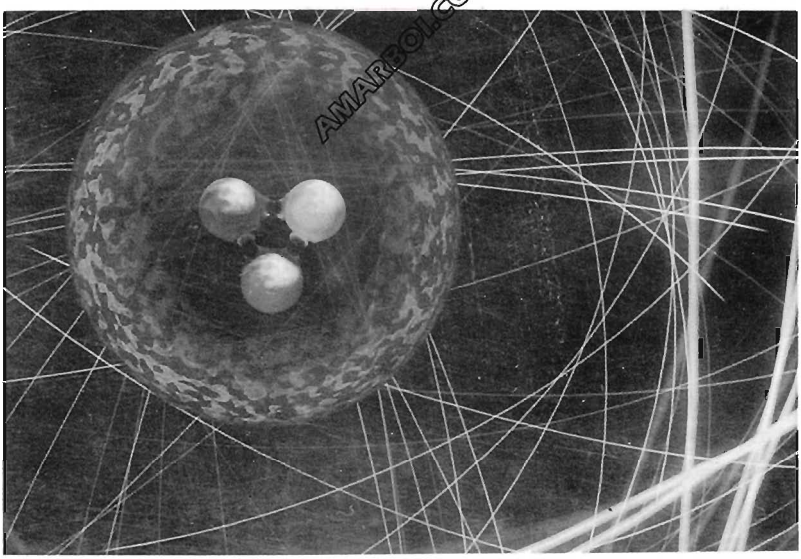

কোয়ার্ক : মৌলিক পদার্থবিজ্ঞানে কোয়ার্কের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ, যদিও কোয়ার্ক দেখা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং তা সৃষ্টি হওয়ার আগে সময় বলতে কিছু ছিল না– যা তিনি খুব বেশি আগের ঘটনা বলেও মনে করতেন না। এটি একটি সম্ভাব্য মডেল, যা তারা পছন্দ করেন, যারা মনে করেন যে জেনেসিসে উল্লেখিত বয়ান আক্ষরিক অর্থেই সত্য; যদিও প্রাপ্ত ফসিল ও অন্যান্য প্রমাণ থেকে একে আরো বেশি প্রাচীন মনে হয় (সেগুলো কী আমাদের বোকা বানানোর জন্যই রাখা হয়েছে?)। কেউ একজন অবশ্য একটি পৃথক মডেলেও বিশ্বাস করতে পারেন, যেখানে সময় পিছন দিকে প্রবাহিত হতে হতে ১৩.৭ বিলিয়ন বছর পর বিগব্যাংগের জন্ম। এটাই আমাদের বর্তমান পর্যবেক্ষণকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে এবং পৃথিবীর ঐতিহাসিক ও ভূতাত্ত্বিক প্রমাণকেও আমাদের অতীতের সবচেয়ে উত্তম চিত্র বলে ব্যাখ্যা করে। এই দ্বিতীয় মডেলটিই জীবাশ্ম ও তেজস্ক্রিয় নথি-প্রমাণকে এবং আমরা যে মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত ছায়াপথ থেকে আলো আসতে দেখি, এ সত্যসমূহকে ব্যাখ্যা করে। তাই এই বিগব্যাংগ তত্ত্ব প্রথমটির চেয়ে অধিক কার্যকরী। তবু এদের যে কোনো একটিকে অন্যটির চেয়ে অধিক বাস্তব বলে দাবি করা যাবে না।

কিছু লোক আরো একটি মডেলকে সমর্থন করেন, যাতে সময় এমনকি বিগব্যাংগের চেয়েও পিছনে গমন করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে মহাবিশ্বের বিবর্তনের সূত্রসমূহ যখন বিগব্যাংগের সময়ে ভেঙ্গে পড়ে, সময় সেখানে বিগব্যাংগের পরও প্রবাহিত হয়– এ ধারণা আমাদের পর্যবেক্ষণকৃত বিশ্বকে ব্যাখ্যায় আরো কার্যকরী কিনা, তা পরিষ্কার নয়। যদি তা-ই হয়, তাহলে এরকম একটা মডেল, যেখানে বিগব্যাংগের আগেও সময় বেষ্টন করে আছে– তার কোনো মানে থাকবে না। কারণ তখন কী ছিল, তার কোনো পর্যবেক্ষণযোগ্য ফল বর্তমান সময়ের উপর নেই। কাজেই বিগব্যাংগের মাধ্যমেই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে– এ ধারণায় আমরা নিশ্চিত হতে পারি।

একটি মডেল তখনই সঠিক বিবেচিত হবে, যদি :

১. তা প্রাঞ্জল (elegant) হয়
২. তাতে সামান্যই ইচ্ছানুসারে সমন্বয়সাধন (arbitrary and adjustable) করার উপাদান থাকে
৩. বর্তমানের সমস্ত পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করে এবং তার সাথে একমত হয়
৪. ভবিষ্যৎ পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণী করে। যদি সেগুলো না ঘটে, তাহলে মডেলটি অকার্যকর প্রমাণিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, এরিস্টোটলের তত্ত্ব যে, বিশ্বপ্রকৃতি চারটি মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত– মাটি, পানি, বায়ু ও আগুন এবং বস্তু তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজ করে– তা প্রাঞ্জল এবং ইচ্ছানুসারে সমন্বয় সাধনের কোনো উপাদান তাতে নেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এটি কোনো নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করে না, এবং যখন তা করে, সে সমস্ত ভবিষ্যবাণীকে পর্যবেক্ষণে সবসময় সঠিক বলেও দেখা যায় না। এরকমই একটি ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে ভারী বস্তু দ্রুত মাটিতে পড়ে– কারণ তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে পতন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্যালিলিওর আগে এটাকে পরীক্ষা করে দেখাটা কেউ গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবে নি। একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, তিনি পিসার হেলানো মন্দির থেকে বিভিন্ন ওজন নিচে ফেলে তা পরীক্ষা করেন। সম্ভবত এটি একটি অতিকথন; কিন্তু আমরা জানি যে তিনি হেলানো তল থেকে বিভিন্ন ওজন ঝুলিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন, যে তারা একই সময়ে ত্বরণপ্রাপ্ত হয়– যা এরিস্টোটলের ভবিষ্যদ্বাণীর বিপরীত চিত্র।

তবে উপরের এই বিচার নীতি সম্পূর্ণ ব্যক্তি-নির্ভর। প্রাঞ্জলতাকে সহজে পরিমাপ করা যায় না, যদিও বিজ্ঞানীমহলে তা খুবই উচ্চ মূল্যায়িত। এর কারণ, প্রকৃতির নিয়মসমূহ অনেক কিছুকে একত্রিত করে একটি সহজ সূত্রে নিয়ে আসতে সাহায্য করে। প্রাঞ্জলতা তত্ত্বেরই একটি রূপ, কিন্তু এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে ইচ্ছানুসারে সমন্বয়সাধনের উপাদান না থাকার সাথে; কারণ একটি তত্ত্ব বাজে ধরনের কারণ দিয়ে পূর্ণ থাকলে তা খুব একটা প্রাঞ্জল হয় না। আইনস্টাইনকে উদ্ধৃত করলে বলা যায়, একটি তত্ত্বকে যতটা সম্ভব সরল হতে হবে, কিন্তু এর চেয়ে সরলতর নয়। গ্রহসমূহের বৃত্তাকার গতিপথকে সূক্ষ্মমাত্রায় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে টলেমি তাতে উপবৃত্ত (epicycle) যোগ করলেন। সে মডেলকে আরো নিখুঁত করা যায় তাতে উপবৃত্তের উপবৃত্ত, এমনকি তস্য উপবৃত্ত যোগ করে। এই জটিলতা যোগ করার ফলে মডেলটি যদিও আরো সূক্ষ্ম হয়ে উঠে, বিজ্ঞানীরা তাকে একটি কার্যকর নীতির ধারক তত্ত্বের চেয়ে একটি উপাত্তের নির্ঘণ্ট (catalogue of data) বলেই মনে করে থাকেন।

পরবর্তী ৫নং পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাবো, যে "ষ্ট্যান্ডার্ড মডেল" প্রকৃতির মৌলিক কণিকাসমূহের মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করে, তাকে অনেকের কাছেই প্রাঞ্জল বলে মনে হয়। এ মডেল টলেমির উপবৃত্তের চেয়ে অনেক বেশি সফল। এগুলো কিছু মৌলিক কণিকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল আবিস্কৃত হওয়ার আগেই, এবং কয়েক দশক ধরে অনেক ব্যবহারিক পরীক্ষায় সেগুলোর সত্যতাও খুব সুক্ষ্মভাবে মিলে গেছে। কিন্তু এগুলোতে রয়ে গেছে ইচ্ছানুসারে সমন্বয়সাধন করার (adjustable parameter) ডজন ডজন উপাদান, যাদের মান তত্ত্ব দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে পর্যবেক্ষণের সাথে সঙ্গতি রেখে ঠিক করতে হয়।

চতুর্থ বিবেচ্য প্রসঙ্গে বলা যায়, যখনই নতুন কোনো হতভম্বকর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়, বিজ্ঞানীরা সর্বদাই অভিভূত হন। অন্যদিকে যখন কোনো মডেলে কোনো ঘাটতি দৃষ্টিগোচর হয়, তখন একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া হল এটা বলা যে পরীক্ষাটি ভুল ছিল। যদি তা না হয়ে থাকে, মানুষ তখন সে মডেলটিকে পরিত্যাগ না করে বরং তাকে নানাভাবে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে বাঁচাবার চেষ্টা করে। যে সমস্ত তত্ত্বকে বিজ্ঞানীরা পছন্দ করেন, সেগুলোকে বাঁচাতে তারা সত্যি প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালান। তত্ত্বকে বাঁচাতে গিয়ে এই সংস্কার তাকে এতটাই ম্লান করে দেয় যে এর ফলে তা হয়ে পড়ে কৃত্রিম বা কষ্টকল্পনা, সুতরাং তা "প্রাঞ্জল" নয়।

AMARBOI.COM

আমারবই.কম পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন পর্যবেক্ষণকে স্থান দিতে গিয়ে এই সংস্কার যদি বেশি চটকদার হয়, তখনই নতুন একটি মডেলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পুরোনো মডেলের এমনই একটি উদাহরণ হচ্ছে স্থির মহাবিশ্বের (static universe) ধারণা, যা নতুন পর্যবেক্ষণের ফলে বাতিল হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ পদার্থবিদ ১৯২০-এর দশকে মনে করতেন যে মহাবিশ্ব স্থির এবং আয়তনে অপরিবর্তনশীল। পরে ১৯২৯ সনে এডুইন হাব্‌ল তাঁর পর্যবেক্ষণে দেখলেন যে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু হাব্‌ল মহাবিশ্বকে প্রসারিত হতে প্রত্যক্ষভাবে দেখেননি। তিনি ছায়াপথসমূহের বিকিরিত আলোকরশ্মি দেখলেন। এই আলো একটি বৈশিষ্ট্যমূলক দস্তখত বা বর্ণালী (spectrum) বহন করে, যা প্রতিটি ছায়াপথের গঠন-উপাদানের উপর ভিত্তি করে আমাদের থেকে কতটুকু দূরে সরে যাচ্ছে, তার অনুপাতে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং দূর ছায়াপথগুলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে হাব্‌ল তাদের গতিবেগ মাপতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে যতগুলো ছায়াপথ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ঠিক ততগুলোই আবার আমাদের কাছে সরে আসছে বলে দেখতে পাবেন। কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি দেখলেন যে সমস্ত ছায়াপথগুলোই আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এবং সেগুলো যত দূরে রয়েছে, তারা তত দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। হাব্‌ল সিদ্ধান্তে আসলেন যে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, কিন্তু অন্য যারা পুরোনো মডেলকে আঁকড়ে ছিলেন, তারা এই পর্যবেক্ষণকে স্থির মহাবিশ্বের আলোকেই ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। উদাহরণ স্বরূপ, ক্যালটেক পদার্থবিদ ফ্রিট্‌জ জ্যুইকি প্রস্তাব করলেন যে কোনো অজানা কারণে অতিদূর পরিভ্রমণরত আলো তার শক্তি হারাচ্ছে। এই শক্তি হ্রাসই আলোর বর্ণালীতে পরিবর্তন আনছে বলে জ্যুইকি হাব্‌লের পর্যবেক্ষণের কারণ বলে মনে করলেন। হাব্‌লের অনেক দশক পরও অনেক বিজ্ঞানী স্থির মহাবিশ্বের মতবাদকেই আঁকড়ে রইলেন। কিন্তু হাব্‌লের প্রসারমান মহাবিশ্বের মডেলটিই সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং তা বর্তমানে সর্বজনগৃহীত।

মহাবিশ্বকে কোন সূত্রসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে, তা নির্ধারণ করতে আমরা অনেক তত্ত্ব বা মডেল প্রণয়ন করেছি– যেমন চারটি মৌল উপাদানের মতবাদ, টলেমির মডেল, ফ্লজিস্টন মতবাদ, বিগব্যাংগ তত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতিটি মতবাদ বা মডেলের সাথে সাথে বাস্তবতা এবং মহাবিশ্বের মৌলিক উপাদান সম্পর্কিত আমাদের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক আলোকতত্ত্ব। নিউটন বিশ্বাস করতেন যে আলো ক্ষুদ্র কণিকা (particle বা corpuscles) দিয়ে গঠিত। আলো কেন সরলপথে চলে, এটা তা ব্যাখ্যা করে। আলো কীভাবে এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যম, যেমন বাতাস থেকে গ্লাসে বা বাতাস থেকে পানিতে যাওয়ার সময় বেঁকে যায় বা প্রতিসরিত হয়, নিউটন তা-ও ব্যাখ্যা করলেন।

কিন্তু এই কণিকাতত্ত্ব আর একটি পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হলো, যে প্রপঞ্চটি নিউটন নিজেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তা নিউটনের বৃত্ত বা আংটি (Newton's ring) বলে পরিচিত। একটি প্রতিফলক প্লেটের উপর একটি লেন্স স্থাপন করে তার উপর একটি একরঙা আলো, যেমন সোডিয়াম আলো ফেলা যাক। উপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে নিচে কেউ তাকিয়ে দেখলে একটি হালকা ও গাঢ় আংটির সিরিজ দেখতে পাবে, যার কেন্দ্র হচ্ছে লেন্সটি যেখানে তলদেশ স্পর্শ করেছে। এটি আলোর কণিকাতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা কঠিন, কিন্তু আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা সহজ।

আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব অনুসারে হালকা ও গাঢ় আংটিগুলো এমন একটি প্রপঞ্চ দিয়ে ঘটে, যাকে বলা হয় ব্যতিচার (interference)। একটি তরঙ্গ, যেমন জলতরঙ্গ হচ্ছে চূড়া ও খাদের একটি সিরিজ। যখন তরঙ্গসমূহের সংঘর্ষ ঘটে, তখন এই চূড়া ও খাদসমূহ মিলিত হয়ে একে অন্যকে শক্তিশালী করে– ফলে আরো বড় তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় গঠনমূলক ব্যতিচার (constructive interference) এ ক্ষেত্রে তরঙ্গসমুহ "in phase"-এ রয়েছে বলা হয়। এর অন্য প্রান্তে তাকালে, যখন তরঙ্গসমূহ মিলিত হয়, তখন একটি তরঙ্গের চূড়া অন্য একটি তরঙ্গের খাদের সাথেও মিলিত হতে পারে। সেরকম ক্ষেত্রে তরঙ্গসমূহ একটি অন্যটির বিলুপ্তি ঘটায়, যাকে বলা হয় "out of phase"। এর রকম অবস্থাটিকে বলা হয় বিনাশকারী ব্যতিচার (destructive interference)।

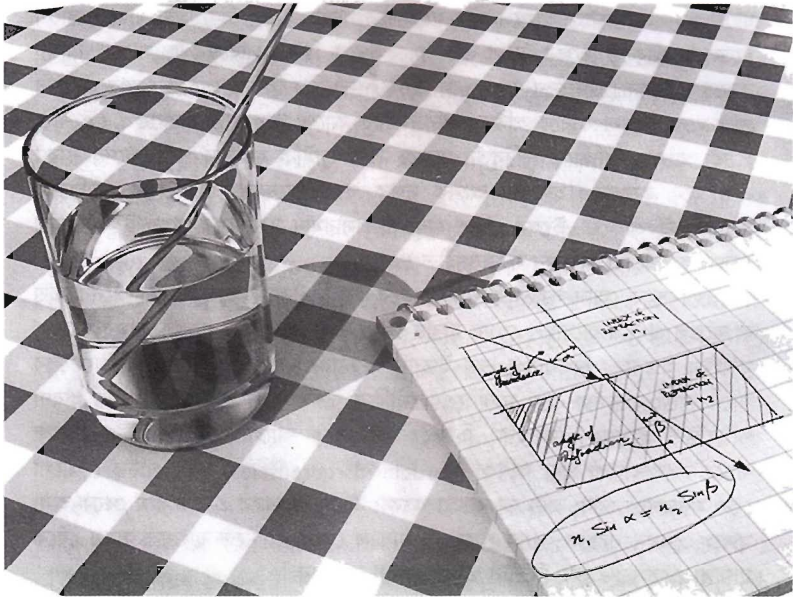

প্রতিসরণ : আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে গেলে কেন বেঁকে যায়, তা নিউটনের আলোর মডেলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু আমরা এখন যাকে নিউটনের আংটি বলি তার ব্যাখ্যা ঐ মডেলের সম্ভব নয়।

বিনামূল্যের পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিউটনের আংটির উজ্জ্বল বৃত্তগুলো কেন্দ্র থেকে এমন দূরে অবস্থান করে, যেখানে লেন্স থেকে প্রতিফলক প্লেটের প্রতিফলিত তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে একটি অখন্ড সংখ্যার (integral) (১, ২, ৩, ...) তরঙ্গদৈর্ঘ্য, যা গঠনমূলক ব্যতিচার তৈরি করে (একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য হচ্ছে– একটি তরঙ্গের চূড়া বা খাদ থেকে অন্যটির দূরত্ব)। অন্যদিকে গাঢ় রিংগুলো কেন্দ্র থেকে এমন দূরে অবস্থান করে, যেখানে দুটো প্রতিফলিত তরঙ্গের বিভাজন একটি অর্ধ-অখন্ড সংখ্যার (half integral) (১/২, ১^{১}/$_{২}$, ২^{১}/$_{২}$, ...) তরঙ্গদৈর্ঘ্য যা বিনাশকারী ব্যতিচার তৈরি করে– লেন্স থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ প্লেট থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গের বিলুপ্তি ঘটায়।

উনবিংশ শতকে এ ঘটনাটিকে আলোর তরঙ্গতত্ত্বের নিশ্চিত প্রমাণ বলে ধরা হতো এবং প্রমাণ করা হতো যে কণিকাতত্ত্ব ভুল। কিন্তু বিশশতকের প্রথম দিকে আইনস্টাইন দেখালেন যে ফটোইলেকট্রিক প্রতিক্রিয়ায় এভাবে ব্যাখ্যা করা যন্ত্র (যা এখন টেলিভিশন ও ডিজিটাল ক্যামেরাতে ব্যবহৃত হয়), কণিকা বা আলোর কোয়ান্টাম একটি পরমাণুকে আঘাত করে একটি ইলেকট্রনকে বের করে দিচ্ছে। সুতরাং আলো কণিকা ও তরঙ্গ, উভয়ের মতোই আচরণ করে।

সম্ভবত সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে, অথবা পানিতে ঢিল ছোঁড়ার পর তার অবস্থা দেখে মানুষের চিন্তায় তরঙ্গের ধারণা আসে। আপনি যদি কখনো একটি ডোবায় দুটি ঢিল একসাথে ছুঁড়ে থাকেন, তাহলে হয়তো দেখেছেন তা কীভাবে ব্যতিচার (interference) তৈরি করে, যে রকমটা হয়েছে ৫৪ পৃষ্ঠার ছবিটির ক্ষেত্রে। অন্য তরলপদার্থের ক্ষেত্রেও একই আচরণ গ্রহণ করে। কণিকার ধারণাটি পরিচিত ছিল পাথর, নুড়ি বা বালু থেকে। কিন্তু এই তরঙ্গ/কণিকা দ্বৈততত্ত্ব– এ রকম ধারণা যে কোনো বস্তুকে একই সাথে কণিকা বা তরঙ্গ বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে– এটা আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সাথে এতটাই বিসদৃশ, যেন আপনি একমুঠো বালি পান করছেন।

AMARBOI.COM

এ রকম দ্বৈততা– যেখানে দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মতবাদ প্রকৃতপক্ষে একই প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করে– যা আমাদের মডেল-নির্ভর বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রতিটি মতবাদ কিছু নির্দিষ্ট ধর্মকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারে এবং এর কোনো একটিকেই অন্যটির চেয়ে অধিক বাস্তব বা কার্যকর বলা যাবে না। মহাবিশ্বের পরিচালন-সূত্রগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যা বলতে পারি : মহাবিশ্বের প্রতিটি দিক কোনো একক গাণিতিক মডেল বা তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এর পরিবর্তে, এ বইয়ের প্রথম পরিচ্ছদে যেমন বলা হয়েছে, সেরকম একটি তত্ত্বের আন্তঃসংযোগ (network) রয়েছে, যাকে বলা হয় M-তত্ত্ব। এই M-তত্ত্ব নেটওয়ার্কের প্রতিটি তত্ত্ব একটি নির্দিষ্ট পরিধির প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করতে উপযোগী। তাদের পরিধি যেখানে একে অপরকে স্পর্শ করে, এই নেটওয়ার্কের বিভিন্ন তত্ত্ব সেখানে সায় দেয়– সুতরাং এর সবগুলোকে একটি তত্ত্বেরই অংশবিশেষ বলা যায়। কিন্তু এই নেটওয়ার্কের কোনো একক তত্ত্বই মহাবিশ্বের প্রতিটি দিক ব্যাখ্যা করতে পারে না– যেমন প্রকৃতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

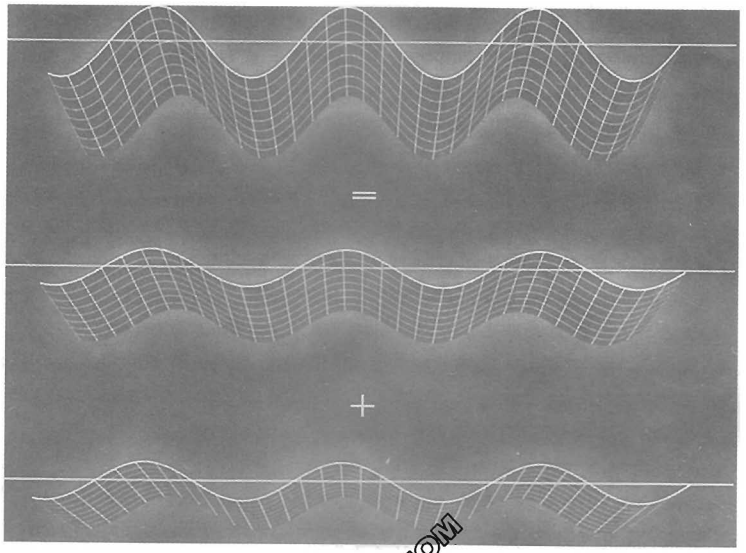

AMARBOI.COM

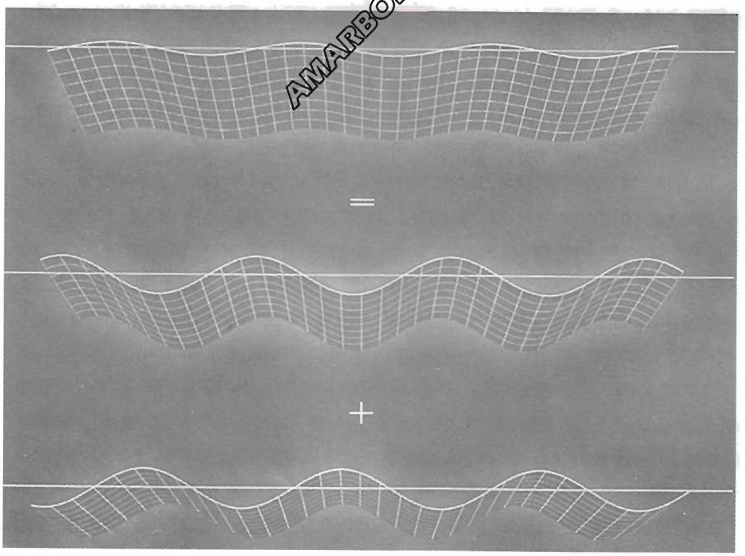

ব্যতিচার (Interference) : মানুষের মতোই যখন ঢেউ একটি অপরটির সংস্পর্শে আসে তখন তা বড় হতে পারে বা উভয়কে নিঃশেষ করতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিটি বল; যা এ বলসমূহ অনুভব করে, সেই কণিকাসমূহ এবং স্থান ও সময়ের কাঠামো– যার মধ্যেই এগুলো কাজ করে। যদিও এ অবস্থাটি পদার্থবিদদের স্বপ্নের একটি মাত্র একীভূত তত্ত্ব (unified theory) পূরণ করেনা, এটি শুধু মডেল-নির্ভর বাস্তবতার কাঠামোতে গ্রহণযোগ্য।

আমরা ৫ নং পরিচ্ছদে দ্বৈততা ও M-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো, কিন্তু তার আগে একটি মৌলিক নীতি ব্যাখ্যা করবো– যার উপর প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে : কোয়ান্টাম তত্ত্ব, বিশেষত কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে বলা হয় বিকল্প ইতিহাস। সে দৃষ্টিভঙ্গিতে মহাবিশ্বের শুধু একটিমাত্র অস্তিত্ব বা ইতিহাস রয়েছে, সেটা নয়। তার পরিবর্তে মহাবিশ্বের একই সাথে রয়েছে প্রতিটি সম্ভাব্য রূপ (version), যাকে বলা হয় কোয়ান্টাম সুপারপজিশন। এটি সেই ঘর-থেকে-বের-হয়ে-গেলে-ঘরের-ভেতরের-টেবিলটি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মতবাদের মতোই ভয়ানক একটা কিছু মনে হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে তত্ত্বটি প্রতিটি ব্যবহারিক পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছে, এর প্রমাণ পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

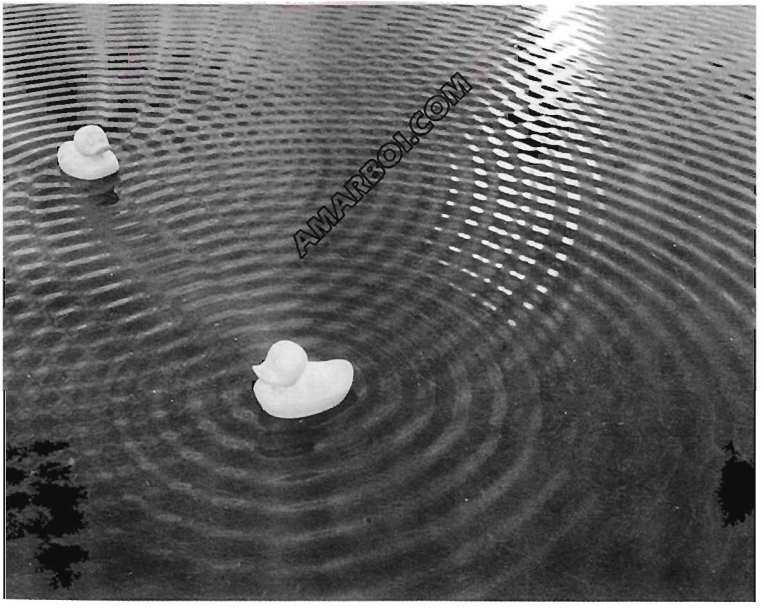
AMARBOI.COM

বিশৃঙ্খল ব্যতিচার : ব্যতিচারের ধারণা নিত্যদিনের জীবনাচরণে ডোবা থেকে সমুদ্রের ভেতর দেখা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

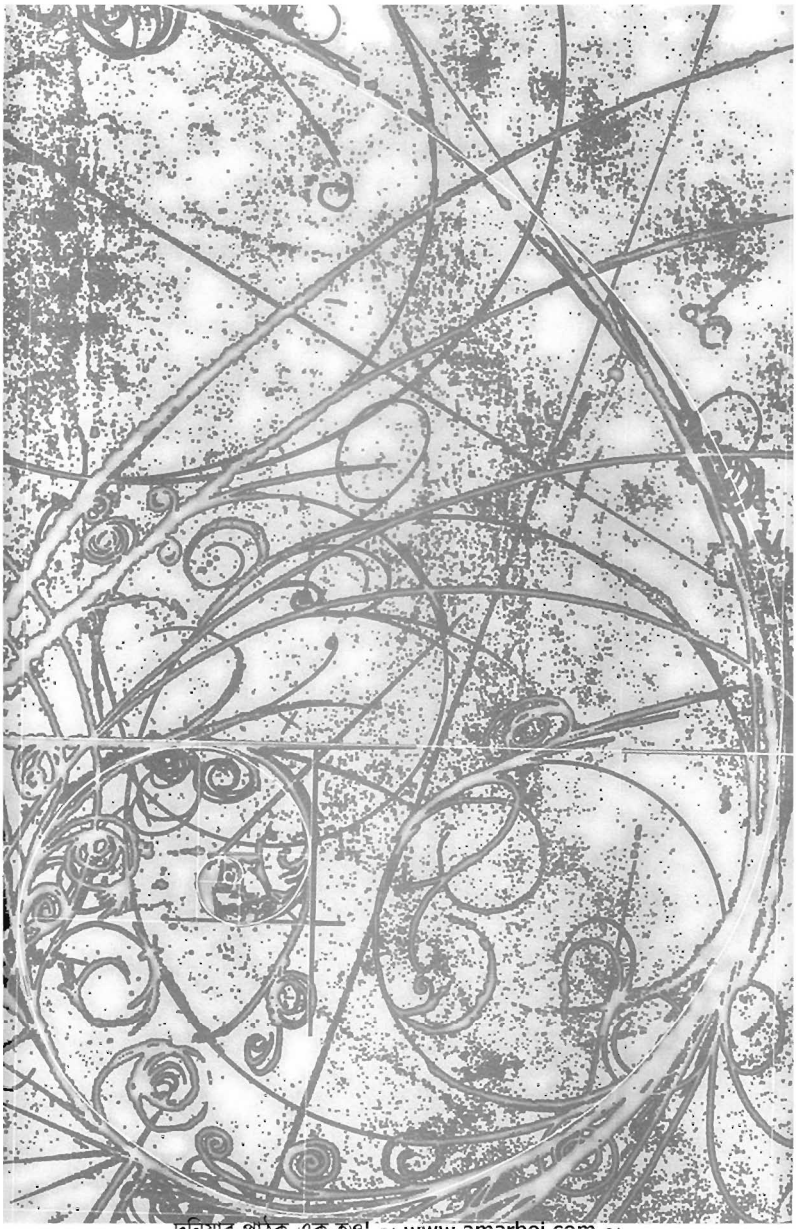

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকল্প ইতিহাসসমূহ

উনিশশো নিরানব্বুই সনে অষ্ট্রিয়াতে একদল পদার্থবিদ ফুটবলের মতো গোলকাকৃতির অণুসমূহের একটি সিরিজকে একটি প্রতিবন্ধক দেয়ালের দিকে ছুঁড়লেন। এই অণুগুলোর প্রতিটি ৬০টি কার্বন পরমাণু দিয়ে গঠিত, যাদেরকে প্রায়শ বলা হয় বাকিবল (Buckyballs), কারণ স্থপতি বাকমিনস্টার ফুলার একই

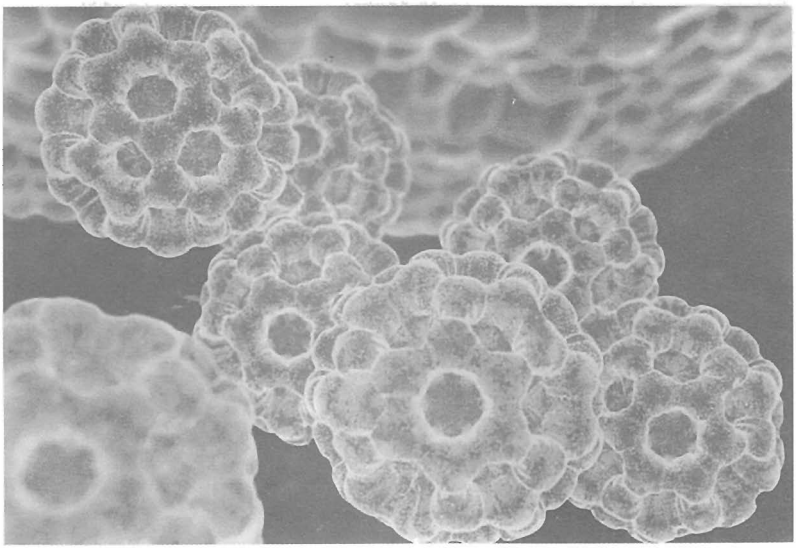

বাকিবল : বাকিবল আনুবীক্ষণিক ফুটবলের মতো কার্বন পরমাণুর সৃষ্টি।

স্টিফেন হকিং ও লিওনার্দ ম্লডিনাও # ৫৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকৃতির ইমারত তৈরি করেছিলেন। ফুলারের জিওডেসিক গম্বুজ সম্ভবত ফুটবল-আকৃতির কোনো বৃহত্তম অস্তিত্বশীল বস্তু। আর এই বাকিলবলসমূহ হচ্ছে ক্ষুদ্রতম। যে দেয়ালের দিকে পদার্থবিদগণ এই বাকিবলগুলোকে তাক করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাতে আছে দুটো ফুটো, যার মধ্য দিয়ে এগুলো পার হয়ে যেতে পারে। দেয়ালের অন্য পাশে পদার্থবিদেরা একই রকমের পর্দা রেখেছিলেন, যাতে দেয়াল পেরিয়ে আসা সে অণুগুলো পর্দার উপর পড়লে সনাক্ত ও গণনা করা যায়।

যদি আমরা প্রকৃত ফুটবল দিয়ে অনুরূপ পরীক্ষা চালাতে চাই, তাহলে আমাদের এমন একজন খেলোয়াড় প্রয়োজন হবে, যার লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা কিছুটা দূর্বল– কিন্তু সে আমাদের পছন্দ অনুযায়ী গতিবেগে অবিচলিতভাবে বল নিক্ষেপের ক্ষমতা রাখে। আমরা এ খেলোয়াড়কে স্থাপন করবো একটা দেয়ালের সামনে, যার মধ্যে দুটো ফুটো রয়েছে। দেয়ালের অন্যপাশে তার সমান্তরালভাবে আমরা একটি লম্বা জাল স্থাপন করবো। খেলোয়াড়ের বেশির ভাগ শটই প্রতিবন্ধক দেয়ালে লেগে ফিরে আসবে, কিন্তু কিছু আবার ফুটো দিয়ে গলে জালে জড়াবে। ফুটোগুলো যদি বল থেকে সামান্য বড় হয়, তাহলে দেয়ালের অন্যপাশে দুটো গভীর দৃশ্যমান রেখার (Highly collimated) স্রোত দেখা যাবে। যদি ফুটোগুলো এর চেয়ে আরো একটু বড় হয়, তাহলে এই স্রোত বিস্তৃত হবে, যেমনটি নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

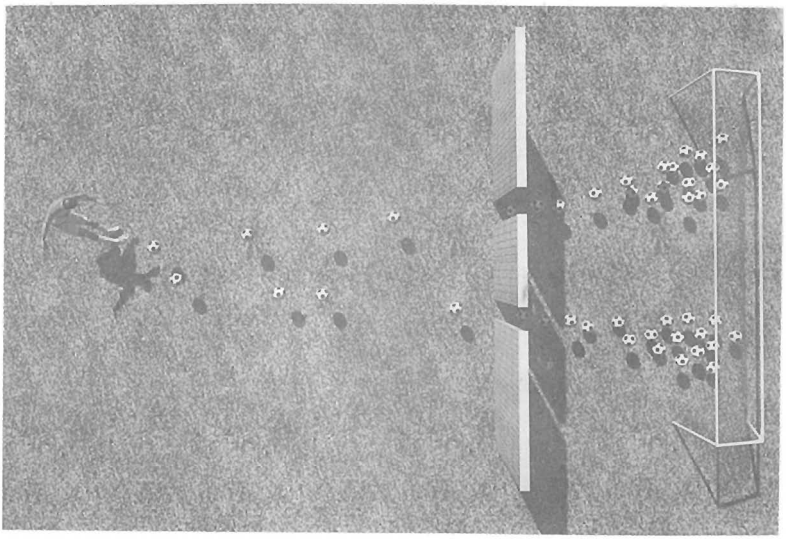

দুই ফুটো ফুটবল : ছিদ্রদ্বয়ের দিকে একজন খেলোয়াড় বল নিক্ষেপ করলে দেয়ালের উপর একিট নমুনার (pattern) সৃষ্টি হবে।

বাংলার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্য করুন যে, আমরা যদি ফুটো দুটির কোনো একটি বন্ধ করি, তাহলে বলের স্রোত আর সে ফুটো দিয়ে পেরুতে পারবে না, যদিও অন্য ফুটোটির ক্ষেত্রে সে রকম প্রতিক্রিয়া হবে না। যদি আমরা দ্বিতীয় ফুটোটিকে আবার খুলে দেই, তাহলে দেয়ালের অন্যপাশে যেতে সমর্থ হওয়া বলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কেননা, আমরা তখন সমস্ত বলগুলোকে সেখানে দেখতে পাব, যেগুলো আগের খোলা ফুটো দিয়ে পেরিয়ে এসেছে এবং এতে নতুন খুলে দেয়া ফুটো দিয়ে পেরিয়ে আসা বলগুলোও যুক্ত হবে। দুটো ফুটো খুলে দিলে আমরা যা দেখি, তা অন্যকথায়, প্রতিটি ফুটো পৃথকভাবে খুলে দিলে যা ঘটবে, তার মিলিত প্রতিক্রিয়া। এ রকম বাস্তবতাই দৈনন্দিন পৃথিবীতে আমরা দেখে থাকি। কিন্তু অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদেরা যখন তাঁদের অণুসমূহকে ছুঁড়লেন, তাঁরা যা প্রত্যক্ষ করলেন, সেটা কিন্তু সে ধরনের কিছু নয়।

অস্ট্রিয়ান পরীক্ষাটিতে দেখা গেল, দ্বিতীয় ফুটোটি খুলে দিলে প্রকৃতপক্ষে পর্দাটির কিছু স্থানে অণুসমূহের উপস্থিতি বেড়ে যাচ্ছে; কিন্তু তা একই সাথে অন্যত্র অণুসমূহের উপস্থিতির পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে, যেমনটা নিচের চিত্রে দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এমন জায়গা রয়েছে, দুটো ফুটোই খোলা থাকলে যেখানে কোনো বাকিবল উপস্থিত হচ্ছেনা; অথচ ফুটোগুলোর মধ্যে যে কোনো একটিকে খুলে দিলে

বাকিবল ফুটবল : যখন অণুর ফুটবল পর্দার ফুটোর উপর বর্ষণ করানো হয়, তখন উদ্ভুত নমুনা অপরিচিত কোয়ান্টাম তত্ত্বের অবতারণা করে।

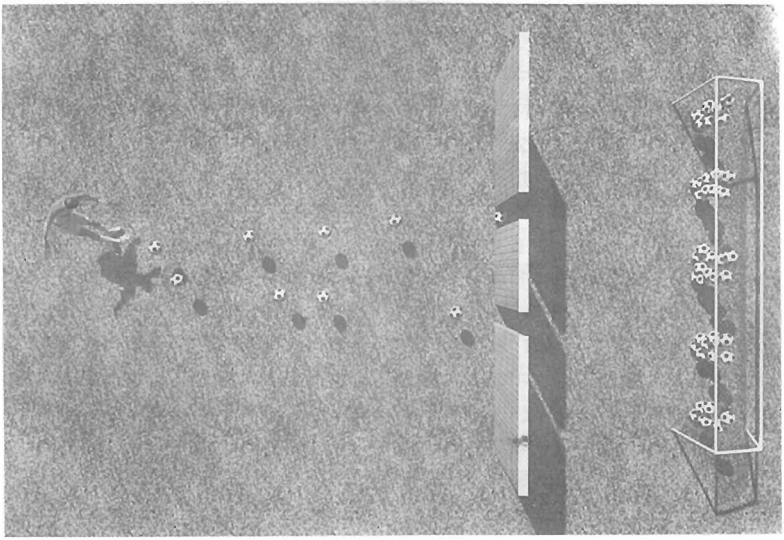

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সেগুলো সেস্থানে উপস্থিত হচ্ছে। এটা খুবই বিসদৃশ ঘটনা। দ্বিতীয় ফুটোটি খুলে দিলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অণুসমূহের উপস্থিতি কীভাবে কমে যেতে পারে?

আমরা বিস্তারিত পরীক্ষা করে এর উত্তরের সূত্র পেতে পারি। পরীক্ষাটিতে দেখা যায়, ফুটবল-আকৃতির অণুসমূহের অনেকগুলোই এমন একটি জায়গায় উপস্থিত হয়েছে, যে স্থানটিতেই কোনো একটি বা অন্য ফুটোটি খুলে দিলে অণুগুলো গিয়ে পৌঁছানোর আশা করা হতো, তার মাঝামাঝি জায়গায়। মধ্যবর্তী স্থানটির চেয়ে সামান্য দূরত্বে খুব কম অণুসমূহই পৌঁছুতে পেরেছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দূরত্বে আবার অনুসমূহের উপস্থিতি দেখা গেছে। এ রকম একটি প্যাটার্ন সে রকম কোনো যোগফল নয়, যা প্রতিটি ফুটো আলাদাভাবে খুলে দিলে ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা যায়; কিন্তু আপনি ৩ নং পরিচ্ছদ থেকে যেমন বুঝতে পারবেন, তা ব্যতিচারকারী তরঙ্গের আচরণের মতোই। যে স্থানটিতে কোনো অণুসমূহ উপস্থিত হচ্ছে না, সে স্থানটি সামঞ্জস্যপূর্ণ দুটো ফুটো থেকে আসা সরে যাওয়া দশার (out of phase) তরঙ্গের মতো, যারা বিনাশকারী ব্যতিচার তৈরি করে; যে স্থানটিতে অনেকগুলো অণু উপস্থিত হচ্ছে, সে স্থানটি তরঙ্গের দশার ভেতর (in phase)– যা তৈরি করেছে গঠনমূলক ব্যতিচার।

বৈজ্ঞানিক চিন্তার ইতিহাসের প্রায় দুই হাজার বছর সময়কালে যে কোনো তত্ত্বের ব্যাখ্যার ভিত্তি ছিল অভিজ্ঞতা ও স্বজ্ঞা (intuition)। আমরা যখন আমাদের প্রযুক্তিকে উন্নততর করতে এবং আমাদের পর্যবেক্ষণের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করতে সক্ষম হলাম, আমরা দেখতে পেলাম যে প্রকৃতি এমন আচরণ করে, যা আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা ও স্বজ্ঞার সাথে কমই সঙ্গতিপূর্ণ– যেমনটা বাকিবলের পরীক্ষার ক্ষেত্রে ঘটেছে। এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্যমূলক পরীক্ষা, যা ধ্রুপদী বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না; কিন্তু যাকে বলা হয় কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা, তা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সত্যিকারভাবে, রিচার্ড ফেইনম্যান লিখেছেন যে দ্বৈত ফুটোর এই পরীক্ষা (Double slit experiment), যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, তা "কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সমস্ত রহস্যকেই ধারণ করেছে।"

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্রসমূহ বিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশকেই রচিত হয়েছিল, যখন নিউটনীয় তত্ত্ব অণু-পরমাণুর স্তরে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয় বলে বোধ হতে লাগলো। পদার্থবিদ্যার মৌলিক তত্ত্বসমূহ প্রকৃতির নিয়মগুলোকে এবং কীভাবে বস্তুসমূহ তাদের প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তা ব্যাখ্যা করে। নিউটনের সূত্রসমূহের অনুরূপ চিরায়ত সূত্রসমূহ প্রাত্যহিক জাগতিক ঘটনাসমূহের কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই রচিত, যেখানে বিষয়গত বস্তুসমূহের রয়েছে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব; যাদেরকে নির্দিষ্ট স্থানে চিহ্নিত করা যায় এবং তারা একটি নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকৃতি কীভাবে অণু-পরমাণুর স্তরে কাজ করে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা আমাদেরকে এরকম একটি কাঠামো প্রদান ও ব্যাখ্যা করে। কিন্তু পরে আমরা আরো বিস্তারিতভাবে দেখতে পাবো যে এটি একটি

বাংলার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পূর্ণ পৃথক ধারণাগত নকশার উপর কর্তৃত্ব করে; এমন একটি অবস্থা যেখানে কোনো বস্তুর স্থান, গতিপথ, এমনকি তার অতীত এবং ভবিষ্যৎও সূক্ষ্মভাবে নিশ্চিত করা যায় না। মহাকর্ষ অথবা তড়িৎ চুম্বকীয় বল, ইত্যাদি বলসমূহের কোয়ান্টাম তত্ত্ব এ কাঠামোর ভিত্তিতেই নির্মিত হয়েছে।

আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সাথে অপরিচিত এমন একটি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে কী কোনো তত্ত্ব নির্মাণ করা সম্ভব, যা আমাদের চিরায়ত পদার্থবিদ্যার মডেলে ব্যাখ্যাকৃত প্রাত্যহিক ঘটনাকেও ব্যাখ্যা করতে সমর্থ? এটি সম্ভবপর, কেননা আমরা এবং আমাদের চারপাশের বস্তুজগৎ মিশ্র উপাদানে তৈরি, যা অকল্পনীয় সংখ্যক পরমাণু দিয়ে গঠিত– আমাদের পরিদৃশ্য মহাবিশ্বে দৃশ্যমান তারকার সংখ্যার চেয়েও বেশি সংখ্যক পরমাণু। যদিও এর অন্তর্গত পরমাণুসমূহ কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিয়মগুলো মেনে চলে, যে কেউ দেখাতে পারেন যে পরমাণুসমূহের একটি বৃহৎ সম্মিলন– যা ফুটবল, শালগম, জাম্বো জেট ও আমাদেরকে তৈরি করে– যা কিনা ফুটো দিয়ে আলো-আঁধারীতে বিশ্লিষ্ট হওয়া পরিহার করবে। সুতরাং যদিও আমাদের প্রাত্যহিক জগতের বস্তুসমূহ নির্মাণকারী মিশ্র উপাদানসমূহ কীভাবে আচরণ করে, তা নিউটনের সূত্রসমূহ একটি কার্যকরী তত্ত্ব তৈরি করে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

এটি একটি উদ্ভট ধারণা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, যাতে একটি বৃহৎ সম্মিলন তার অন্তর্গত স্বতন্ত্র উপাদানগুলোর আচরণের চেয়ে ভিন্ন আচরণ করে। একটি একক স্নায়ুকোষের আচরণ মানব মস্তিষ্কের আচরণের সাথে অল্পই মিল খায়; একটি পানির অণু সম্পর্কে জ্ঞান একটি হ্রদের আচরণ সম্পর্কে খুব বেশি ধারণা দেয় না। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে বলা যায়, কোয়ান্টাম বলয় থেকে নিউটনের সূত্রসমূহের উদ্ভব কীভাবে হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পদার্থবিদগণ এখনও কাজ করে চলেছেন। আমরা যা জানি, তা হলো : প্রতিটি বস্তুর উপাদানগুলো কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার সূত্রসমূহ মেনে চলে এবং নিউটনের সূত্রসমূহ কোয়ান্টাম আচরণ দিয়ে গঠিত দৃশ্যমান বৃহৎ জগতের বস্তুসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যার একটি প্রায় কাছাকাছি পন্থা।

নিউটন তত্ত্বের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী তাই বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা আমাদের চারপাশের জগৎ থেকে আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করি। কিন্তু প্রতিটি একক অণু ও পরমাণু আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আচরণ করে। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা হচ্ছে বাস্তবতার একটি নতুন মডেল, যা মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি চিত্র প্রদান করে। এটি এমনই এক চিত্র, যাতে আমাদের স্বজ্ঞার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানলব্ধ বাস্তবতার ধারণার কোনো অর্থ নেই।

দ্বৈত ফুটোর (Double slit) এই পরীক্ষাটি ১৯২৭ সনে প্রথমে করেছিলেন ক্লিনটন ডেভিসন ও লেস্টার গেরমার, যখন তারা বেল ল্যাবে ইলেকট্রন বীম নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন যে কীভাবে বাকিবলের চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র বস্তুসমূহ নিকেল দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঠিত স্ফটিকের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। বস্তুকণাসমূহ, যেমন ইলেকট্রন, পানির তরঙ্গের মতোই আচরণ করে– এ পর্যবেক্ষণটি কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যাকে উৎসাহিত করেছে। যেহেতু এই আচরণ প্রাত্যহিক দৃশ্যমান জগতে দৃষ্টিগোচর হয়না, কীভাবে বৃহৎ ও জটিল কোনো কিছু এই তরঙ্গসুলভ আচরণ করতে পারে, তা ভেবে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন যাবৎ বিস্মিত হয়েছিলেন। যদি দেখা যায় যে মানুষ বা জলহস্তি এরকম আচরণ করছে, তাহলে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হবে; কিন্তু আমরা যেমনটা বলেছি– বস্তুটি যতই বড় হবে, সাধারণত তার কোয়ান্টাম ক্রিয়া তত কম হবে। সুতরাং এটা অস্বাভাবিক যে চিড়িয়াখানার কোনো প্রাণী, তার খাঁচার বেড়া গলে তরঙ্গের মতো বেরিয়ে যাবে। তবু পদার্থবিদগণ ক্রমশ বৃহত্তর আয়তনের বস্তুকণিকার মধ্যে এই তরঙ্গসুলভ আচরণ দেখতে পাচ্ছেন। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন যে বাকিবলের এই পরীক্ষাটি তারা ভাইরাস দিয়ে করতে সমর্থ হবেন; যা শুধু আয়তনেই বৃহত্তর নয়, অনেকে তাকে জীবিত পদার্থ বলেও মনে করে থাকেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদসমূহে আমরা যে যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করতে যাচ্ছি, তা বুঝতে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার অল্প কিছু বিষয় বোঝা প্রয়োজন। এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তরঙ্গ/কণিকার দ্বৈতরূপ। বস্তুকণিকা যে তরঙ্গের মতো আচরণ করে, তা সবাইকে অবাক করেছিল। আলো যে তরঙ্গের মতো আচরণ করে, এটি এখন আর কাউকে অবাক করেনা। আলোর তরঙ্গসুলভ আচরণ আমাদের সবার কাছেই এখন স্বাভাবিক বলেই মনে হয় এবং বিগত প্রায় দুই শতাব্দী ধরে এ ধারণাটি সবাই গ্রহণ করেছে। উপরের পরীক্ষার মতো, যদি আপনি দুটো ফুটো দিয়ে আলো প্রক্ষেপণ করেন, তার থেকে দুটো তরঙ্গ বের হবে এবং সে দুটো পিছনের পর্দায় মিলিত হবে। কোনো কোনো স্থানে তাদের ঢেউয়ের চূড়া বা খাদ মিলিত হয়ে উজ্জ্বল স্থান তৈরি করবে, অন্যস্থানে কোনো চূড়া খাদের সাথে মিলে একে অন্যের বিলুপ্তি ঘটাবে এবং গাঢ় এলাকা তৈরি করবে। ইংরেজ পদার্থবিদ থমাস ইয়াং এই পরীক্ষাটি করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, যার ফলে মানুষ আশ্বস্ত হয় যে আলো হচ্ছে তরঙ্গ; নিউটন যে রকম বিশ্বাস করতেন, সে রকম কণিকা নয়।

কেউ কেউ যদিও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে নিউটন এ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ছিলেন যে আলো তরঙ্গ নয়; তিনি যখন বলেন যে আলো এমন আচরণ করে যেন তা কণিকা দিয়ে তৈরি তখন তিনি সঠিক ছিলেন। আমরা আজকাল একে বলি ফোটন। আমরা যেমন বহুসংখ্যক পরমাণু দিয়ে গঠিত, প্রতিদিন যে আলো আমরা দেখি, তা-ও বহুসংখ্যক ফোটন দিয়ে গঠিত। এমনকি রাতের ১ ওয়াট বাতি প্রতি সেকেন্ডে ১ বিলিয়ন বিলিয়ন ফোটন উৎসারণ করে। কোনো একক ফোটনকে দেখা যায় না, কিন্তু পরীক্ষাগারে আমরা আলোর এমন ক্ষীণধারা তৈরি করতে সক্ষম যে তার রশ্মি মাত্র একটি করে ফোটনের স্রোতে প্রবাহমান হবে– যার প্রতিটিকে আমরা এককভাবে নির্ণয় করতে সমর্থ হবো, যেমন আমরা সমর্থ ইলেকট্রন বা বাকিবলের ক্ষেত্রে। এবং আমরা ইয়াং-এর পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি এভাবে করতে পারি, যাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোকরশ্মি এতটাই ক্ষীণ হয়ে প্রতিবন্ধকে পৌঁছে যে ফোটনগুলি পৌঁছুবে একে একে; প্রতিটির মাঝে কয়েক সেকেন্ড বিরতিতে। আমরা যদি তা করি, এবং এ রকম প্রতিটি আপতনের ঘটনাকে যোগ করি, তখন দেখতে পাবো যে তারা একই ধরনের ব্যতিচার (interference pattern) তৈরি করে, যা আমরা ডেভিসন-গার্মার পরীক্ষাতে ইলেকট্রন (বা বাকিবল) পর্দার উপরে একে একে আপতিত হয়েছিল বলে দেখি। পদার্থবিদদের কাছে, এটি একটি বিস্ময়াভিভূত প্রত্যাদেশ : যদি একক স্বতন্ত্র কণিকাসমূহ একটি অন্যটির সাথে ব্যতিচার তৈরি করে, তাহলে আলোর তরঙ্গ-আচরণ শুধু একটি রশ্মি বা ফোটনের বৃহৎ সম্মিলনের আচরণ বা ধর্ম নয়; তা প্রতিটি কণিকারই আচরণ।

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার আর একটি প্রধান মতবাদ হচ্ছে অনিশ্চয়তা তত্ত্ব, যা ১৯২৬ সনে ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ প্রণয়ন করেছিলেন। এই অনিশ্চয়তা তত্ত্ব আমাদেকে বলে যে, কোনো উপাত্ত একইসাথে পরিমাপ করতে আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন একটি কণিকার অবস্থান এবং বেগের পরিমাপ। অনিশ্চয়তা তত্ত্ব অনুসারে, যদি আপনি একটি কণিকার অবস্থানের অনিশ্চয়তাকে

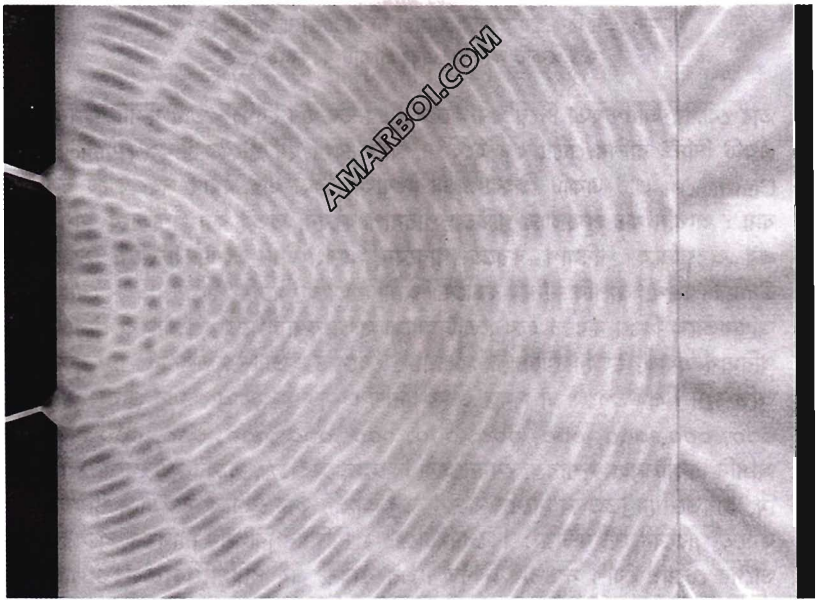
AMARBOI.COM

ইয়াং-এর পরীক্ষা : আলোর ঢেউ এর তত্ত্বের মতো বাকিবলের নকশাও একইরকম পরিচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

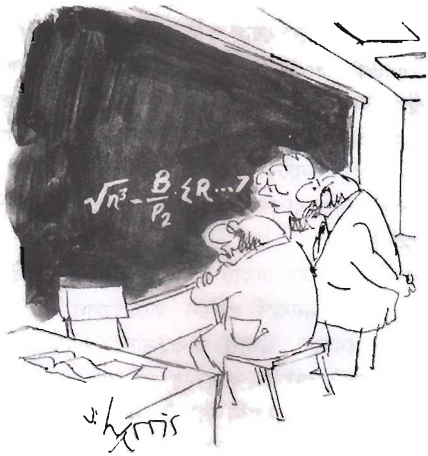

"যদি এটা ঠিক হয় তাহলে আমরা যা যা চিন্তা করেছি তা হচ্ছে :
ডেউ একটি কণিকা, এবং প্রতিটি কণিকাই ডেউ"

তার বেগের অনিশ্চয়তা দিয়ে গুণ করেন (এর ভর গুণ বেগ)– তার ফলটি কখনও একটি নির্দিষ্ট রাশির চেয়ে কম হবে না; যাকে বলা হয় প্লাঙ্কের ধ্রুবক (Plunck's Constant)। এটি একটি জিহ্বা-জড়ানো বাক্য, কিন্তু এর মর্মার্থ সহজভাবে বলা যায় : আপনি যত সূক্ষ্মভাবে গাড়িকে পরিমাপ করেন, ততই কম সূক্ষ্মভাবে আপনি এর অবস্থানকে পরিমাপ করতে পারবেন, এবং এর উল্টো চিত্রটিও সত্য। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি অবস্থানের অনিশ্চয়তাকে অর্ধেক করেন, তখন বেগের অশ্চিয়তাকে দ্বিগুণ করতে হবে। এটি আরো লক্ষ্য করার মতো, প্রাত্যহিক জীবনের পরিমাপ-একক, যেমন মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড ইত্যাদির তুলনায় প্লাঙ্ক-ধ্রুবক অতি ক্ষুদ্র। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত একক দিয়ে প্রকাশ করলে এর মান প্রায় ৬/১০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০। যদি আপনি একটি বৃহৎ দৃশ্যবস্তু, যেমন এক কিলোগ্রামের ১/৩ ভরের ফুটবলকে ১ মি. মি. আয়তনে নিখুঁতভাবে নির্দেশ করেন, তবু আপনি তার বেগকে সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে পারবেন, যা ঘণ্টায় ১ কিলোমিটারের ১ বিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন ভাগের ১ ভাগের চেয়েও বেশি সূক্ষ্মতায় নির্ণিত। এর কারণ, এই পরিমাপের এককগুলোতে ফুটবলের ভর ১/৩ এবং অবস্থানের অনিশ্চয়তা ১/১০০০। এর কোনোটাই প্লাঙ্ক ধ্রুবকের এতগুলো শূন্যের কাছাকাছি নয়, সুতরাং তাদের বেগ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। কিন্তু একই এককে একটি ইলেকট্রনের ভর হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১, সুতরাং এখানে ইলেকট্রনের অবস্থাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা যদি ইলেকট্রনের অবস্থানকে একটি পরমাণুর আয়তনের সমান মনে করে সূক্ষ্মভাবে মাপতে চাই, তাহলে অনিশ্চয়তা তত্ত্ব নির্দেশ করবে যে আমরা ইলেকট্রনের বেগকে প্রতি সেকেন্ডে ১০০০ কিলোমিটারের সামান্য কম বা বেশি– এর চেয়ে সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে সক্ষম হবো না। আর এই পরিমাপ মোটেই নিখুঁত নয়।

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা অনুসারে, আমরা যতই তথ্য-উপাত্ত পাই না কেন, এবং আমাদের পরিগণন-ক্ষমতা যতই শক্তিশালী হোক না কেন; ভৌত পদ্ধতির ফলাফল কখনো নিখুঁতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবেনা, কারণ তা নিশ্চয়তা দিয়ে নির্ধারিত নয়। এর পরিবর্তে, একটি পদ্ধতির প্রাথমিক অবস্থা নির্ধারিত থাকলে প্রকৃতি তার ভবিষ্যৎ অবস্থাকে নির্ধারণ করে এমন একটি অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে, যা মৌলিকভাবেই অনিশ্চিত। অন্য কথায়, প্রকৃতি কোনো পদ্ধতি বা পরীক্ষার ফলাফল স্থির করে না, এমনকি তা কোনো সহজতম ক্ষেত্রেও। এর পরিবর্তে এটা বিভিন্ন সম্ভাব্যতার অনুমতি দেয়, প্রতিটি সংঘটনের সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন মাত্রা হিসেবে। আইনস্টাইনের উদ্ধৃতি অনুসারে, ঈশ্বর যেন প্রতিটি জাগতিক ভৌত ঘটনার ভাগ্য-নির্ধারণের আগে পাশা খেলছেন। এই ধারণাটি আইনস্টাইনকে পীড়া দিয়েছিল, যদিও তিনি নিজেই কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার প্রবক্তাদের একজন ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য এর সমালোচকে পরিণত হন।

প্রকৃতি নিয়ম দিয়ে শাসিত হয়, এ ধারণাটিকে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা বিরোধিতা করে বলে মনে হতে পারে। তার বদলে এটি আমাদেরকে একটি নতুন ধরনের অদৃষ্টবাদকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে : কোনো পদ্ধতির একটি সময়কার অবস্থাটি জানা থাকলে, প্রকৃতির নিয়ম তার ভবিষ্যৎ ও অতীতের অবস্থাকে নিশ্চয়তার সাথে নির্দেশ না করে তার বিভিন্ন ভবিষ্যৎ ও অতীত সম্ভাব্যতার অবস্থাকে নির্দেশ করবে। এটি কারো কারো কাছে বিস্বাদ মনে হলেও বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে মেনে নিতে বাধ্য হন, তাঁদের নিজেদের পূর্ব-ধারণা যা-ই হোক না কেন।

বিজ্ঞানীরা দাবি করেন যে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে হতে হবে পরীক্ষাযোগ্য। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার ধরন যদি বোঝায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীকে নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব, সে ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম তত্ত্ব একটি যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্ব হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার ধরন বাদ দিলেও আমরা তবু কোয়ান্টাম তত্ত্বকে পরীক্ষা করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা কোনো পরীক্ষাকে বহুবার পুনরাবৃত্তি করে বিভিন্ন ফলাফল সংঘটনের হার, এই ভবিষ্যদ্বাণীকৃত সম্ভাব্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, তা নিশ্চিত করতে পারি। বাকিবল পরীক্ষাটির কথা মনে করা যাক– কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার মতে, কোনো কিছুই একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে থাকে না, কেননা তাহলে ভর-বেগের অনিশ্চয়তাকে

অসীম হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা অনুসারে, যে কোনো কণিকাকেই মহাবিশ্বের যে কোনো স্থানে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট ইলেকট্রনকে double-slit পরীক্ষায় পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও, তাকে বহুদূরের নক্ষত্র আলফা সেন্ট্যুরাইতে অথবা আপনার অফিস-ক্যাফেটেরিয়ার পাইকেকে পাওয়ারও কিছু সম্ভাবনা থেকে যায়। এর ফলে আপনি যদি একটি কোয়ান্টাম বাকিবলকে লাথি দিয়ে উড়িয়ে দেন, এটি কোথায় গিয়ে পড়বে, তা অগ্রিম বলার মতো নিশ্চয়তা, কোনো জ্ঞান বা দক্ষতাই দিতে পারবে না। কিন্তু যদি আপনি এ পরীক্ষাটি বার বার করেন, তাহলে যে উপাত্ত পাবেন, তা বলটিকে বিভিন্ন জায়গায় পাওয়ার সম্ভাবনারই প্রতিফলন ঘটাবে। আর এ সমস্ত পরীক্ষাকারীগণ নিশ্চিত করেছেন যে পরীক্ষাসমূহের ফল তাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

এটি অনুভব করা গুরুত্বপূর্ণ যে, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার সম্ভাব্যতাগুলো প্রাত্যহিক জীবনে দেখতে পাওয়া নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার সম্ভাব্যতার অনুরূপ নয়। এটিকে আমরা পর্দায় বাকিবলের নিরবচ্ছিন্ন স্রোতপ্রবাহের সাথে কোনো খেলোয়াড়ের বোর্ডে গরুর চোখ বিদ্ধ করার খেলার মতো গর্তের প্যাটার্নের সাথে তুলনা করতে পারি। যতক্ষণ পর্যন্ত না এর খেলোয়াড় অতিরিক্ত পরিমানে বিয়ার পান করে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার তীর গরুর চোখের কেন্দ্রে পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি; কেন্দ্র থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে, তীরটি সেখানে পড়ার সম্ভাবনা ততই কমে আসবে। বাকিবলের ক্ষেত্রে, যে কোনো তীরই যে কোনো স্থানে পড়তে পারে, এবং সময়ের সাথে সাথে গর্তসমূহের প্যাটার্ন থেকে এর অন্তর্গত সম্ভাব্যতাগুলো ফুটে উঠবে। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা এ অবস্থাটিকে দেখাতে গিয়ে বলতে পারি যে, একটি তীর বিভিন্ন স্থানে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে; কিন্তু আমরা বলতে পারি যে, বাকিবলের অবস্থার বিপরীতে এটি শুধু এ কারণেই যে, এর প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। আমরা যদি সঠিকভাবে জানতাম যে খেলোয়াড়টি কীভাবে তীরটি ছুঁড়ছে; এর কোণ, ঘূর্ণন, বেগ ইত্যাদি ইত্যাদি– তাহলে আমরা আমাদের বর্ণনাকে আরো উন্নত করতে পারতাম। নীতিগতভাবে, আমরা তখন আমাদের ইচ্ছানুরূপ সূক্ষ্মতায় বলতে সমর্থ হতাম যে তীরটি কোথায় গিয়ে পতিত হবে। তাই প্রাত্যহিক ঘটনাসমূহ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার আশ্রয় নেয়াটা পদ্ধতিটির কোনো অন্তর্নিহিত প্রকৃতি নয়, বরং ঘটনাটির সামগ্রিক বিশ্লেষণে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা।

কোয়ান্টাম তত্ত্বে সম্ভাব্যতার বিষয়টি ভিন্নরকম। এগুলো প্রকৃতির একটি মৌলিক স্বেচ্ছাচারী নীতির প্রতিফলন। প্রকৃতির কোয়ান্টাম মডেল এমন সব সূত্রকে ধারণ করে, যা শুধু আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতারই বিরুদ্ধাচরণ করে না, তা আমাদের স্বজ্ঞাপ্রাপ্ত বাস্তবতার স্বতঃস্ফূর্ত ধারণারও বিরুদ্ধাচরণ করে। যারা এই সূত্রসমূহকে অতিপ্রাকৃতিক কিংবা বিশ্বাস করা কঠিন বলে মনে করেন, তারা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেককেই পাবেন– যেমন মহান পদার্থবিদ আইনস্টাইন; এমনকি

AMARBOI.COM

বিনোদন পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেইনম্যান, যাঁর কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্পর্কিত ভাষ্য আমরা অচিরেই উপস্থাপন করবো। প্রকৃতপক্ষে, ফেইনম্যান একসময়ে লিখেছিলেন, "আমার মনে হয় আমি এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে কেউই কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে বুঝতে পারে না।" কিন্তু কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা পর্যবেক্ষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি কখনো কোনো পরীক্ষাতে নিষ্ফল প্রমাণিত হয় নি এবং বিজ্ঞানের অন্য যে কোনো তত্ত্বের চেয়ে এটি বেশিবার পরীক্ষিত হয়েছে।

রিচার্ড ফেইনম্যান ১৯৪০ এর দশকে কোয়ান্টাম জগৎ ও নিউটনীয় জগতের প্রভেদ সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরেন। দ্বৈত-ফুটোর পরীক্ষাতে কীভাবে ব্যতিচার প্যাটার্ন দেখা দেয়, এর উত্তরটি জানতে ফেইনম্যান উদগ্রীব ছিলেন। পরীক্ষাটির কথা আবার মনে করে দেখুন, দুটো ফুটো একই সাথে খোলা রেখে পরীক্ষাতে প্রাপ্ত অণুসমূহের সংখ্যা পৃথকভাবে একটি একটি করে ফুটো খোলা রেখে প্রাপ্ত অণুসমূহের যোগফলের সমান নয়। এর বিপরীতে, যখন দুটো ফুটোই খোলা থাকে, আমরা তখন হালকা ও গাঢ় বৃত্তের একটি পরম্পরা (series) দেখতে পাই। যেখানে কণিকাদের পতিত হওয়ার কথা ছিল, দুটো ফুটো খোলা রাখলে সেখানে সেগুলো পতিত হয় না। এটি এমন একটি ঘটনা, যেন উৎস থেকে পর্দায় যাত্রার মাঝপথে কোনো স্থানে কণিকাগুলো দুটো ফুটো সম্পর্কে তথ্য পেয়ে যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ধরনের আচরণ ঘটে বলে আমরা দেখে থাকি, এটি তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন; যেখানে একটি বল একটি ফুটো দিয়ে গলে যাওয়ার সময় অন্য ফুটোর থাকা বা না থাকায় কিছুই পরিবর্তিত হয় না।

নিউটনের পদার্থবিদ্যা অনুসারে, যদি আমরা এ পরীক্ষাটিকে অণুর পরিবর্তে ফুটবল দিয়ে সম্পন্ন করি, প্রতিটি কণিকা একটি একক সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে এর উৎস থেকে পর্দা পর্যন্ত যাবে। এ চিত্রে কোনো ঘুরপথের স্থান নেই, যেখানে কণিকাগুলো গমনপথ পরিবর্তন করে অন্য ফুটোয় চলে যেতে পারে। কোয়ান্টাম মডেল অনুসারে অবশ্য বলা হয়, উৎস থেকে চূড়ান্ত বিন্দু পর্যন্ত সময়কালে কণিকার কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান নেই। ফেইনম্যান উপলব্ধি করলেন, এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই যে উৎস থেকে পর্দা পর্যন্ত গমণকালে কণিকা কোনো নির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করে না। এর বদলে এটা বুঝাতে পারে, যে কণিকাগুলো প্রতিটি সম্ভাব্য পথ বেছে নিয়ে এ দুটো বিন্দুকে যুক্ত করে। ফেইনম্যান নিশ্চিত করলেন যে, এটাই কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যাকে নিউটনীয় পদার্থবিদ্যা থেকে পৃথক করেছে। দুটো ফুটোর অবস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একটি একক পথ অনুসরণ না করে কণিকাগুলো নেয় প্রতিটি পথ এবং সেগুলোকে একই সাথে নেয়। এটা কল্পবিজ্ঞানের মতো মনে হলেও আসলে তা নয়। ফেইনম্যান এর একটা গাণিতিক রাশিমালা প্রণয়ন করলেন– ইতিহাসসমূহের উপর ফেইনম্যানের সমষ্টি (Feynman sum over histories)– যা এই ধারণাকে প্রতিফলিত করে এবং কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার

AMARBOI.COM

সবগুলো সূত্রের জন্ম দেয়। ফেইনম্যানের তত্ত্বে যে গাণিতিক ও ভৌত চিত্র ফুটে উঠে, তা কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার আদি সূত্রায়ন থেকে ভিন্ন; কিন্তু এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো একই রয়েছে।

দ্বৈত-ফুটোর পরীক্ষা সম্পর্কে ফেইনম্যানের ধারণা বোঝায় যে কণিকাসমূহ পথ করে নেয় একটি ফুটো দিয়ে যেতে, অথবা অন্য ফুটোটি দিয়ে যেতে; সে পথ প্রথম ফুটো দিয়ে ঢুকে আবার দ্বিতীয় ফুটো দিয়ে বের হয়ে আসে, এরপর আবার প্রথম ফুটো দিয়ে ঢুকে। সে পথ রেস্তোরাঁরও হতে পারে, যেখানে মজাদার চিংড়িমাছ রান্না হচ্ছে, এবং পরে ঘরে ফিরে আসার আগে বৃহস্পতি গ্রহকে কয়েকবার আবর্তন করে, এমনকি সে পথ মহাবিশ্বকেও পরিভ্রমণ করে আসতে পারে। ফেইনম্যানের দৃষ্টিতে, সেটি ব্যাখ্যা করে কীভাবে একটি কণিকা কোন ফুটোটি খোলা রয়েছে, তার বিষয়ে তথ্যগ্রহণ করে– যদি একটি ফুটো খোলা থাকে, তখন কণিকাটি সে পথটিই বেছে নেয়। যদি দুটো ফুটোই খোলা থাকে, তখন কণিকাটি একটি ফুটো দিয়ে যেতে যে পথ গ্রহণ করে, তা অন্য ফুটোটি দিয়ে যেতে কণিকাটির উপর হস্তক্ষেপ করে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এটি হয়তো পাগলামি মনে হতে পারে, কিন্তু

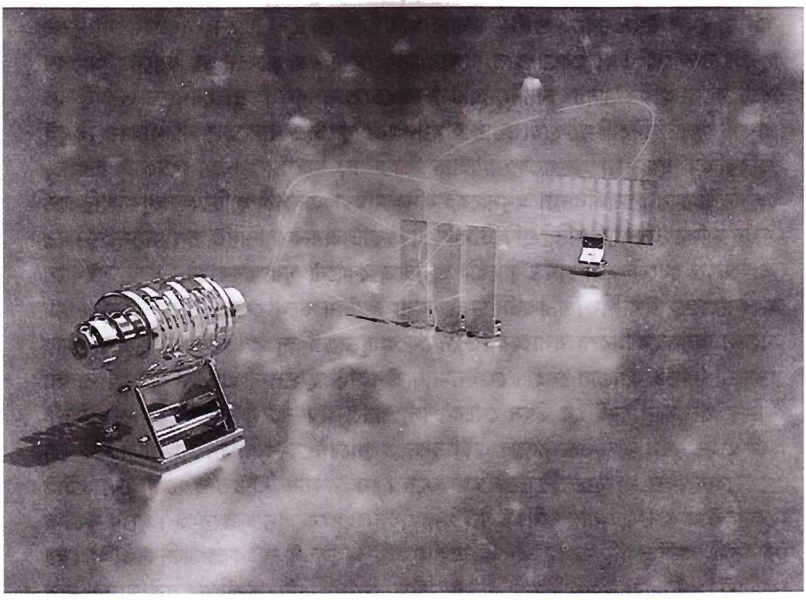

কণিকাগুলোর পথ : ফেইনম্যানের কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি কেন বাকিবল এবং ইলেক্ট্রন কণিকা ব্যতিচার নকশা সৃষ্টি করে যখন এগুলো চিত্রের মাধ্যমে পর্দায় নিক্ষেপ করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিককালের মৌলিক পদার্থবিদ্যার অভিপ্রায় অনুসারে, এবং বইটির উদ্দেশ্য অনুসারে– ফেইনম্যানের এই সূত্রায়ন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার আদি সূত্রায়নের চেয়ে অধিক কার্যকরী বিবেচিত হয়েছে।

কোয়ান্টাম বাস্তবতা সম্পর্কে, এবং অচিরেই যে তত্ত্বসমূহ নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, তা বুঝতেও ফেইনম্যানের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এটি কীভাবে কাজ করে, তা বুঝতে কিছুটা সময় ব্যয় করা উচিত। একটি সরল ঘটনাকে কল্পনা করা যাক, যেখানে কোনো একটি কণিকা A অবস্থানে আছে, এবং তা মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। নিউটনীয় মডেল অনুসারে, এই কণিকাটি একটি সরলরেখাকে অনুসরণ করবে। একটি নির্দিষ্ট সময় পার হলে আমরা এ কণিকাটিকে রেখাটির অন্য একটি অবস্থানে B তে দেখতে পাবো। ফেইনম্যান এর মডেলে একটি কোয়ান্টাম কণিকা A থেকে B পর্যন্ত পৌছার পথে প্রতিটি সম্ভাব্য

ফেইনম্যান-এর পথগুলোর সম্মিলন : ফেইনম্যানের বিভিন্ন প্রকারের পথগুলো ঢেউ-এর মতো বাড়তে বা নিশ্চিহ্ন করতে পারে। হলুদ তীরগুলোকে দশাগুলোর যোগ করা বোঝায়। নীল রেখাগুলো সেগুলোর যোগফল. প্রথম তীরটির শেষ প্রান্ত থেকে শেষ তীরটির শেষ বিন্দু পর্যন্ত একটি রেখা। পরের পৃষ্ঠার ছবিটিতে তীরগুলো বিভিন্ন দিকে নির্দেশ করে দেখানো হয়েছে; অতএব এদের যোগফল নীল রেখাটির দৈর্ঘ্য খুবই ছোট।

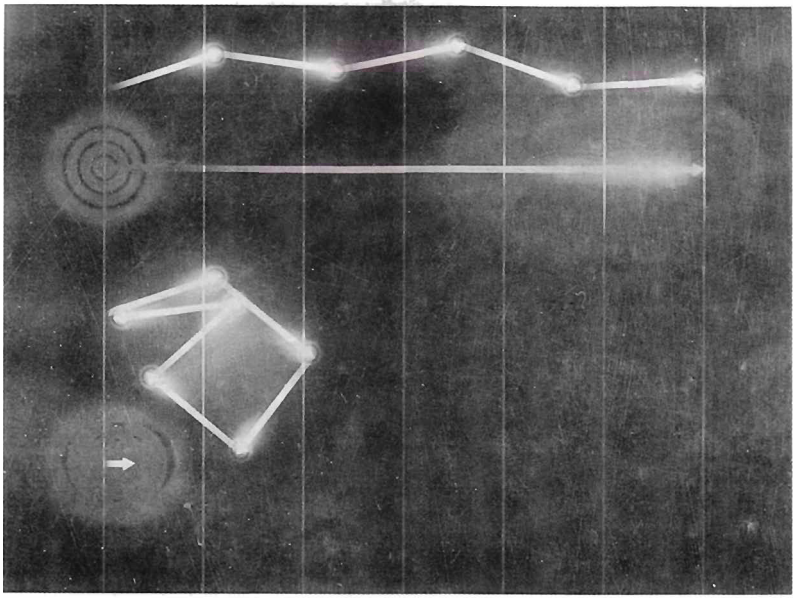

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথকেই বিবেচনায় নেয়, এক্ষেত্রে প্রতিটি পথকে একটি সংখ্যা হিসেবে গ্রহণ করে, যাকে দশা (phase) বলে। ঐ দশাটি একটি তরঙ্গের আবর্তনকালের (cycle) ভেতর অবস্থান নির্দেশ করে অর্থাৎ তরঙ্গটি আবর্তনকালীন সময়ে চূড়ায় অথবা নীচে অথবা এর মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে কোন অবস্থানে রয়েছে তা নির্দেশ করে। ফেইনম্যানের গাণিতিক ব্যাখ্যায়, এই দশার অবস্থান নির্ণয়ের জন্য আপনাকে A থেকে B তে যাওয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল পথকে যোগ করতে হবে এবং এই যোগের ফলাফলকে বলা হয় প্রবাবিলিটি এমপ্লিচুড (Probability Amplitude)। প্রবালিটি এমপ্লিচুড এর বর্গ করলে B তে ঠিকঠাক পৌঁছার সম্ভাব্যতা (Probability) পাওয়া যাবে।

ফেইনম্যানের যোগফলে প্রতিটি পথের দশা (এখানে A থেকে B তে যাওয়ার সম্ভাব্যতা সব পথ) একটি তীরের ছবির মাধ্যমে বোঝানো যায়। সেই তীরটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কিন্তু সেটি যে কোনো দিকেই নির্দেশ করা যেতে পারে। দুটি দশাকে যোগ করার জন্য আপনি একটি দশার তীরের পেছনে আর একটি দশার তীর যুক্ত করুন,

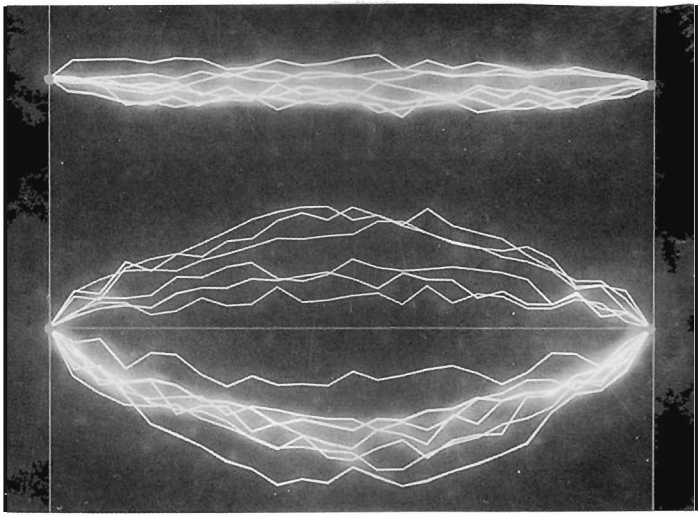

A থেকে B তে যাওয়ার পথসমূহ : দুটি বিন্দুর ক্লাসিক্যাল পথ একটি সরলরেখা। এই ক্লাসিক্যাল সরলরেখার পথের নিকটবর্তী পথের দশাগুলোর একটি অপরটিকে বিস্তৃত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে দূরবর্তী পথের দশাগুলো একটি অপরটিকে নিঃশেষ করার প্রবণতা দেখায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে ক্ষেত্রে একটি নতুন তীর পাওয়া যাবে, যা দু'টি দশার যোগফল। আরোও দশা যোগ করার ক্ষেত্রে কেবল সহজ এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করুন। উল্লেখ্য যে, যখন দশাগুলি একত্রে যুক্ত হবে, তখন রেখাটি অনেক বেশী দৈর্ঘ্যের হবে। কিন্তু দশার রেখাগুলির তীরের পথ যদি বিভিন্ন দিকে নির্দেশ করা থাকে, তখন এরা একটি অপরটিকে নিঃশেষ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হবে এবং এর ফলে একটি মাত্র তীরের রেখার চেয়ে বেশী কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। এই ধারণাটি ৭০ পৃষ্ঠার ছবিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

ফেইনম্যানের নির্দেশনামতে, কোনো কণিকার A থেকে B তে পৌঁছার প্রবাবিলিটি এমপ্লিচুড সবগুলি পথের দশাগুলি বা তীরগুলি যোগ করলেই হবে। এখানে কিন্তু অসীম সংখ্যক পথ আছে যা গণিতকে জটিল পর্যায়ে নিয়ে যায়, কিন্তু এটা কার্যকর। কিছু পথ ৭০ পৃষ্ঠার ছবিতে দেখানো হল :

ফেইনম্যানের তথ্যের মাধ্যমে এটি সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যায় যে, নিউটনের সৃষ্ট বিশ্বচিত্র কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়। ফেইনম্যানের তত্ত্বমতে, প্রতিটি পথের দশা প্লাংকের ধ্রুবকের সাথে যুক্ত। এই তত্ত্বমতে, যেহেতু প্লাঙ্কের ধ্রুবকের মান খুবই কম, যখন কাছাকাছি পথগুলির ফল যোগ করা হয়, তখন দশার মান অতিমাত্রায় ওঠানামা করে। অতএব, উপরের চিত্রানুযায়ী এই মান শূন্যের কাছাকাছি যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

কিন্তু এই তত্ত্বে এটাও দেখানো হয়েছে যে, কিছু কিছু পথের একই রেখায় যুক্ত হওয়ার প্রবণতা আছে, অতএব সেই পথগুলি গুরুত্ব বহন করে; অর্থাৎ কোনো কণিকার বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যায় সেগুলোই বেশীরভাগ অবদান রাখে। এটা পরিস্কার যে, বড় বস্তুর জন্য এটি নিউটনের [illegible] পথের মতোই, যার দশা একই রকম এবং যোগফলের উপর সবচেয়ে বেশী অবদান রাখে। অতএব একমাত্র গন্তব্য হল যার মান শূন্যের চেয়ে বেশী, সে মানটি নিউটনের তত্ত্বে নির্দেশিত আছে এবং ঐ গন্তব্যের সম্ভাবনার মান প্রায় ১-এর কাছাকাছি। অতএব বড় বস্তু নিউটনের তত্ত্বমতেই চলাচল করবে।

এখন পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি তা ফেইনম্যানের ধারণা নিয়ে দুই ফুটোর পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে। ঐ পরীক্ষায় কণিকা ফুটোযুক্ত দেয়ালে নিক্ষেপ করা হয় এবং আমরা দেয়ালের পেছনের পর্দার উপর এর হিসেব করি, যেখানে কণিকাগুলি এসে পড়ে। আরো সাধারণভাবে একটিমাত্র কণিকার বদলে ফেইনম্যান এর তত্ত্ব আমাদেরকে একটি 'পদ্ধতি'র ফলাফল আগাম বলে দেয়ার সুযোগ করে দেয়, যা একটি কণিকার জন্য হতে পারে, একঝাঁক কণিকার জন্যও হতে পারে– এমনকি সমগ্র মহাবিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। এই পদ্ধতির প্রাথমিক অবস্থা থেকে পরের অবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি কিছু উপায়ে সৃষ্টি হয়, যাকে পদার্থবিজ্ঞানীরা 'পদ্ধতির ইতিহাস' বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, সহজভাবে বলতে গেলে দুই ফুটো বিশিষ্ট পরীক্ষায় কণিকার

ইতিহাস হল এটার পথ। দুই-ফুটো পরীক্ষার কোনো নির্দিষ্ট স্থানে কণিকার পৌঁছানোটা সবগুলি সম্ভাব্য পথের উপর নির্ভর করে। ফেইনম্যান দেখালেন যে, একটি সাধারণ পদ্ধতির জন্য কোনো দৃশ্যের সম্ভাবনা, সবগুলি সম্ভাব্য ইতিহাসকে বিবেচনায় নিয়ে তৈরী করতে হবে। এইজন্য তাঁর পদ্ধতিকে 'সব ইতিহাসের যোগফল' বলা হয়ে থাকে বা কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার 'বিকল্প ইতিহাসসমূহ' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে আমরা ফেইনম্যানের ধারণাকে এখন বুঝতে পারি। এবার আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কোয়ান্টাম তত্ত্বের কথা উল্লেখ করব; যেটা আমরা পরে ব্যবহার করেছি– সেটা হল, একটি পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের সাপেক্ষে তার গতিপ্রকৃতি বদলে যাওয়ার নিয়মাবলী। আমরা কী আমাদের সুপারভাইজার মহোদয়ের থুতনিতে একটি তিল থাকাটাকে কেবল অবলোকনই করতে পারি, এটার উপর কোনো হস্তক্ষেপ না করে? কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার মতে 'না'– আপনি কেবল দর্শক হিসেবে নীরব থাকতে পারেন না। অর্থাৎ কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা বলে যে, কোনো কিছুর দর্শক হতে হলে আপনাকেও ঐ বস্তুটির উপর সক্রিয় হস্তক্ষেপ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রচলিত ধারণায় কোনো বস্তুকে দেখতে হলে আমরা বস্তুটির উপর আলো ফেলি। কোনো তরমুজের উপর আলো ফেললে, তার প্রতিক্রিয়া কোনো উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কিন্তু কোয়ান্টাম কণিকার উপর খুবই মৃদু আলো ফেললে অর্থাৎ ফোটন কণিকা নিক্ষেপ করলে একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল দাঁড়াবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার নির্দেশিত পথেই ফলাফলের পরিবর্তন ঘটে।

ধরুন পূর্বের মতোই আমরা একঝাঁক কণিকা দুই-ফুটো পরীক্ষার দেয়ালের উপর নিক্ষেপ করি। প্রথম যে এক মিলিয়ন কণিকা ফুটো দিয়ে পার হয়েছে সেগুলির তথ্য সংগ্রহ করি। যে সমস্ত কণিকা বিভিন্ন স্থানে পৌঁছেছে, সেগুলির সংখ্যা নিয়ে যে চিত্র তৈরী করব সেটা ৫৯ পৃষ্ঠার ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন এর মতো দেখাবে। এবং আমরা যখন A থেকে B বিন্দুতে যাওয়ার সকল পথের সাথে সংশ্লিষ্ট দশাগুলি যোগ করব, তখন আমরা দেখতে পাব যে বিভিন্ন বিন্দুতে কণিকাগুলি পৌঁছার সম্ভাবনার মান প্রাপ্ত উপাত্তের (Data) সাথে মিলে গেছে। এখন মনে করুন, আমরা এই পদ্ধতির যদি পুনরাবৃত্তি করি, এবার ফুটোগুলির উপর এমনভাবে আলো নিক্ষেপ করি যেন মধ্যবর্তী 'C' বিন্দু দিয়ে কণিকাগুলি বের হয় ('C' হচ্ছে যে কোনো একটি ফুটোর একটি স্থান)। এটাকে বলে কোন-পথ তথ্য (Which-Path Information) কারণ এটা দ্বারা বোঝা যায় যে আসলে প্রতিটি কণিকা A থেকে ১নং ছিদ্র দিয়ে B তে যাচ্ছে কিনা অথবা A থেকে ২ নং ছিদ্র দিয়ে B তে যাচ্ছে কিনা। যেহেতু আমরা জানি যে, কোন ছিদ্র দিয়ে প্রতিটি কণিকা যাচ্ছে, ঐ কণিকার জন্য আমাদের

AMARBOI.COM

 বাংলার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগফল হবে কেবল ১নং বা দুই নম্বর ছিদ্র দিয়ে যাওয়া পথগুলির যোগফল। এটা কখনও এক নম্বর ও দুই নম্বর– উভয় ছিদ্র দিয়ে বের হওয়া পথগুলিকে একত্রে হিসেবে নিবে না। কারণ ফেইনম্যান ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, একটি ফুটোর ভেতর দিয়ে যাওয়া পথগুলি অন্য ফুটোর ভেতর দিয়ে যাওয়া পথগুলির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, যদি আপনি আলো ফেলে কোন ফুটো দিয়ে কণিকাগুলি যাচ্ছে এটা পর্যবেক্ষণ করতে যান। এভাবেই আপনি অন্য পথকে বাদ দিয়ে ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্নকে অদৃশ্য করে দেবেন। যখনই এ পরীক্ষা করা হবে অবশ্যই ৫৯ পৃষ্ঠার ছবির মতো তখন আলো ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন এর মতো সৃষ্টি করবে না এবং ৫৮ পৃষ্ঠার ছবির মতো প্যাটার্ন সৃষ্টি করবে। উপরন্তু, খুব দূর্বল আলো প্রক্ষেপ করে আমরা এই পরীক্ষার ফলাফল পরিবর্তন করতে পারি, যাতে সমস্ত কণিকা আলোর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। সে ক্ষেত্রে আমরা কেবল কণিকাগুলির পরবর্তী ধাপের 'কোন-পথ' তথ্য জানতে পারব। যদি আমরা এরূপ কণিকার পৌঁছানোর প্রাপ্ত তথ্য, 'কোন-পথ' তথ্য না জানা সাপেক্ষে বিভাজন করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, সাবসেটের (Subset) প্রাপ্ত তথ্যের, যে ক্ষেত্রে আমরা 'কোন-পথ' তথ্য সম্পর্কে জ্ঞাত নই– সেক্ষেত্রে একটি ইন্টারফেয়ারেন্স প্যাটার্ন তৈরী করবে এবং অন্যদিকে যেখানে আমরা 'কোন-পথ' তথ্য জানি, সে ক্ষেত্রে তথ্যগুলি কোনো ইন্টারফেয়ারেন্স প্যাটার্ন তৈরী করবে না।

এই ধারণায় তথ্য আমাদের 'অতীত' সম্পর্কে ধারণার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। নিউটনের তত্ত্বে 'অতীত' কোনো নির্দিষ্ট ঘটনাক্রম হিসেবে বিবেচিত। যদি আপনি দেখেন গতবছর ইতালি থেকে কেনা ফুলদানির ভাঙ্গা টুকরোগুলির উপর আপনার অবোধ শিশুটি দাঁড়িয়ে আছে, তখন আপনি এই দুর্ঘটনার পূর্বে কী ঘটেছিল তা বুঝতে পারেন। বাচ্চার ছোট আঙ্গুলগুলি পাত্রটি ফেলে দিয়েছে এবং নীচে পড়ে পাত্রটি ধারণার উপর ভিত্তি করে হাজার টুকরোয় পরিণত হয়েছে। মূলতঃ বর্তমান সময়ের ঘটনার সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়ার সাপেক্ষে নিউটনের সূত্র আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ চিত্র নির্ধারণে সাহায্য করে। বোঝার ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কষ্টের বা আনন্দের যাই হোক না কেন, এই পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অতীত আছে। হয়তো কেউ এই অতীত পর্যবেক্ষণ করেন নি, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই অতীত আছে এবং আপনি নিজে যেন বা ঐ অতীতের ছবি তুলে এনেছেন। কিন্তু কোয়ান্টাম বাকিবলের ক্ষেত্রে উৎস থেকে পর্দা পর্যন্ত এটা কোনো নির্দিষ্ট পথে চলেনা। আমরা বাকিবলের অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারি, কিন্তু এই পর্যবেক্ষণের জন্য আমাদের সবগুলি পথই বেছে নিতে হবে। কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান আমাদের বলে যে, আমাদের বর্তমান দেখাটা যতই সঠিক ও গভীর হোক না কেন, (না দেখা) অতীত ভবিষ্যতের মতোই অনির্দিষ্ট এবং কেবল সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল। কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের মতে এই মহাবিশ্বের কোনো একটি নির্দিষ্ট অতীত বা অতীত ইতিহাস নেই তা সত্য নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য এই যে, অতীতের কোনো নির্দিষ্ট রূপরেখা নেই– এর অর্থ বর্তমান যে পদ্ধতির উপর আপনি যে পর্যবেক্ষণ করছেন তা অতীতের উপর প্রভাব রাখছে। এই বিষয়টি পদার্থবিদ জন হুইলার এর একটি নাটকীয় পরীক্ষার দ্বারা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এই পরীক্ষার নাম 'দেরীতে-পছন্দ' পরীক্ষা (Delayed choice experiment)। পদ্ধতিগতভাবে 'দেরীতে-পছন্দ' পরীক্ষা দুই ছিদ্রবিশিষ্ট পরীক্ষার মতোই, যা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। সেখানে কোন কণিকা কী পথ অবলম্বন করে তা পর্যবেক্ষণের সুযোগ আছে। 'দেরীতে-পছন্দ' পরীক্ষার ক্ষেত্রে কণিকা পর্দার উপর না পড়া পর্যন্ত কণিকার পথ দেখার ইচ্ছাটা স্থগিত রাখতে হয়।

আমরা 'কোন-পথ' তথ্যের ফুটোদ্বয়ের পর্যবেক্ষণে (অথবা পর্যবেক্ষণ-রহিত অবস্থায়) যে তথ্য পেয়েছি, 'দেরীতে-পছন্দ' পরীক্ষার ফলাফল একই রকম। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিটি কণিকা যে পথ অবলম্বন করে– অর্থাৎ এর অতীত সময়ে– সেই পথ ছিদ্রের ভেতর দিয়ে যাবার অনেক পরে ধার্য করা হয়। এবং তা ধারণা করে 'ধার্য' করতে হয়, কণিকা কী একটিমাত্র ফুটো দিয়ে যাবে যাতে করে ইন্টারফিয়ারেন্স ঘটবে না অথবা দুটি ফুটো দিয়েই যাবে, যেখানে ইন্টারফিয়ারেন্স ঘটবে।

হুইলার এই পরীক্ষাটি একটি মহাজাগতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে বিলিয়ন বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূর থেকে শক্তিশালী কোয়াসার ফোটন কণিকা বিকিরিত করছে। এ ধরনের আলো দুটিপথে বিভক্ত করা যেতে পারত এবং চলার পথে গ্যালাক্সির ভেতর দিয়ে মহাকর্ষীয় লেন্সের মাধ্যমে পৃথিবীতে পুনঃপ্রক্ষেপন করা যেত। যদিও এ ধরনের পরীক্ষা বর্তমান প্রযুক্তিতে অসম্ভব, তবুও আমরা যদি এধরনের প্রক্ষেপিত আলো থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফোটন কণিকা সংগ্রহ করতে পারতাম তাহলে দেখা যেত যে তারা অবশ্যই ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন সৃষ্টি করছে। তারপরও আমরা যদি কোনো ডিভাইস 'কোন-পথ' তথ্য মাপার জন্য পর্যবেক্ষণের পূর্ব মুহূর্তে স্থাপন করতে পারতাম, তবে দেখা যেত সেই প্যাটার্নটি উধাও হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে কণিকা একটি পথ বা উভয় পথই বেছে নিবে কিনা তা বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পূর্বেই বলা যেতে পারত এবং আমাদের পৃথিবী সৃষ্টি বা সূর্যের সৃষ্টির পূর্বেই আমাদের ল্যাবরেটরীর প্রাপ্ত ফলাফল সেই বেছে নেয়াকে প্রভাবিত করতে পারত।

এই অধ্যায়ে আমরা কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের ধারণা দুই-ফুটো পরীক্ষার মাধ্যমে বর্ণনা করেছি। পরবর্তীকালে আমরা কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় ফেইনম্যানের তত্ত্বকে সমগ্র মহাবিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করে দেখব। আমরা দেখব যে, কণিকার মতো, মহাবিশ্বও কেবল একটি ইতিহাসের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। এখানে সম্ভাব্য অনেক সংঘটন আছে, এবং বর্তমানে আমাদের পর্যবেক্ষণের ফল অতীতের উপর প্রভাব ফেলে এবং মহাবিশ্বের বিভিন্ন প্রকার ইতিহাসের কথার উদ্ভব ঘটায়।

AMARBOI.COM

বিনোদনের পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা একটি কণিকার দুই-ফুটো পর্যবেক্ষণের মতোই, যেমন করে কণিকাটি অতীতের উপর প্রভাব ফেলেছে। সেই ব্যাখ্যায় আমরা দেখব কীভাবে আমাদের মহাবিশ্বে প্রকৃতির সূত্রগুলি বিগব্যাংগ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এটা দেখার পূর্বে আমরা অল্পকথায় সূত্রগুলি আসলে কী এবং কী রহস্য এই সূত্রগুলি সৃষ্টি করে, তা দেখব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

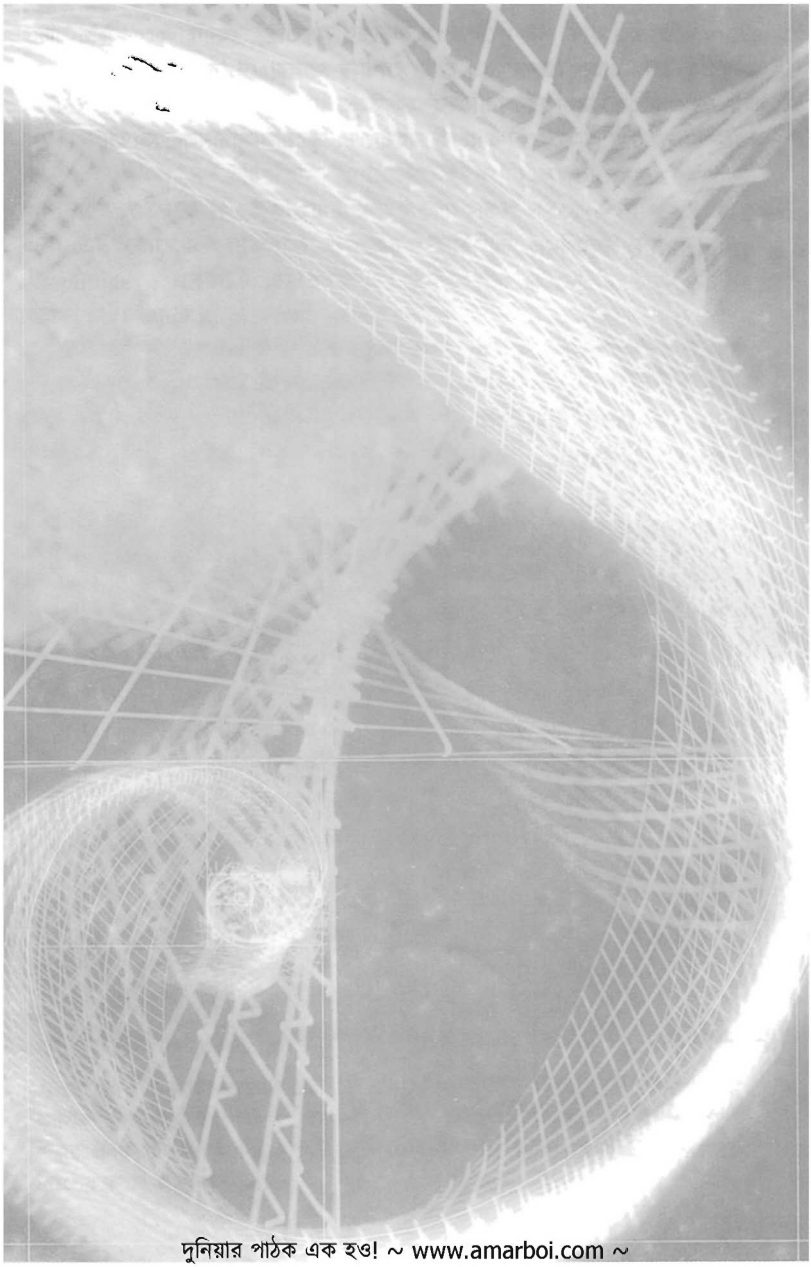

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছুর সূত্র

মহাবিশ্ব সম্পর্কে সবচেয়ে অবোধগম্য বিষয় হচ্ছে
এই, যে এটি বোধগম্য।

—আলবার্ট আইনস্টাইন

আমাদের মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্য বোধগম্য, কারণ এটা বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ, এর বৈশিষ্ট্যকে একটা ছকে ফেলা যায়। এই সূত্রসমূহ বা ছক কী রকমের? গাণিতিক ভাষায় প্রকাশকৃত প্রথম বলটি হচ্ছে মহাকর্ষ। ১৬৮৭ সালে প্রকাশিত নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে বলা হয়েছে যে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে এবং এই মহাকর্ষ বলের পরিমাণ বস্তুটির ভরের সমানুপাতিক। এই তত্ত্ব তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল– কারণ এই প্রথমবারের মতো মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট ছকের রূপরেখা সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হল, যাকে গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হল। পঞ্চাশ বছর আগে গ্যালিলিও প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে, প্রকৃতির যে একটি সূত্র আছে তা উদ্ভাবনের জন্য দোষি সাব্যস্ত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, বাইবেলের একটি গল্পে আছে, যশুয়া সূর্য ও চাঁদকে তাদের কক্ষপথে পরিক্রমণ বন্ধ করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে কানানের এ্যামোরাইটদের সাথে দিবালোকের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ করতে পারেন। যশুয়ার পুস্তক অনুযায়ী, সূর্য একদিনের জন্য স্থির ছিল। আজকের দিনে আমরা জানি যে, এর অর্থ পৃথিবী তার কক্ষপথে পরিভ্রমণ বন্ধ করে স্থির ছিল। যদি পৃথিবী ঘোরা বন্ধ করত, নিউটনের সূত্র অনুযায়ী আমাদেরকে এক কঠিন মূল্য শোধ করতে হত– কারণ যা কিছু পৃথিবীর সাথে বাঁধা নেই, তা গতিজড়তার ফলে পৃথিবীর মূল গতিতে (নিরক্ষরেখা বরাবর ঘণ্টায় ১১০০ মাইল বেগে) চলতে থাকত। এই সূত্র দেরীতে সূর্যাস্তের সাথে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে এই ধারণা কিন্তু নিউটনকে বিচলিত করে নি। কারণ আমরা জানি, নিউটন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর মহাবিশ্বের কার্যকলাপের ভেতর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখেন এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগ করেও থাকেন।

এর পরের ধাপ হল, মহাবিশ্বের বিদ্যুৎ ও চুম্বকীয় বলের তত্ত্বের আবিষ্কার। এ দুটি বল মহাকর্ষ বলের মতোই আচরণ করে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল দুটি একই রকম বৈদ্যুতিক বা চুম্বকীয় চার্জ একটি অপরটিকে বিকর্ষণ করে। আবার বিপরীতধর্মী চার্জ বা বিপরীত মেরুর চুম্বক একটি অপরটিকে আকর্ষণ করে। বিদ্যুৎ বা চৌম্বক বল মহাকর্ষ বলের চেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আমরা এটা অনুভব করি না কারণ, একটি বড় বস্তু প্রায় সমপরিমাণ ঋণাত্মক ও ধনাত্মক চার্জ দ্বারা গঠিত। এর অর্থ হল, বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় বল দুটি বড় বস্তুর মধ্যে একটি অপরটিকে প্রায় বিনাশ করে। এটা কিন্তু মহাকর্ষ বলের বিপরীত ধর্ম– যা কেবল আকর্ষক বল এবং যোগ হয়।

বিদ্যুৎ এবং চুম্বকবিদ্যার আমাদের বর্তমান জ্ঞান অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ গত প্রায় একশত বছরের ভেতর আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সময়কালে বিভিন্ন দেশের পদার্থবিদগণ বৈদ্যুতিক এবং চুম্বকীয় বল নিয়ে প্রচুর গবেষণা করছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার হল এই যে, বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় বল উভয়েই একে অপরের সাথে সম্পর্কিতঃ একটি চলমান বৈদ্যুতিক চার্জ চুম্বকের উপর বল সৃষ্টি করে এবং একটি চলমান চুম্বক বৈদ্যুতিক চার্জের উপর প্রভাব রাখে। ওলন্দাজ পদার্থবিদ হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড এটা প্রথম আবিষ্কার করেন। ১৮২০ সালে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেয়ার প্রাক্কালে তিনি দেখলেন যে, একটি ব্যাটারি থেকে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক কারেন্ট কাছাকাছি একটি কম্পাসের কাঁটাকে সরাচ্ছে। তিনি এটাকে নাম দিলেন 'তড়িৎচুম্বকীয়' বল। এর কয়েক বছর পর ইংরেজ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে যুগোপযোগী করে বললেন যে, যদি বিদ্যুৎশক্তি চুম্বকবলের সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে চৌম্বক বলেরও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা উচিত। তিনি এটা ১৮৩১ সালে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখালেন। চৌদ্দ বছর পর তড়িৎচুম্বকীয় বল ও আলোর ভেতর সম্পর্ক ফ্যারাডে আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখালেন তীব্র চুম্বকবল পোলারিত আলোর বৈশিষ্ট্যে প্রভাব ফেলে।

ফ্যারাডের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুবই কম ছিল। লন্ডনের কাছে দরিদ্র চর্মকারের পরিবারে তাঁর জন্ম এবং মাত্র তের বছর বয়সে উদ্দেশ্যহীন স্কুলত্যাগী এক বালক, যিনি একটি বই বাঁধাইকারী দোকানে বাঁধাইয়ের কাজ শুরু করেন। সেখানে কয়েকবছর কাজের মধ্যে তার রক্ষণাবেক্ষণের বইগুলি থেকে তিনি বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হন। অবসর সময়ে তিনি সাধারণ মানের সহজ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বিখ্যাত রসায়নবিদ স্যার হামফ্রে ডেভীর পরীক্ষাগারে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন। জীবনের বাকী পঁয়তাল্লিশ বছর তিনি সেখানে নিযুক্ত ছিলেন। ডেভীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ফ্যারাডে

AMARBOI.COM

বিনামূল্যে পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

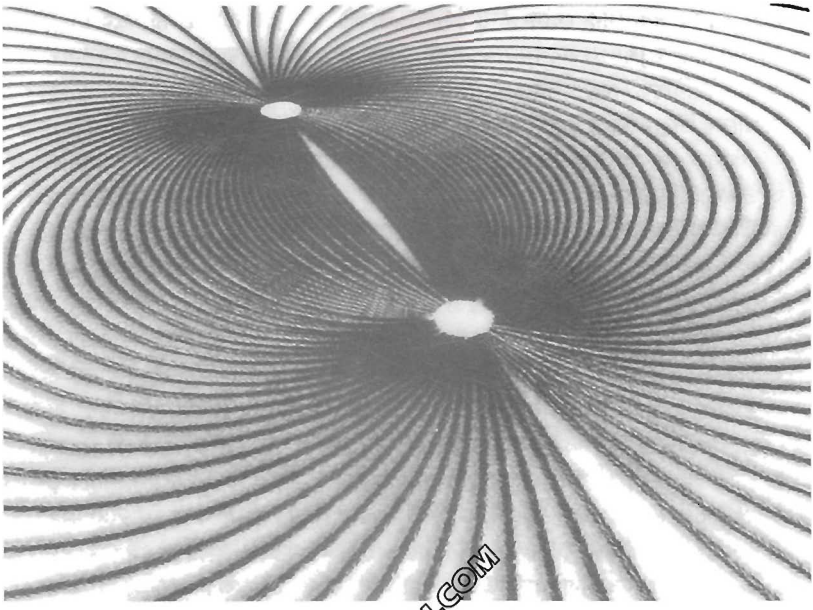

বলক্ষেত্র : দণ্ড চুম্বকের বলক্ষেত্র লোহার গুঁড়ো দ্বারা সৃষ্ট চিত্র।

AMARBOI.COM

গণিতশাস্ত্রে দূর্বল ছিলেন। এটা শেখার সুযোগ তিনি পাননি, অতএব তড়িৎ চুম্বকীয় ধর্মের যে নমুনা তিনি ল্যাবরেটরীতে দেখেছেন, সেটার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা তাঁর জন্য কঠিন ছিল। তা সত্ত্বেও, তিনি তা করেছিলেন।

ফ্যারাডের একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল বলের ক্ষেত্র সম্পর্কিত ধারণা। আজকের দিনে বই এবং সিনেমার কল্যাণে ভয়ংকর চোখবিশিষ্ট ভিনগ্রহের প্রাণী এবং তাদের নভোযান সম্পর্কে আমরা সবাই পরিচিত, সে হিসেবে ফ্যারাডের রয়ালিটি পাওয়া উচিত। সেই শতাব্দীতে নিউটন এবং ফ্যারাডের মধ্যবর্তী সময়ে পদার্থবিদ্যার বড় মাপের অবাক করা আবিষ্কার হল দুটি বস্তুর শূন্যস্থানের ভেতর দিয়ে কোনো বলের প্রভাবে বস্তু দুটিকে প্রভাবিত করা। ফ্যারাডে এরকম ধারণাকে, যৌক্তিক মনে করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, কোনো বস্তুকে সরাতে হলে কোনো কিছুকে ঐ বস্তুর সংস্পর্শে আসতে হবে। তিনি কল্পনা করলেন যে, বৈদ্যুতিক চার্জ এবং চুম্বকের ভেতর শূন্যস্থান অদৃশ্য টিউব দ্বারা পূর্ণ, যা ধাক্কা ও টান দিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করে। ফ্যারাডে এই টিউবগুলিকে বলের ক্ষেত্র বলে অভিহিত করলেন। এই বলের ক্ষেত্র প্রমাণের উৎকৃষ্ট পরীক্ষা হল একটি দণ্ড চুম্বকের উপর একটি কাঁচের প্লেট রেখে তার উপর লোহার গুড়া ছড়িয়ে দেয়া।

কিছুটা নড়াচড়া করে লোহার গুঁড়োগুলো অদৃশ্য শক্তির সাহায্যে বৃত্তের চাপের মতো দণ্ড চুম্বকের এক মেরু থেকে অন্য মেরুতে একটি সুদৃশ্য প্যাটার্ন তৈরি করে। এই প্যাটার্ন হল অদৃশ্য চুম্বকবল, যা শূন্যস্থান ভেদ করে সৃষ্টি হয়েছে। আজকের দিনে আমরা জানি যে সমস্ত বলই ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। অতএব এটা আধুনিক বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য ধারণা এবং একই সাথে বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনীর মূল ভিত্তি।

কয়েক দশক ধরে তড়িৎচুম্বকীয় বল সম্পর্কে আমাদের ধারণা কতগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেটা হল, রহস্যজনকভাবে বিদ্যুৎ ও চুম্বকীয় বল পরস্পর যুক্ত, আলোর সাথে এদের একটা সম্পর্ক আছে এবং ক্ষেত্রের বিষয়ে একটি প্রাথমিক ধারণা সম্বলিত চিত্র। তড়িৎচুম্বকীয় বিষয়ে কমপক্ষে এগারোটি তত্ত্ব ছিল এবং এদের প্রত্যেকটিতে ত্রুটি ছিল। পরবর্তী কয়েক বছর ধরে ১৮৬০ সালের দিকে স্কটিশ পদার্থবিদ জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ফ্যারাডের চিন্তাকে গাণিতিক মডেলে রূপ দিলেন, যা বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় এবং আলোর ভেতর ঘনিষ্ট ও রহস্যজনক সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রদান করল। ফলাফল ছিল একঝাঁক সমীকরণ, যা বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় বল উভয়কেই একই রকমের ভৌতসত্তার অভিব্যক্তি বল হিসেবে পরিগণিত করলো– যার নাম হল তড়িৎচুম্বকীয় বল। ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ ও চুম্বককে একটি মাত্র বলে একীভূত করেন। উপরন্তু তিনি দেখালেন যে তড়িৎচুম্বকীয় বল শূন্যস্থানের ভেতর দিয়ে তরঙ্গের মতো চলাচল করতে পারে। এই তরঙ্গের নীতি একটি সংখ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা তাঁর সমীকরণে উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কয়েক বছর পূর্বে উল্লেখ করেছেন। তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, তাঁর প্রাপ্ত গতির মান আলোর গতির সমান। তিনি আবিষ্কার করলেন যে, আলো নিজেই হচ্ছে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ।

আজকের সময়ে যে সমীকরণ দ্বারা বিদ্যুৎ ও চুম্বকীয় ক্ষেত্রের বর্ণনা করা হয়, তাকে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ বলা হয়। কিছু মানুষ এটা সম্পর্কে জানেন, কিন্তু এই সমীকরণই সম্ভবত বাণিজ্যিকভাবে প্রয়োগকৃত সফল সমীকরণ। এটা কেবল গৃহস্থালীর সরঞ্জাম থেকে কম্পিউটার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা আলোর বাইরেও তরঙ্গের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যেমন মাইক্রোওয়েভ, রেডিও ওয়েভ, ইনফ্রারেড আলো এবং এক্স-রে। এই সবগুলি আমাদের দেখা চোখের আলো থেকে ভিন্নতর একটি কারণে, তা হল এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য। রেডিও তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক মিটার বা এর বেশি, দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক মিটারের দশ মিলিয়নের কয়েকভাগ মাত্র এবং এক্সরের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক মিটারের শত মিলিয়ন ভাগের একভাগের চেয়ে ছোট। আমাদের সূর্য সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যই বিকিরণ করে কিন্তু, বিকিরণমাত্রা কেবল আমাদের দৃশ্যমান আলোকমাত্রার মধ্যেই বেশি। এটা সম্ভবত কোনো দুর্ঘটনা নয় যে আমাদের খালি চোখে দৃশ্যমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য সীমার মধ্যেই সূর্য বেশি আলো বিকিরণ করে। এটা সম্ভবত এই জন্য যে আমাদের চোখ এভাবেই বিকশিত হয়েছে। যদি কেউ ভিন্ন কোনো গ্রহের বাসিন্দা হত, তাহলে তাদের দৃষ্টিসীমা

AMARBOI.COM

 বিনামূল্যে পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

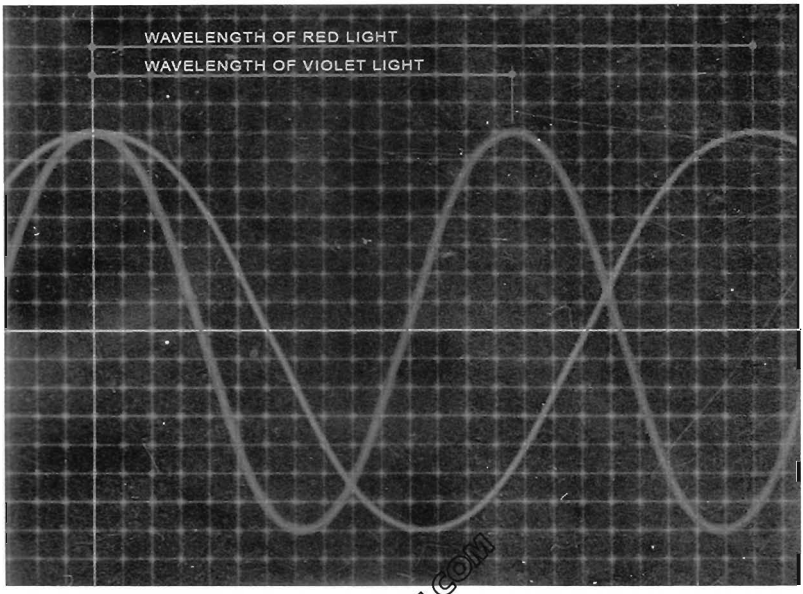

তরঙ্গদৈর্ঘ্য : মাইক্রোওয়েভ, রেডিও ওয়েভ, ইনফ্রারেড আলো, এক্সরে এবং আলোর বিভিন্ন রঙ কেবল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কারণে পৃথক।

AMARBOI.COM

তাদের গ্রহের সূর্যের সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যই দেখতে সক্ষম হত, যা ঐ গ্রহের আলোর প্রতিবন্ধক ধুলি গ্যাসের আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উদবর্তিত। অর্থাৎ ভিন গ্রহের বাসিন্দা যারা এক্সরের মধ্যে বিকশিত ও বর্ধিত, তারা আমাদের বিমান বন্দরের নিরাপত্তায় উঁচু বেতনে চাকরী পেতেন।

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ অনুযায়ী বিদ্যুত চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বা ঘণ্টায় ৬৭০ মিলিয়ন মাইল গতিতে চলে। কিন্তু কোনো গতি উল্লেখ করলে কিসের সাপেক্ষে এই গতি তার উল্লেখ করা প্রয়োজন, না হলে এটা অর্থহীন মনে হয়। এটা আমাদের প্রতিদিনের জীবন যাপনের জন্য উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় নয়। যখন কোনো গতিসীমা নির্ধারক সাইনবোর্ডে প্রতি ঘণ্টায় ষাট মাইল উল্লেখ করা হয়, তখন এটা ধরা হয় যে আপনার গতিসীমা রাস্তার দৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে ধরা হয়েছে। এটা মিল্কিওয়ের ভেতর কালোবিবরের সাপেক্ষে নয়। এতদসত্ত্বেও প্রতিদিনের জীবন যাপনে কখনও কখনও একটি তুলনীয় অবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো জেট বিমানে যদি আপনি এককাপ চা বহন করতে যান, আপনি তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে পারেন যে আপনার গতি ঘণ্টায় দুই মাইল মাত্র। অথচ ভূমিতে অবস্থিত কেউ বলতে পারেন যে আপনি ঘণ্টায় ৫৭২ মাইল গতিতে চলছেন। দুজনের দাবীই সত্য। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, কিন্তু কেউ যদি মহাকাশের কোনো বস্তুর উপরের অবস্থান থেকে দেখে, তাহলে দুটোই ভুল মনে হবে; সে ক্ষেত্রে আপনার গতি হয়তো প্রতি সেকেন্ডে আঠারো মাইল হবে। এই বিভ্রান্তির আলোকে ম্যাক্সওয়েল যখন আলোর গতি তাঁর সমীকরণের সাহায্যে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই গতি কিসের সাপেক্ষে?

এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণই নেই যে, ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণে আলোর গতি পৃথিবীর সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হয়েছে। তার সমীকরণ মোটের উপর সমগ্র মহাবিশ্বের আলোকেই বর্ণনা করা হয়েছে। ভিন্ন একটি উত্তর কিছুক্ষণের জন্য ধারণা করা যায় যে ম্যাক্সওয়েলের আলোর গতি পূর্বে অনাবিষ্কৃত মাধ্যম, যা সমগ্র স্থানে বিরাজমান– ইথারের ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এটা এরিস্টোটলের ইথার, যিনি বিশ্বাস করতেন মহাবিশ্বের সর্বত্র ইথার দ্বারা পরিপূর্ণ। এই কাল্পনিক ইথারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের চলাচল। ইথার তার মাধ্যম। শব্দ যেমন বাতাসের মধ্য দিয়ে চলাচল করে এটা তেমনই। যদি ইথার থাকত, তবে স্থির অবস্থানের একটি মাপ থাকত (অর্থাৎ ইথারের সাপেক্ষে স্থির অবস্থান) এবং তাহলে গতির সংজ্ঞার একটি সুনির্দিষ্ট মাপ পাওয়া যেত। ইথার সমগ্র মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট তুলনার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হত। যার সাপেক্ষে কোনো বস্তুর গতির পরিমাপ নির্ণয় করা যেত। অতএব তাত্ত্বিকভাবে ইথারের বাস্তবতা প্রমাণ করার জন্য বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট ছিলেন, আর ম্যাক্সওয়েল ছিলেন তাদের ভেতর একজন।

যদি আপনি একটি শব্দ তরঙ্গের দিকে বাতাসের ভেতর দিয়ে দৌড়ান, তরঙ্গ দ্রুততর গতিতে আপনার দিকে আসবে; আর যদি আপনি শব্দতরঙ্গের উল্টো দিকে দৌড়ান, তাহলে তরঙ্গ ধীরগতিতে আপনার দিকে যাবে। একইভাবে যদি ইথার থাকত, তাহলে আলোর গতি ইথারের সাপেক্ষে আপনার গতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হত। আসলে, যদি আলো শব্দের মতো কাজ করত, যেমন কোনো সুপারসনিক জেট বিমানের পেছন দিয়ে নির্গত শব্দ আরোহী শুনবে না, তেমনি যথেষ্ট দ্রুতগতিতে কোনো দৌড়বিদ ইথারের ভেতর দিয়ে দৌড় দিলে আলোর গতির চেয়ে দ্রুততর চলবেন। এই মতের উপর নির্ভর করে ম্যাক্সওয়েল একটি পরীক্ষা করলেন। যদি ইথার থেকে থাকে, পৃথিবী অবশ্যই এর ভেতর দিয়ে আবর্তিত হবে– যেমন তা সূর্যের কক্ষপথে চলে। এবং যেহেতু পৃথিবী জানুয়ারি মাসে কক্ষপথে ভিন্নদিকে আবর্তিত হয়, তাহলে ধরুন, এপ্রিল বা জুলাই মাসে একজন দর্শক বছরের বিভিন্ন সময়ে আলোর গতির সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখতে পাবেন। পরের পৃষ্ঠার ছবিটি লক্ষ করুন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

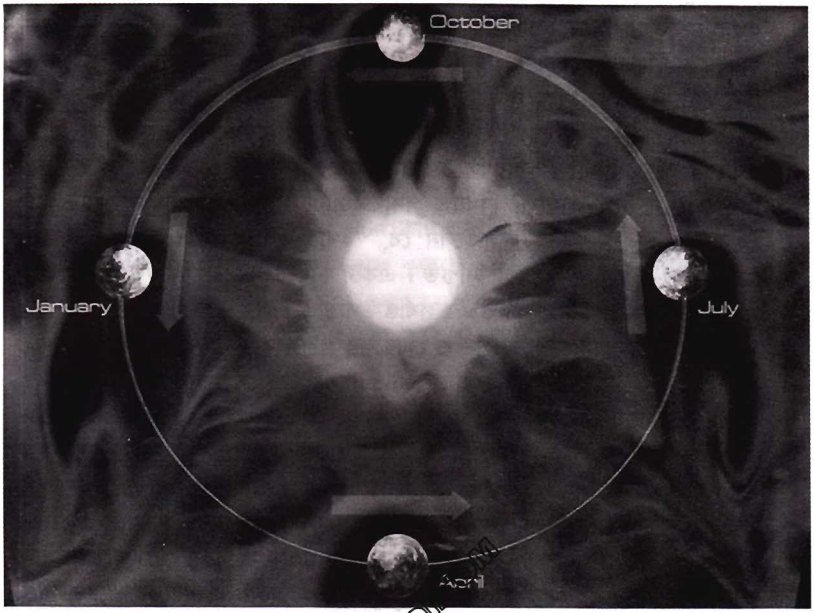

ইথারের মধ্যে চলাচল : যদি আমরা ইথারের মধ্য দিয়ে চলি, তবে আমরা অবশ্যই বছরের বিভিন্ন মাসের বিভিন্ন মাপের আলোর গতি পর্যবেক্ষণ করব।

AMARBOI.COM

ম্যাক্সওয়েল তার এই ধারণা 'প্রসিডিংস অব দ্য রয়েল সোসাইটি'র, সম্পাদকের সাথে বিনিময় করেন; যিনি এটা কার্যকর যুক্তি মনে করেন নি। কিন্তু ১৮৭৯ সালে পাকস্থলি ক্যান্সারে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে মৃত্যুর অল্প কিছু পূর্বে এ বিষয়ে ম্যাক্সওয়েল তাঁর এ ভাবনা নিয়ে এক বন্ধুর কাছে পত্র দেন। ঐ চিঠিটি 'ন্যাচার' জার্নালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়, যা একজন মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট মাইকেলসনের দৃষ্টিগোচর হয়। ১৮৮৭ সনে ম্যাক্সওয়েলের ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মাইকেলসন ও এডওয়ার্ড মোরলে একটি অতি সংবেদনশীল পরীক্ষা করলেন অর্থাৎ পৃথিবী ইথারের ভেতর দিয়ে কী গতিতে চলাচল করে তা নির্ণয় করতে উদ্যোগী হলেন। তাঁদের ধারণার বিষয় ছিল দুটি ভিন্ন দিকে, সমকোণে চলা বস্তুর সাথে আলোর গতির তুলনা করা। যদি ইথারের সাপেক্ষে আলোর গতির মান নির্দিষ্ট হয়, তাহলে আলোকরশ্মির দিকের সাপেক্ষে আলোর গতি ভিন্নতর হবে। কিন্তু মাইকেলসন ও মোরলে গতির কোনো পার্থক্য দেখতে পেলেন না।

মাইকেলসন ও মোরলের পরীক্ষার ফলাফল নিশ্চিতভাবে বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ইথারের ভেতর দিয়ে চলাচলের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ইথারের সামগ্রিক ধারণাকে পরিত্যক্ত ঘোষণার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু মাইকেলসনের পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ইথারের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর গতি নির্ধারণ করা– তা ইথারের ধারণার সপক্ষে বা বিপক্ষের কোনো বিষয় ছিল না। তিনি যে ফলাফল পেয়েছিলেন তা দিয়ে ইথারের অস্তিত্ব নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত প্রদান সম্ভব ছিল না। কেউই এরকম কোনো সিদ্ধান্ত দেন নি। আসলে, বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম থমসন (লর্ড কেলভিন) ১৮৮৪ সালে বলেছিলেন যে, "ইথার হল একমাত্র বস্তু যে বিষয়ে গতিবিদ্যার আলোকে আমরা নিশ্চিত। একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিত, সেটা হল জাজ্বল্যমান ইথারের বাস্তবতা ও এর পর্যাপ্ত উপস্থিতি।"

আপনি কী করে মাইকেলসন ও মোরলের পরীক্ষার ফলাফলের পরেও ইথারে বিশ্বাস করতে পারেন? আমরা বলি, এটা প্রায়শঃ ঘটে যে মানুষ একটা মডেলের ধারণাকে আগাম লালনপালন ও পোষণ করে। কেউ বললেন যে পৃথিবী ইথারকে সাথে নিয়ে টেনে চলে, অতএব আমরা ইথারের সাপেক্ষে চলাচল করি না। ওলন্দাজ পদার্থবিজ্ঞানী হেন্ড্রিক এনটুন লরেন্জ এবং আইরিশ পদার্থবিজ্ঞানী জর্জ ফ্র্যান্সিস ফিটজেরাল্ড ধারণা দিলেন যে, একটা ফ্রেম যা ইথারের সাপেক্ষে চলছে– সম্ভবত কোনো অজানা যান্ত্রিক কারণে ঘড়ি ধীরে চলায় বা দূরত্ব ছোট হয়ে আসায় আলোকগতির একই মান পাওয়া যাচ্ছে। ইথারকে রক্ষায় এ ধরনের প্রচেষ্টা বিশ বছর অব্যাহত ছিল, যতক্ষণ না বার্ণ শহরের এক অখ্যাত পেটেন্ট কেরানী আলবার্ট আইনস্টাইনের একটি যুগান্তকারী প্রবন্ধ প্রকাশিত না হল।

১৯০৫ সালে ২৬ বছর বয়সে আইনস্টাইনের 'অন দি ইলেক্ট্রডায়নামিক্স অব মুভিং বডিস' প্রকাশিত হয়। এতে তিনি একটি সরল ধারণা উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন যে পদার্থবিদ্যার সূত্রসমূহ বিশেষ করে আলোর গতি একই রকমভাবে চলমান দর্শকদের নিকট একই হবে। এই ধারণা আমাদের চিন্তা জগতে স্থান ও কাল (সময়) এর ব্যাপারে বিপ্লব সৃষ্টি করল। কেন? ধরুন একটি জেট বিমানে দুটি ঘটনা দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই জায়গায় সংগঠিত হলো। জেট বিমানের ভেতরে থাকা দর্শকের কাছে দুটি ঘটনার দূরত্ব শূন্য। কিন্তু ভূমিতে দ্বিতীয় দর্শক ঘটনা দুটি বিভিন্ন দূরত্বে ঐ সময়ের ব্যবধানে ঘটেছে বলে দেখতে পাবেন। এর অর্থ হল দু'জন দর্শক, যারা একজন অন্যজনের সাপেক্ষে চলমান, তারা উভয়ে দুটি ঘটনা ঘটার দূরত্বের বিষয়ে একমত হবেন না।

এখন ধরুন, দুজন দর্শক আলোর একটি ঝলক উড়োজাহাজটির লেজের দিক থেকে নাকের দিকে যেতে দেখলেন। উপরের উদাহরণের মতো তারা উভয়ে আলোর ঝলকটি লেজ থেকে নাকে যাওয়ার দূরত্বের মানের বিষয়ে একমত হবেন না। যেহেতু গতি হল অতিক্রান্ত দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগের ফলাফল। এর অর্থ হল, তারা যদি উভয়ে আলোর গতির বিষয়ে একমত হন–

বিজ্ঞানের পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

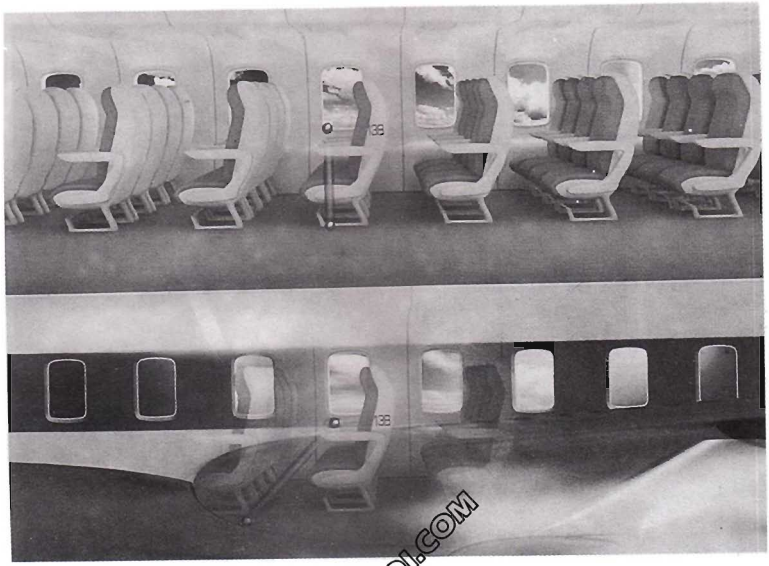

এয়ারবোর্ণ জেট : আপনি যদি জেট বিমানে একটি বল বাউন্স করেন, বিমানের ভেতর একজন দর্শক প্রতিবার একই জায়গায় বলটিকে আঘাত করতে দেখছেন। অন্যদিকে ভূমিতে অবস্থিত একজন আঘাতের স্থানের মধ্যে বিশাল দূরত্ব দেখতে পাচ্ছেন।

AMARBOI.COM

তাহলে তারা আলোর ঝলকের শুরু এবং নাকের কাছে পৌছার সময় নিয়ে দ্বিমত পোষণ করবেন।

এখানে বিস্ময়কর বিষয় হল, যদিও দুজন দর্শক দুরকম সময় পরিমাপ করছেন, তারা কিন্তু উভয়েই একই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছেন। আইনস্টাইন এটা প্রমাণের জন্য কোনো কৃত্রিম ব্যাখ্যা প্রদানে সচেষ্ট হন নি। তিনি যুক্তিনির্ভর বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন এই বলে যে, বলটি যতটুকু দূরত্ব যে সময়ে অতিক্রম করেছে সেই পরিমাপটি তার দর্শকের উপর নির্ভর করে। এই ফলাফলের ফল আইনস্টাইন এর ১৯৩৫ সনের প্রকাশিত নিবন্ধের মূল কথা– যাকে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব নামে অভিহিত করা হয়।

আমরা এখন দেখতে পারি কিভাবে এই ব্যাখ্যা সময় নির্দেশকারী যন্ত্রে প্রয়োগ করা যায়। ধরা যাক, দুজন পর্যবেক্ষণকারী একটি ঘড়ির দিকে নজর রাখছে। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মতে, যিনি ঘড়ির সাপেক্ষে স্থির থাকেন তার কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

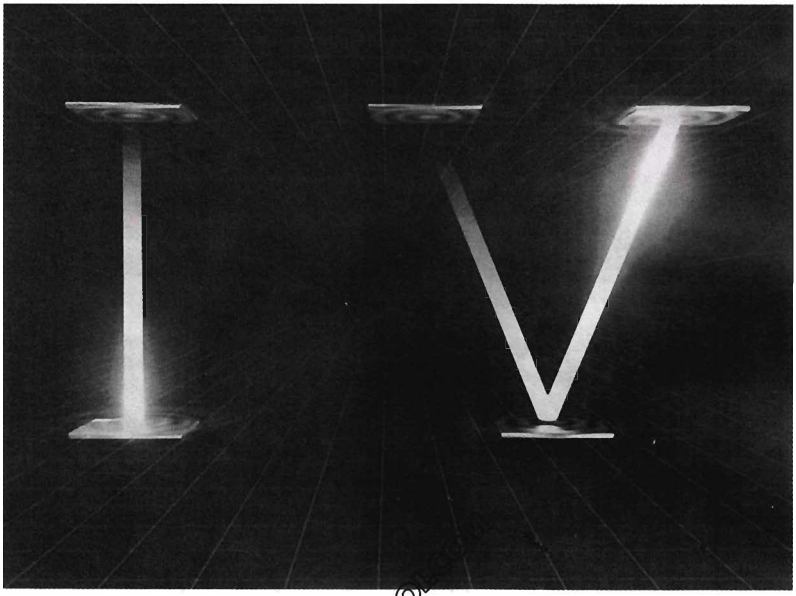

সময়ের বিস্তৃতি : চলন্ত ঘড়িটিকে মনে হয় ধীরে চলছে। কারণ এটা জৈব ঘড়ির জন্যও সত্য, চলন্ত মানুষ ধীরে বুড়ো হন, কিন্তু আশাবাদী হওয়া ঠিক না– প্রতিদিনের গতিতে, কোনো সাধারণ ঘড়ি এই পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না।

ঘড়িটি দ্রুততর চলছে। যে দর্শক ঘড়ির সাপেক্ষে স্থির অবস্থানে নেই, তার কাছে ঘড়িটি ধীরে চলছে। যদি আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেই আলোকচ্ছটাটি, যা প্লেনের লেজ থেকে নাকের দিকে যাচ্ছে, ঘড়ির মাধ্যমে দেখি, আমরা দেখব যে দর্শক ভূমিতে আছেন তিনি দেখবেন ঘড়িটি ধীর গতিতে চলছে। কারণ আলোর ঝলকানিটিকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। এই প্রভাবটি ঘড়ির যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে না, এটা সব ঘড়ির জন্য একই রকম, এমনকি আমাদের জৈব ঘড়ির জন্যও সত্য।

আইনষ্টাইন দেখালেন যে, নিউটনের মতানুযায়ী স্থিতিজড়তার মতো সময় কোনো স্বয়ম্ভু বা পরম বিষয় হতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায় সময়ের প্রতিটি ক্ষণের ঘটনা বর্ণনায় সব দর্শক একমত পোষণ করতে পারেন না। অর্থাৎ প্রতিজন দর্শকের জন্য সময়ের প্রতি ক্ষণের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে এবং দুজন দর্শক যারা একজন আরেকজনের সাপেক্ষে চলছে তারা ঐ সময়ের ক্ষণের বর্ণনায় ভিন্নমত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোষণ করবে। আইনস্টাইনের এই ধারণা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের স্বাভাবিক গতির সাপেক্ষে ধরা পড়ে না। কিন্তু এটা বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ঘড়িকে পৃথিবীর কেন্দ্রে স্থির অবস্থানে রাখা হল, আরো একটি ঘড়িকে পৃথিবীর পৃষ্ঠে এবং আরো একটি ঘড়িকে একটি উড়োজাহাজে রাখা হল। উড়োজাহাজটি পৃথিবীর ঘূর্ণনের দিকে অথবা তার উল্টো দিকে উড়ে চলছে। এখন পৃথিবীর কেন্দ্রে থাকা ঘড়িটির সাপেক্ষে উড়োজাহাজের ভেতরের ঘড়িটি– যা পূর্বদিকে চলছে (পৃথিবীর ঘূর্ণনের দিকে) সেটা পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থিত ঘড়িটির চেয়ে দ্রুততর চলবে, যদিও এটার তুলনামূলকভাবে ধীরে চলা উচিত। একইভাবে পৃথিবীর কেন্দ্রের ঘড়িটির সাপেক্ষে, উড়োজাহাজটি পশ্চিমদিকে চললে (অর্থাৎ পৃথিবীর ঘূর্ণনের বিপরীত দিকে)– পৃথিবীর পৃষ্ঠে থাকা ঘড়ির সাপেক্ষে ধীরগতিতে চলবে। এর অর্থ, পৃথিবীর পৃষ্ঠে থাকা ঘড়িটির চেয়ে এটা দ্রুততর চলা উচিত। এটা ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। একটি অতি নির্ভুল পারমাণবিক ঘড়ি পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অর্থাৎ আপনি পূর্বদিকে উড়ে চললে আপনার জীবন দীর্ঘায়িত হবে– যদিও বিমানের ভেতর চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে আপনি বিরক্ত হবেন। যাই হোক, এই দীর্ঘায়ু জীবন এর পরিমাণ খুবই স্বল্পকাল, একটি চক্রের এক সেকেন্ডের ১৮০ বিলিয়ন ভাগের একভাগ মাত্র। (এটা আরও কম হবে যদি মহাকর্ষ বলকে হিসেবের ভেতর ধরি, কিন্তু আমরা এটা নিয়ে এখন আলোচনা করব না।)

আইনষ্টাইনের এই আবিষ্কারের ফলে পদার্থবিদগণ এটা বুঝতে পারলেন যে সকল অবস্থান ও অবস্থার সাপেক্ষে আলোর গতির মান নির্দিষ্ট ধরলে, ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ ও চুম্বকীয় তত্ত্বের যে ধারণা অর্থাৎ সময়কে স্থানিক ত্রিমাত্রিক ধারণার বিবেচনার বাইরে রাখা যায় না। উপরন্তু, সময় এবং স্থান একটি অপরটির সাথে জড়িত। এটা অনেকটা চতুর্থ দিকমাত্রা যুক্ত করার মতো, যথা : ভবিষ্যৎ/অতীতকে সাধারণ মাত্রা বাম/ডান, অগ্র/পশ্চাত, উপর/নীচ এর সাথে যুক্ত করার মতোই। পদার্থবিদগণ এই স্থান ও কালের সম্পর্ককে "স্থান-কাল" নামকরণ করলেন, স্থান-কাল চতুর্থ দিক হিসেবে বিবেচনায় এলো। তারা এটাকে চতুর্থ মাত্রা হিসেবে নির্ধারণ করলেন। স্থান-কালের হিসেবের ভেতর সময় ত্রিমাত্রিক স্থানের ধারণার সাথে একীভূত হল, এটা আর বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় হিসেবে রইল না।

সাদামাটা ভাবে বললে, একজন দর্শকের কাছে বাম/ডান, অগ্র/পশ্চাৎ বা উপর/নীচের মতোই সময়ের গতি দর্শকের গতির উপর নির্ভর করেই বিবেচিত হয়েছে। একজন দর্শক বিভিন্ন গতিতে স্থান-কালের ভেতর সময়ের বিভিন্ন দিক গ্রহণযোগ্যভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন। আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তাই একটি নতুন ধারণা বা মডেল, যা সময়ের পরমত্ব বা পরম স্থিতাবস্থার (অর্থাৎ স্থির ইথারের সাপেক্ষে স্থির) ধারণা থেকে মুক্ত করলো।

AMARBOI.COM

আইনষ্টাইন শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে আপেক্ষিকতাবাদের সাথে মহাকর্ষ বলকে গ্রহণযোগ্য করতে সূত্রের একটি পরিবর্তন প্রয়োজন। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি বস্তু অপর বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়, যার বল ঐ দুটি বস্তুর ঐ সময়ে দূরত্বের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদ, পরম সময়ের ধারণাকে বর্জন করেছে, অতএব কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দুইটি বস্তুর দূরত্ব পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অতএব নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র বিশেষ আপেক্ষিকতার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এক্ষেত্রে নিউটনের সূত্রটির পরিমার্জন প্রয়োজন। এই তাত্ত্বিক সাংঘর্ষিক অবস্থাকে জটিল মনে হতে পারে, কিন্তু বিস্তারিতভাবে কাজ করলে মূল সূত্রের সামান্য পরিবর্তনই যথেষ্ট। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, তা সত্যের চেয়ে অনেক দূরে নয়।

পরবর্তী এগারো বছরে আইনস্টাইন মহাকর্ষের নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন যাকে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ বলা হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মতে মহাকর্ষের ধারণা নিউটনের মহাকর্ষের ধারণার মতো নয়। উপরন্তু এটা নির্ভর করে যুগান্তকারী স্থান-কালের ধারণার উপর; যা সমতল নয় বলে উল্লেখ করা হল। বরং স্থান-কাল বাঁকানো এবং এর ভেতরের ভর এবং শক্তির কারণে এটা মোচড়ানো বা বাঁকানো।

এই বক্রতার বা মোচড়ানোর ছবিটি চিন্তা করার উত্তম উদাহরণ হল পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ। যদিও পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ দ্বিমাত্রিক (কারণ সেখানে কেবল দুটি মাত্রাই বিদ্যমান; ধরা যাক, উত্তর/দক্ষিণ এবং পূর্ব/পশ্চিম)। আমরা এই পৃষ্ঠদেশকেই আমাদের উদাহরণ হিসেবে বেছে নিব; কারণ বাঁকানো দ্বিমাত্রিক স্থান, বাঁকানো চতুর্মাত্রিক স্থানের চেয়ে উদাহরণ হিসেবে বোঝা সহজতর। বাঁকানো স্থানের

AMARBOI.COM

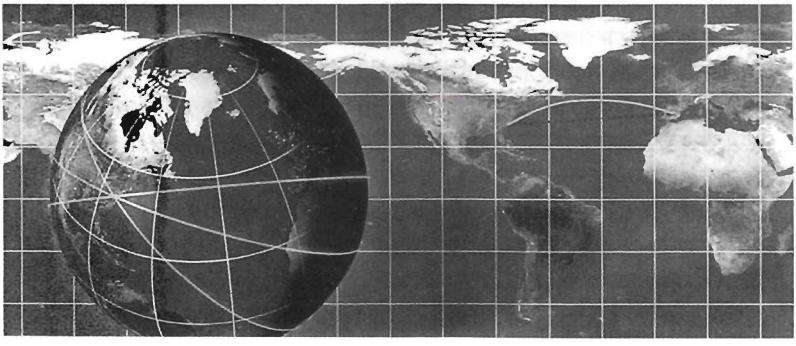

ভূগোলকাকৃতি : সমতল মানচিত্রের উপর দুটি বিন্দুর ন্যূনতম দূরত্ব বাঁকানো রেখা বলে মনে হয়।

বিনামূল্যে পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যামিতি, অর্থাৎ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের জ্যামিতি আমাদের পরিচিত ইউক্লিডিও জ্যামিতি নয়। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে দুটি স্থানের ন্যূনতম দূরত্ব ইউক্লিডিও জ্যামিতি অনুযায়ী সরল রেখায় যুক্ত দুটি স্থানের দূরত্বের সমান। একে আমরা বৃহৎবৃত্তের ভেতর দিয়ে টানা রেখা দ্বারা বুঝি। (একটি বৃহৎ বৃত্ত হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের উপর সেই বৃত্ত, যার কেন্দ্র পৃথিবীর কেন্দ্রের সাথে মিশে যায়। নিরক্ষবৃত্ত এমনই একটি বৃত্তের উদাহরণ, অতএব এরকম যে কোনো বৃত্তই বৃহৎবৃত্ত যা বিভিন্ন দিকে টানা নিরক্ষবৃত্তের মতোই)।

ধরুন, আপনি নিউইয়র্ক থেকে মাদ্রিদ যেতে চান, দুটি শহরই অক্ষরেখা (Latitude) বরাবর একই দূরত্বে অবস্থিত। যদি পৃথিবী পৃষ্ঠ সমতল হত, তা হলে ন্যূনতম দূরত্ব হত সোজা পূর্বদিক বরাবর রেখার দূরত্বের সমান। যদি আপনি ঐ পথে যান, তবে দূরত্ব হবে ৩৭০৭ মাইল। কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠের বক্রতার জন্য আর একটি পথ আছে। সেটি বাঁকানো এবং দেখতে বেশী দূরের মনে হবে, কিন্তু আসলে সেই পথই কম দূরত্বের। সে পথের দূরত্ব ৩৬০৭ মাইল, যদি আপনি বৃহৎবৃত্তের পথে চলেন। সেটা হল, প্রথমে আপনি উত্তর-পূর্ব দিকে যান, তারপর ধীরে পূর্বে এবং পরে দক্ষিণ-পূর্বে। এই দুটি পথের দূরত্বের এই পার্থক্য হচ্ছে পৃথিবীপৃষ্ঠের বক্রতার জন্য। এটা ইউক্লিডিও জ্যামিতির মতো নয়। বিমান কোম্পানীগুলির এটা জানা আছে এবং পাইলটরা সুযোগমত বৃহৎবৃত্তের পথ অনুসরণ করে থাকেন।

নিউটনের গতিসূত্রের মতে কামানের গোলা ও অন্যান্য বস্তু বা গ্রহসমূহ সরলপথে চলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো বল প্রয়োগ করা না হয়, যেমন ধরা যাক মহাকর্ষ বল। আইনস্টাইনের সূত্রমতে মহাকর্ষ বল অন্যান্য বলের মতো নয়; এই বলের ফলে ভর স্থান-কালকে বিকৃত করে বক্রতার সৃষ্টি করে। আইনস্টাইনের সূত্রমতে বস্তু গোলকাকৃতি পথে চলে, যা বাঁকানো পথে সরলরেখার কাছাকাছি দেখতে। সমতলে রেখাসমূহ গোলকাকৃতি (geodesic) এবং বৃহৎ বৃত্তগুলি ভূপৃষ্ঠে গোলকাকৃতি। পদার্থের অনুপস্থিতিতে, চতুর্মাত্রিক স্থান-কাল বিশিষ্ট গোলক ত্রিমাত্রিক স্থানের রেখাগুলির মতোই। কিন্তু যখন পদার্থের উপস্থিতি বিরাজ করে, তখন স্থান-কালকে বক্র করে, বস্তুসমূহের পথ, নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের আকর্ষণের মতোই ত্রিমাত্রিক বক্রতার ভেতর পরিভ্রমণ করে। যখন স্থান-কাল সমতল নয়, তখন বস্তুর পথ বাঁকানো মনে হয়; মনে করা হয় যেন একটি বল সেখানে ক্রিয়াশীল আছে।

মহাকর্ষের অনুপস্থিতিতে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে পরিণত হয় এবং নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রমতে দূর্বল মহাকর্ষ বলের আবহে আমাদের সৌরজগৎ সম্পর্কে প্রায় এইরকম ভবিষ্যদ্বাণী করে– কিন্তু বিষয়টিকে সম্পূর্ণ এরকম ভাবা ঠিক নয়। আসলে যদি জি পি এস উপগ্রহ চালনার পদ্ধতি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে ধর্তব্যের মধ্যে না নিত, তবে পৃথিবীতে কোনো বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ১০ কি: মি: হারে ভুল নির্দেশ প্রদান করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই হোক, সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের প্রচলিত ব্যবহার কেবল আপনাকে নতুন নতুন রেষ্টুরেন্টের ঠিকানা বলে দেয়া নয়– এটা মূলত মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মডেল উপস্থাপনা করার জন্য প্রয়োজন; যার সাহায্যে নতুন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ও কালোবিবরের প্রভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। অতএব সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ পদার্থবিদ্যাকে জ্যামিতিতে রূপান্তরিত করেছে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি অনেকরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে এবং এর প্রতিটি পরীক্ষাই সফল হয়েছে।

এই সমস্ত তত্ত্বসমূহ যথা, ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব, আইনস্টাইনের মহাকর্ষতত্ত্ব– সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ, পদার্থবিজ্ঞানের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে যদিও এগুলো নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার মতোই ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব। আর তা হচ্ছে মহাবিশ্বের মডেলসমূহের ধারণায় মহাবিশ্বের একটি মাত্র ইতিহাস আছে। এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে পরমাণু অথবা এর আরো গভীর পর্যায়ে এই সমস্ত মডেলসমূহ প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এর পরিবর্তে আমাদেরকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগ করতে হয়, যাতে মহাবিশ্বের যে কোনো গন্তব্য ইতিহাস উপস্থাপন করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক রকমের সম্ভাব্য মহাবিশ্বের ব্যাখ্যার জন্য তার নিজস্ব গভীরতা বা প্রবাবিলিটি এমপ্লিচুড আছে। বাস্তবেও, আমাদের নিত্যদিনের পৃথিবীর হিসেব বুঝতে আমরা ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের ব্যবহার চালিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আমরা যদি অণু-পরমাণুর কোয়ান্টাম চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বের কোয়ান্টাম ব্যাখ্যার প্রয়োজন এবং আমরা যদি প্রাথমিক অবস্থার মহাবিশ্ব সম্পর্কে বুঝতে চাই, যখন সমস্ত পদার্থ ও শক্তি খুবই স্বল্প আয়তনের ভেতর আবদ্ধ ছিল, সে ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের কোয়ান্টাম ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমাদের এরকম তত্ত্বেরই প্রয়োজন যদি আমার প্রকৃতির মৌলিকত্ত্ব সম্পর্কে বুঝতে চাই। সে ক্ষেত্রে যদি কিছু তত্ত্ব কোয়ান্টাম ও কিছু তত্ত্ব ক্লাসিক্যাল হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই আমাদেরকে সমস্ত প্রাকৃতিক তত্ত্বের কোয়ান্টামে রূপান্তরিত করে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই সমস্ত তত্ত্বকেই কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্ব বলা হয়।

আমাদের জ্ঞাত প্রকৃতির বলসমূহকে চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

১. **মহাকর্ষ** : এটি আমাদের জানা চারটি বলের মধ্যে দূর্বলতম। কিন্তু মহাকর্ষ বল মহাবিশ্বের দূরবর্তী সব বস্তুর উপর আকর্ষক বল। এর অর্থ এই যে, বৃহৎ বস্তুর ক্ষেত্রে মহাকর্ষ বল বৃদ্ধি পেয়ে অন্যান্য বলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

২. **তড়িৎচুম্বকীয় বল** : এই বলও দূরবর্তী বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল এবং মহাকর্ষ বলের চেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু এই বল শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত কণিকার উপর কাজ করে, সমধর্মী চার্জযুক্ত হলে বিকর্ষিত হয় এবং ভিন্নধর্মী চার্জযুক্ত হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকর্ষিত হয়। এর অর্থ, দুটি বৃহৎ বস্তুর বৈদ্যুতিক বল একটি অপরটিকে নিঃশেষ করে কিন্তু অণু ও পারমাণবিক মাপকাঠিতে এটা ক্রিয়াশীল। তড়িৎচুম্বকীয় বল রসায়নশাস্ত্র ও জীববিজ্ঞানের জন্য দায়ী।

৩. **দূর্বল নিউক্লিয়ার বল :** এই বল পারমাণবিক বিকিরণ উৎপন্ন করে, তারকা ও মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে মূল ভূমিকা পালন করে। যাই হোক, আমাদের প্রত্যাহিক জীবনে আমরা এই বলের সংস্পর্শে আসি না।

৪. **শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বল :** এই বল পরমাণুর অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াসের ভেতর প্রোটন ও নিউট্রনকে একত্রে ধরে রাখে। এটা নিউট্রন এবং প্রোটন– নিজেদেরকেও একত্রে ধরে রাখে, সেটা প্রয়োজন– কেননা এগুলি কোয়ার্ক নামক অতি সূক্ষ্ম কণিকা দ্বারা গঠিত, যা তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। শক্তিশালী পারমাণবিক বল সূর্যের এবং পারমাণবিক শক্তির মূল উৎস, কিন্তু দূর্বল পারমাণবিক বলের মতোই এটার সাথে আমাদের সরাসরি কোনো সান্নিধ্য নেই।

প্রথম বল, যার কোয়ান্টাম চরিত্র আবিস্কৃত হয়েছে, সেটা হচ্ছে তড়িৎচুম্বকীয় বল। তড়িৎচুম্বকীয় বলের কোয়ান্টাম তত্ত্বকে বলে কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রোডাইনামিকস (Quantum Electro Dynamics) বা সংক্ষেপে কিউইডি (QED)।

১৯৪০ সনে রিচার্ড ফেইনম্যান অন্যান্য সহযোগীদের সাথে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, যা এখন সব কোয়ান্টাম বল তত্ত্বের মডেল হিসাবে গণ্য হয়েছে। যেমনটি আলোচনা করেছি, ক্লাসিকাল তত্ত্ব অনুযায়ী বলসমূহ ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম বল তত্ত্বে বলক্ষেত্রগুলি বিভিন্ন প্রকার মৌলিক কণিকা দ্বারা প্রকাশ করা হয়, যাকে 'বোসন' বলে। এগুলি বল বহনকারী কণিকা, যা বস্তুর কণিকার ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করে, বলকে প্রবাহিত করে। বস্তুর কণিকাসমূহকে বলা হয় 'ফার্মিয়ন'। ফোটন, যাকে আলোর কণিকা বলা হয় এটা এক প্রকার বোসন। বোসনই তড়িৎচুম্বকীয় বলকে প্রবাহিত করে। যেমন, ইলেক্ট্রন একটি বোসন যা বলকণিকা নির্গত করে পূর্ব অবস্থায় ফিরে যায়, অনেকটা কামানের গোলা নিক্ষেপের পর কামানটি পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার মতোই। এই বলকণিকা বা বোসন অন্য একটি বস্তুকণিকার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে শোষিত হয় এবং ঐ বস্তুকণিকার গতিকে পরিবর্তন করে। কিউইডি'র তত্ত্বানুযায়ী চার্জবাহিত কণিকাসমূহের ভেতর সমস্ত মিথস্ক্রিয়ায় যে সমস্ত কণিকা বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল ধারণ করে, সেগুলিকে ফোটন কণিকার বিনিময় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কিউইডি'র ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং অত্যন্ত সফলভাবে সেগুলো প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কিউইডি'র যে গাণিতিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন তা অত্যন্ত জটিল। কোয়ান্টাম স্কেলের প্রয়োজনীয়তার জন্য বিভিন্নভাবে কণিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভাব্য বিনিময়গুলি সমস্ত কণিকাসমূহের সম্ভাব্য সংঘটনসমূহকে গাণিতিকভাবে উপস্থাপন করা জটিল। উদাহরণস্বরূপ, বলকণিকা যে পথে বিনিময় বা চলাচল করে, তার গাণিতিক ব্যাখ্যা কঠিন হয়ে পড়ে। সৌভাগ্যবশতঃ বহু প্রকারের সংঘটন বা ইতিহাসের ধারণা আবিষ্কারের সাথে সাথেই ফেইনম্যান একটি পরিচ্ছন্ন লেখচিত্রের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যা কণিকার বিভিন্ন প্রকার সংঘটন বা ইতিহাসকে উপস্থাপন করেছে। এই চিত্রণ পদ্ধতি শুধুমাত্র কিউইডি'র জন্য ব্যবহৃত হয় না, উপরন্তু সমস্ত কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বের জন্য প্রযোজ্য।

ফেইনম্যান লেখচিত্রের পদ্ধতি সব ধরনের সংঘটন বা ইতিহাসের সম্ভাবনার প্রতিটি ক্ষেত্রের যোগফল। ঐ সমস্ত চিত্রগুলি, যাকে ফেইনম্যানের চিত্র বলা হয়, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কিউইডি'তে সব সম্ভাব্য সংঘটনের যোগফল ফেইনম্যানের চিত্রে নিম্নবর্ণিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দুটি ইলেক্ট্রন একটি বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলের ভেতর দিয়ে গেলে সম্ভাব্য কিছু সংঘটন ও পথের উল্লেখ করা হয়েছে। এই চিত্রগুলিতে, সরলরেখাগুলি ইলেক্ট্রন এবং ঢেউ এর মতো রেখাগুলি ফোটন। সময় হল-নীচ

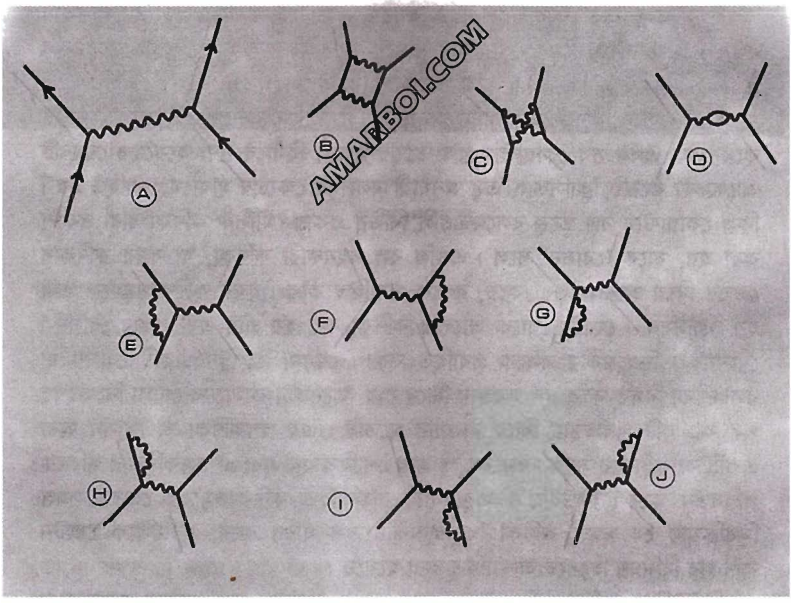

AMARBOI.COM

ফেইনম্যানের চিত্র : এই চিত্রগুলো দুটি ইলেক্ট্রনের সম্পর্কযুক্ত অবস্থান ছড়িয়ে পড়ার পদ্ধতি।

বিনামূল্যে পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে উপরে যাবার সময়কাল এবং স্থান হল যেখানে রেখাগুলি ফোটনের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, যা ইলেক্ট্রন দ্বারা নির্গত বা শোষিত। ছবি (A) তে দুটি ইলেক্ট্রন একটি অপরটির দিকে ধাবিত হয়ে একটি ফোটন কণিকার বিনিময় করে নিজেদের পথে চলে গেছে। এটি দুটি ইলেক্ট্রন এর বিদ্যুৎচুম্বকীয় মিথস্ক্রিয়ার সহজ ব্যাখ্যা, কিন্তু আমাদের সমস্ত সম্ভাব্য সংঘটনকে এর আওতাধীন করতে হবে। এখানে আমাদের B এর মতো ছবিকেও অন্তর্ভূক্ত করা দরকার। এখানেও দুটি ইলেক্ট্রন পরস্পরের দিকে ধাবিত, দুটি ইলেক্ট্রন বের হয়ে চলে গেছে এবং যাবার আগে দুটি ফোটন কণিকার বিনিময় করেছে। এই চিত্রগুলি কেবল কয়েকটি সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছে। আসলে এরকম অসীম সংখ্যক চিত্র সৃষ্টি হয় যেগুলি অবশ্যই গাণিতিকভাবে প্রমাণযোগ্য।

ফেইনম্যানের চিত্র কেবল মিথস্ক্রিয়া ঘটার বর্ণনা এবং শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যসমূহের কিভাবে উদ্ভব ঘটে এর ব্যাখ্যা নয়। ফেইনম্যানের চিত্র নিয়মমাফিক আপনাকে প্রতিটি চিত্রের রেখার এবং শীর্ষদেশের গাণিতিক উপস্থাপনার সুযোগ করে দেয়। ধরুন, কিছুটা ভরবেগ সম্পন্ন আগত ফোটন তার চলাচল শেষ করবে কিছুটা নির্দিষ্ট অবশিষ্ট ভরবেগ রেখে– পরবর্তীকালে সেই ভরবেগ ফেইনম্যানের প্রতিটি চিত্রের ধাবমানতার ফলাফল চিত্রের যোগফল থেকে পাওয়া যাবে। এটা বের করতে বেশ কিছু কাজ করতে হবে, কারণ আমরা বলেছি যে এরকম অসীম সংখ্যক চিত্র বিদ্যমান। উপরন্তু, যদিও আগত ও নির্গত ইলেক্ট্রনের একটি নির্দিষ্ট শক্তি ও ভরবেগ আছে। ফেইনম্যানের চিত্রের বদ্ধ সীমানার ভেতর কণিকার যে কোনো শক্তি এবং ভরবেগ থাকতে পারে। এটা উল্লেখযোগ্য কারণ, ফেইনম্যান-এর ছবির যোগফল নির্ণয় করতে গিয়ে একজনকে কেবল সবগুলি চিত্র যোগ করলেই চলবে না, সবগুলির শক্তি ও ভরবেগের যোগফল বিবেচনায় আনতে হবে।

ফেইনম্যানের চিত্র পদার্থবিজ্ঞানীদের কিউইডি'তে সম্ভাব্য পদ্ধতিসমূহের সম্ভাবনা যাচাই এবং এগুলি হিসেব-নিকেশ করতে অপরিসীম সহায়তা করেছে। কিন্তু এই তত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য দূর্বল দিকের সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তা হল, যখন আপনি অসীম সংখ্যক সংঘটনের যোগফল বের করবেন তখন আপনি একটি অসীম সংখ্যার ফলাফল পাবেন। (যদি একের পর এক অসীম সংখ্যক ফলাফলটির ক্রম যোগফল কমতে থাকে, তাহলে যোগফলটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা হবে, কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ এটা ঘটে না)। সুনির্দিষ্টভাবে যখন ফেইনম্যান এর চিত্রগুলি যোগ করা হয়, তখন মনে হয় ইলেক্ট্রনের অসীম ভর এবং চার্জ আছে। এটা একটি অসম্ভব অবাস্তব ফলাফল। কারণ আমরা ইলেক্ট্রনের ভর এবং চার্জ মাপতে পারি এবং তা নির্দিষ্ট। এই অসীমতা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আর একটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, যাকে পুনঃস্বাভাবিকীকরণ (Renor malization) বলা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেইনম্যানের চিত্র : রিচার্ড ফেইম্যান একটি আলোচিত ভ্যান চালাতেন, যার গায়ে ফেইনম্যানের চিত্র অঙ্কিত। ওই চিত্রগুলির বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। ফেইনম্যান ১৯৮৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং এই বিখ্যাত ভ্যানটি এখনও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যালটেকে সংরক্ষিত আছে।

AMARBOI.COM

তাত্ত্বিকভাবে এই তত্ত্বে পুনঃস্বাভাবিকীকরণ পদ্ধতিতে অসীম এবং ঋণাত্মক সংখ্যাকে গাণিতিক উপায়ে এমনভাবে বিয়োগ করা হয় যেন ঋণাত্মক ও ধনাত্মক অসীম মানসমূহের যোগফল একটি অপরটিকে প্রায় নিঃশেষ করে দেয়। সামান্য অবশিষ্টাংশ একটি মান পড়ে থাকে, যা নির্দিষ্ট দৃশ্যমান ভর এবং চার্জ। এই ধরনের নিপুনভাবে সুবিধাজনক ব্যবস্থার কার্যক্রম আপনাকে স্কুল পর্যায়ে গণিত পরীক্ষায় দায়িত্বহীন ছাত্রের পর্যায়ে ফেলবে এবং পুনঃস্বাভাবিকীকরণ অবশ্যই গাণিতিকভাবে সন্দেহজনক একটি বিষয়। এর একটাই সুবিধা যে, এই পদ্ধতিতে একটি ইলেক্ট্রনের ভর এবং চার্জকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্বারা উপস্থাপন করা যায়। এই সুযোগটা পদার্থবিদরা নিতে পারেন, যাতে ঋণাত্মক অসীম সংখ্যার একটি সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অসুবিধা হল এই যে, ইলেক্ট্রনের ভর এবং চার্জকে এই তত্ত্ব দ্বারা নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু একবার যখন আমরা ভর এবং চার্জকে এভাবে নির্দিষ্ট করতে পারি, আমরা কিউইডি'র মাধ্যমে অনেক সঠিক সম্ভাবনার কথা জানতে পারি, যা দৃশ্যমানভাবে প্রমাণও করা যায়। অতএব পুনঃস্বাভাবিকীকরণ কিউইডি'র একটি

পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্লেখযোগ্য উপাদান। উদাহরণস্বরূপ, কিউইডি''র সর্বপ্রথম প্রমাণিত বিজয় হল তথাকথিত ল্যাম্বশিফট, ১৯৪৭ সনে হাইড্রোজেনের পরমাণুর একটি অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে পরিবর্তনের জন্য স্বল্পমাত্রার শক্তি পরিবর্তনের সফল পর্যবেক্ষণ।

কিউইডি'র পুনঃস্বাভাবিকীকরণ এর সাফল্যের ফলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্য বাকী তিনটি বল নিয়ে কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সম্ভবত প্রাকৃতিক বলের এই চার ধরনের প্রকারভেদ কৃত্রিম ধারণা প্রসূত। এটা হয়তো আমাদের জ্ঞানের অস্পষ্টতার কারণেও। তাই আমরা কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথে সাজুয্যপূর্ণ সব ধরনের বলের সম্মিলিত রূপ নিয়ে একটি তত্ত্ব উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালাই, যা পদার্থ বিজ্ঞানের শেষ পবিত্র পাত্র (Holy Grail) হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

একটি সঠিক সমন্বিত সূত্রের ধারণা দূর্বল বলের তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত। কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বে দূর্বল বলের জন্য পুনঃস্বাভাবিকীকরণ সম্ভবপর হয় না। এর অর্থ, ভর এবং চার্জ দূর্বল বলের অসীম সংখ্যাকে নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা বিয়োগ করে দূর করা যায় না। যাই হোক, ১৯৬৭ সালে পৃথকভাবে আবদুস সালাম ও স্টিভেন ওয়েনবার্গ একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন যাতে বিদ্যুৎ চুম্বকীয়তাকে দূর্বল বলের সাথে সমন্বিত করা হয়েছে। দেখা গেল, এই সমন্বয় অসীম সংখ্যকতার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়েছে। এই সমন্বিত বলকে বলা হল ইলেক্ট্রোউইক বল। এই বলকে পুনঃস্বাভাবিকীকরণ করা যায় এবং এখানে নতুন তিনটি কণিকার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে, তা হল w^+, w^- এবং z^0। z^0 এর উপস্থিতির প্রমাণ জেনেভার সার্ন (CERN) এ ১৯৭৩ সালে পাওয়া গেছে। সালাম এবং ওয়েনবার্গকে ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হল, যদিও ১৯৮৩ সালের আগ পর্যন্ত W এবং Z কণিকার সন্ধান পাওয়া যায় নি।

শক্তিশালী বলকে QCD বা কোয়ান্টাম ক্রোমোডাইনামিক্স তত্ত্বের সাহায্যে পুনঃস্বাভাবিকীকরণ করা যায়। কিউসিডি'র মতে প্রোটন, নিউট্রন এবং অন্য অনেক প্রাথমিক কণিকা কোয়ার্ক দ্বারা সৃষ্ট, যার বিশেষ গুণাবলী আছে এবং পদার্থবিদগণ এটাকে 'রঙ' বলে অভিহিত করলেন (এখানে ক্রোমোডাইনামিক্স শব্দটি শুধুমাত্র কোয়ার্কের রঙ বোঝার জন্য, দৃশ্যমান আলোর সাথে এর কোনো যোগাযোগ নেই)। কোয়ার্ককে তথাকথিত তিনটি রঙে আখ্যায়িত করা হল : লাল, সবুজ ও নীল। এ ছাড়াও প্রত্যেকটি কোয়ার্ক এর আছে প্রতিকণিকা সহযোগী এবং ঐ সমস্ত প্রতি-কণিকার রঙ হচ্ছে প্রতি-লাল, প্রতি-সবুজ এবং প্রতি-নীল। ধারণাটি হল, প্রতিটি মুক্ত কণিকা কেবল নীট রঙের সমন্বিত রূপ নিয়ে থাকতে পারে না। একটি রঙ আর একটি প্রতি-রঙকে বাতিল করে দেয়। অতএব একটি কোয়ার্ক অন্য একটি প্রতি-কোয়ার্কের সাথে রঙবিহীন জোড় সৃষ্টি করে। এতে একটি অস্থিতিশীল কণিকার সৃষ্টি হয় যাকে মেসন বলা হয়। যখন সবগুলি অর্থাৎ তিনটি রঙ (অথবা প্রতি-রঙ) মিশে যায়, তখন রঙহীন স্থিতিশীল কণিকার সৃষ্টি হয়, যাকে বেরিয়ন বলা হয়ে থাকে। এর উদাহরণ হচ্ছে প্রোটন ও নিউট্রন (এবং তিনটি প্রতি কোয়ার্ক একটি বেরিয়নের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

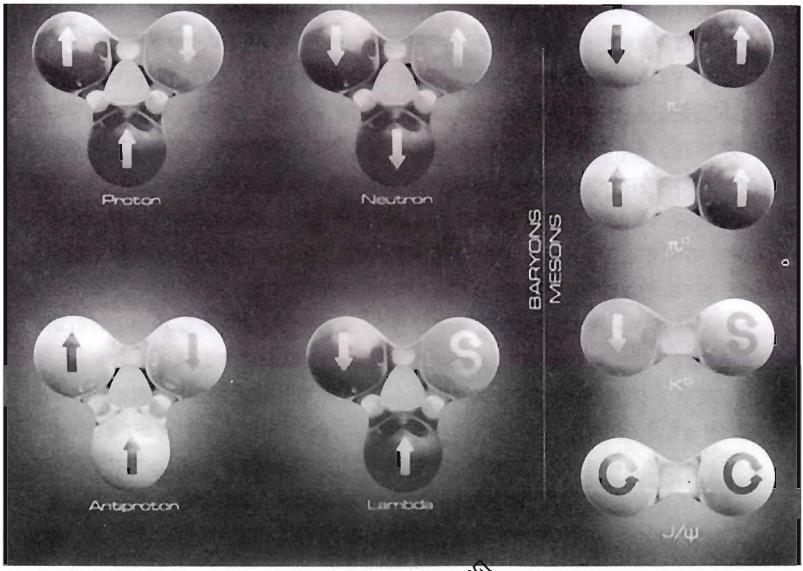

বেরিয়ন ও মেসন : বেরিয়ন ও মেসন শক্তিশালী বলের সাহায্যে কোয়ার্কের সমন্বিত কণিকার রূপ। যখন এ ধরনের কণিকার সংঘর্ষ ঘটে, তখন কোয়ার্কের বিনিময় হয়, কোয়ার্ক কিন্তু দৃশ্যমান তত্ত্ব হয় না।"

AMARBOI.COM

প্রতি-কণিকা সৃষ্টি করে)। বেরিয়ন হচ্ছে প্রোটন ও নিউট্রন, যা একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং এটা হচ্ছে মহাবিশ্বের সমস্ত স্বাভাবিক পদার্থের মৌল ভিত্তি।

কিউসিডি'র একটি ধর্ম আছে, যাকে প্রতিসাম্য স্বাধীনতা (Asymptotic freedom) বলা হয়ে থাকে, যার কথা কোনো নাম উল্লেখ না করে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। প্রতিসাম্য স্বাধীনতা হল, কোয়ার্কের ভেতর শক্তিশালী বলের পরিমাণ কম হয়, যখন তারা কাছে থাকে; কিন্তু তাদের দূরত্ব বাড়লে বলের পরিমাণ বেশি হয়। অনেকটা এরকম মনে হয়, যেন রাবার ব্যান্ড দ্বারা কোয়ার্ক দুটি যুক্ত। প্রতিসাম্য স্বাধীনতার ফলে প্রকৃতিতে কোয়ার্ক কণিকা দৃষ্টিগোচর না হওয়া এবং ল্যাবরেটরীতে এর সৃষ্টি করা অসম্ভব। যদিও আমরা কোয়ার্ক দেখতে পারি না বা ল্যাবরেটরীতে সৃষ্টি করতে পারি না, তবুও আমরা এই মডেলটি গ্রহণ করেছি; কারণ এটি প্রোটন, নিউট্রন এবং বস্তুর অন্যান্য কণিকার বৈশিষ্ট্যকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

দূর্বল ও বিদ্যুৎচুম্বকীয় বলের একত্রিকরণের পর ১৯৭০ সালের দিকে পদার্থবিদগণ শক্তিশালী বলকেও এই তত্ত্বের আওতায় আনার চেষ্টা চালান।

বাংলা বইয়ের পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথাকথিত মহাএকীভূত তত্ত্ব (Grand Unified Theory GUT) হল শক্তিশালী বলের সাথে দূর্বল বল ও বিদ্যুৎচুম্বকীয় বলের একীভূত তত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্বের মতে বেশির ভাগ প্রোটন কণিকাই (যা দিয়ে আমরা সৃষ্ট) গড়ে $১০^{৩২}$ বছরে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার কথা। এটা খুবই দীর্ঘ সময়, যেখানে মহাবিশ্বের বয়স মাত্র $১০^{১০}$ বছর। কিন্তু কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় যখন আমরা বলি যে কোনো কণিকার গড় জীবনকাল $১০^{৩২}$ বছর, আমরা তখন এটা বোঝাতে চাই না যে বেশীরভাগ কণিকাই $১০^{৩২}$ বছরই টিকে যাবে, এক্ষেত্রে কিছুটা বেশি বা কম হতে পারে।

এর পরিবর্তে, আমরা বোঝাতে চাই যে, কণিকার প্রতিবছর $১০^{৩২}$ ভাগের একভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে, আপনি যদি একটি ট্যাঙ্কে $১০^{৩২}$ টি প্রোটন কয়েকবছর যাবৎ পরীক্ষা করেন, তবে আপনি অবশ্যই কয়েক বছরে কিছু প্রোটনের নিঃশেষ হওয়া দেখতে পাবেন। এ ধরনের একটি ট্যাঙ্ক তৈরি করা অসম্ভব কিছু নয়, কারণ এক হাজার টন পানি $১০^{৩২}$ টি প্রোটন কণিকা দ্বারা সৃষ্ট। বিজ্ঞানীরা এরকম পরীক্ষা করেছেন। এই পরীক্ষায় দেখা গেছে, ক্ষয়প্রাপ্তির পরিমাপ করার জন্য এবং এর উপর মহাজাগতিক রশ্মির প্রতিনিয়ত অবিরাম সংঘটিত প্রভাবকে পৃথক করা সহজ নয়। এই রশ্মির প্রভাবকে পাশ কাটানোর জন্য পৃথিবীর গভীর তলদেশে, যেমন কামিওক খনিতে এবং স্মেলটিং কোম্পানীর খনিতে, যা জাপানের পাহাড়ের ৩২৮১ মিটার তলদেশে অবস্থিত, সেখানে পরীক্ষা চালানো হয়। এই স্থানটি মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব থেকে মোটামুটি মুক্ত। ২০০৯ সালে এই পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যদি প্রোটন কণিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েও পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত থাকে; তথাপিও প্রোটন কণিকার জীবনকাল অনেক দীর্ঘ–$১০^{৩৪}$ বছর। এটা মহাএকীভূত তত্ত্বের ধারকদের জন্য নৈরাশ্যজনক সংবাদ।

AMARBOI.COM

যেহেতু, আগের পরীক্ষার প্রমাণ GUT এর স্বপক্ষে নয়, সেহেতু বেশীরভাগ পদার্থবিদগণ একটি আগাম তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন, যাকে আদর্শ মডেল (Standard Model) বলা হল। এটি ইলেক্ট্রোউইক বল এবং কিউসিডি'র সমন্বিত তত্ত্ব এবং একই সাথে শক্তিশালী বলেরও তত্ত্ব। কিন্তু ষ্ট্যান্ডার্ড মডেলে ইলেক্ট্রোউইক এবং শক্তিশালী বল পৃথকভাবে ক্রিয়াশীল এবং সত্যিকার রূপে একীভূত নয়। ষ্ট্যান্ডার্ড মডেলটি মডেল হিসেবে সার্থক এবং সবধরনের পরীক্ষার ফলাফলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু শেষ বিচারে এটা একটি অসফল তত্ত্ব কারণ ইলেক্ট্রোউইক এবং শক্তিশালী বলকে সত্যিকারের একীভূত না করা ছাড়াও, এটা মহাকর্ষ বলকে বিবেচনায় আনে নি।

দূর্বল বল বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলের সাথে শক্তিশালী বলকে একীভূত করে তত্ত্বের মাধ্যমে প্রমাণ করা সুকঠিন কাজ হতে পারে; কিন্তু এই সমস্যা মহাকর্ষ ও অন্য তিনটি বলের সাথে একীভূত করার সমস্যার চেয়ে কঠিন নয়। এমনকি একটি স্বকীয় মহাকর্ষীয় কোয়ান্টাম তত্ত্বের সৃষ্টির চেয়ে এটি দুরূহ।

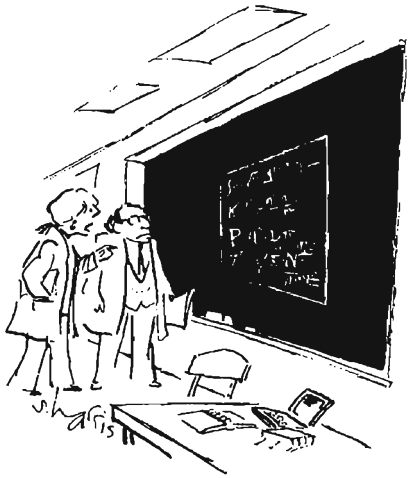

"সমস্ত তত্ত্বের চতুর্দিকে একটি দাগ দিয়ে বাক্সবন্দী করলেই একটি একীভূত তত্ত্ব হয় না।"

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্রানুযায়ী মহাকর্ষীয় কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপস্থাপনা কঠিন, যা চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। এটা একেবারেই অসম্ভব নয়, কিন্তু অনিশ্চয়তার সূত্রানুযায়ী কোনো কোনো ক্ষেত্রের মান এবং তার পরিবর্তনের হার কোনো কণিকার অবস্থান ও গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ যতটা সঠিকভাবে যে কোনো একটির মান জানা যাবে আর একটির মান জানা ততটাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। এর উল্লেখযোগ্য ফল দাঁড়ালো, শূন্যস্থান বলে কোনো কিছুর বাস্তবতা নেই। শূন্যস্থান হতে কোনো ক্ষেত্রের মান এবং এর পরিবর্তনের হার শূন্য হতে হবে (যদি ক্ষেত্রের পরিবর্তনের মান শূন্য না হয়, স্থানটি তা হলে শূন্য থাকে না)। যেহেতু অনিশ্চয়তার সূত্রে ক্ষেত্রের মান এবং এর পরিবর্তনের হার, উভয়কেই এক সাথে সুনির্দিষ্ট করা যায় না, অতএব কোনো শূন্যস্থানের অস্তিত্ব থাকে না। এখানে ন্যূনতম কিছু একটা শক্তি থাকতে হবে, যাকে শূন্যগর্ভ (Vacuum) বলা যেতে পারে– কিন্তু এই অবস্থাকে কোয়ান্টাম অস্থিরতা বা শূন্যগর্ভ চঞ্চলতা বলা যায়, যেখানে কণিকাসমূহের বলগুলি অস্তিত্বের ভেতরে ও বাইরে কম্পিত হচ্ছে।

সহজভাবে, আপনি কোয়ান্টাম চঞ্চলতাকে একজোড়া কণিকা হিসেবে ধরতে পারেন, যা কোনো সময়ে কাছে আসছে এবং দূরে সরে যাচ্ছে এবং একে অপরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে মিশে লয়প্রাপ্ত হচ্ছে। ফেইনম্যান এর চিত্র অনুযায়ী আবদ্ধ লুপ এর মতো। এই সমস্ত কণিকাগুলিকে দূর্লভ বা তাত্ত্বিক কণিকা (Virtual) বলা হয়। বাস্তব কণিকার মতো দূর্লভ কণিকা চিহ্নিতকরণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যাবে না। যাই হোক, এই সমস্ত কণিকার পরোক্ষ ফলাফল, যেমন ভ্রমণরত ইলেক্ট্রনের কক্ষে শক্তির সামান্য পরিবর্তন পরিমাপ করা যায় এবং তাত্ত্বিকভাবে নির্বাচিত ফলাফলের সাথে আশ্চর্য রকমভাবে মিলে যায়। সমস্যা হল, এই তাত্ত্বিক কণিকার শক্তি আছে এবং যেহেতু এরা অসীম সংখ্যক জোড়ায় বিদ্যমান, সেক্ষেত্রে এদের অসীম শক্তি থাকার কথা। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মতে তাহলে মহাবিশ্বের বক্রতা অসীম পরিমাণ ক্ষুদ্র হয়ে যেত, কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না।

অসীম নিয়ে এই দূর্বলতা শক্তিশালী দূর্বল এবং তড়িৎ চুম্বকীয় বলের ক্ষেত্রে একই রকম ঝামেলা সৃষ্টি করেছে– কেবল পুনঃস্বাভাবিকীকরণ যেখানে ক্রিয়াশীল, সেসব স্থান বাদে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে পুনঃস্বাভাবিকীকরণের জন্য যথেষ্ট উপাদান নেই (যেমন ভর ও চার্জের মান)। তাই ফেইনম্যানের ছবিতে মহাকর্ষ বলের আবদ্ধ চক্রে যে অসীম মান উৎপন্ন হয় তা পুনঃস্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়ার তত্ত্বের মাধ্যমে নিঃশেষ করা সম্ভবপর নয়। অতএব আমরা পরিশেষে কেবল এমন একটি মহাকর্ষ তত্ত্ব পাই, যা স্থান-কালের বক্রতাকে অসীম হিসেবেই পরিগণিত করে। এটা বসবাসযোগ্য বর্তমান মহাবিশ্বের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। একটি গ্রহণযোগ্য সম্ভাব্য তত্ত্বে আবশ্যই অসীম সংখ্যকতাকে নিঃশেষ করার সুযোগ থাকতে হবে, যা পুনঃস্বাভাবিকীকরণ এর উপর নির্ভর না করেই।

১৯৭৬ সালে একটি সম্ভাব্য সমাধান পাওয়া গেল। একে বলা হয় 'অতি মহাকর্ষ' (Super gravity) এই 'অতি' শব্দটিকে মহাকর্ষের সাথে গুলিয়ে না ফেলে এটাকে কোয়ান্টাম মহাকর্ষের উচ্চতর সংস্করণ হিসেবে পদার্থবিদরা মনে করলেন। এখানে অতি (Super) এমন এক ধরনের সামঞ্জস্যকে বোঝায়, যাকে পূর্ণসামঞ্জস্য (Super Symmetry) বলা যায়।

পদার্থ বিদ্যায় একটি পদ্ধতিকে সুসামঞ্জস্য বলা যায় যখন ঐ পদ্ধতিটির ধর্মসমূহ কোনো ধরনের পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত না হয়। যেমন, যদি মহাকাশে এটাকে ঘোরানো হয় বা আয়নায় এর প্রতিচ্ছবি দেখানো হয়, এর উপর মৃদু আঘাত করেন, তবে এতে কোনো প্রভাব ফেলবে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি কোনো ডোনাট্‌কে উল্টে দেন, এটা দেখতে একই রকম দেখাবে (যদি না উপরে কোনো চকলেট আবরণ থাকে, সে ক্ষেত্রে এটাকে খেয়ে ফেলা ভালো)। পূর্ণ সুসামঞ্জস্য সুসামঞ্জস্যের চেয়ে আরো পরিকল্পিত অবস্থা, যা সাধারণ মহাশূন্যের মধ্যে কোনো রকম পরিবর্তিত হবে না। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এতে বল কণিকা এবং পদার্থ কণিকা অর্থাৎ বল ও পদার্থ একই জিনিসের দুটি দিক মাত্র। বাস্তব অর্থে বলতে গেলে প্রতিটি বস্তুকণা, যেমন কোয়ার্ক, একটি সহযোগী বলকণার সাথে মিশে থাকবে এবং প্রতিটি বলকণা যেমন ফোটন এর বস্তুকণা সহযোগী হিসেবে

AMARBOI.COM

থাকবে। এই ধারণায় অসীম সংখ্যক সমস্যার সমাধানের যথেষ্ট সুযোগ আছে, কারণ বল-কণিকার আবদ্ধ চক্রের ভেতর অসীম সংখ্যকতা ঋণাত্মক। অতএব তত্ত্বের অসীম সংখ্যকতা বল কণিকা এবং তাদের সহযোগী পদার্থ কণিকা একে অপরকে নিঃশেষিত করে। দুর্ভাগ্যবশত; পূর্ণ সামঞ্জস্যে এই হিসেব নিকেশে নিঃশেষিত হওয়ার বাইরে কিছু সংখ্যক অসীম সংখ্যকতা অবশিষ্ট থাকে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য কেউ কাজ করেন নি। যাই হোক, বেশিরভাগ পদার্থবিদগণই মনে করেন পূর্ণ সামঞ্জস্যই সম্ভবত মহাকর্ষ এবং অন্যান্য বলের একত্রীকরণের সঠিক সমাধান।

আপনি মনে করতে পারেন পূর্ণসামঞ্জস্য প্রমাণ করা সহজ, যা কেবল বিদ্যমান কণিকার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে এবং তাদের জোড় বাঁধা যাচাই করে। এরকম কোনো সহযোগী কণিকার আসলে প্রমাণ মেলেনি। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীদের অনেক গবেষণায় দেখা গেছে কণিকার সহযোগী কণিকাগুলির প্রোটন-এর চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি ভরের সমান হতে হবে। আজ পর্যন্ত এত ভারী কোনো কণিকা পরীক্ষাগারে দেখার সুযোগ হয়নি, কিন্তু একটা আশা আছে যে জেনেভায় লার্জ হার্ডন কোলাইডারে (LHC) এরকম ভারী কণিকার একসময় সৃষ্টি হবে।

অতিসামঞ্জস্যের ধারণা অতিমহাকর্ষের ধারণার জন্ম দিয়েছে। আসলে এই ধারণা বেশ কয়েক বছর আগের স্ট্রিং তত্ত্বের মতে কণিকা কোনো বিন্দু নয়, কম্পনের প্যাটার্নমাত্র, যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু কোনো উচ্চতা বা প্রস্থ নেই। অনেকটা অতি চিকন অসীম সুতার মতো। স্ট্রিং তত্ত্বও অসীমতার দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু এটা বিশ্বাস করা হয় যে সঠিকভাবে উপস্থাপনায় এই অসীম সংখ্যকতা দূর হয়ে যাবে। এই তত্ত্বের তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের আর একটি অপ্রচলিত ধারণা আছে, এটা কেবল দশ মাত্রিক স্থান-কালের মাপকাঠিতে প্রযোজ্য– আমাদের প্রচলিত চতুর্মাত্রিক সাধারণ ধারণার বিশ্ব থেকে পৃথক। দশ মাত্রিক শুনে উত্তেজিত হওয়ার কথা, কারণ আপনার গাড়িটি আপনি কোথায় পার্ক করে রাখলেন তা বুঝতে জটিল সমস্যা হবে। যদি সত্যিই দশ মাত্রা থেকে থাকে, তবে আমরা তা দেখতে পাই না কেন? স্ট্রিং তত্ত্বের মতে, এগুলি খুবই ক্ষুদ্র আকারে মহাশূন্যের বক্রতার ভেতর অবস্থিত। এটা বুঝতে হলে, একটি দ্বি-মাত্রিক উড়োজাহাজের কল্পনা করুন। আমরা উড়োজাহাজকে দ্বি-মত্রিক বললাম এই কারণে উড়োজাহাজের ভেতর কোনো অবস্থানকে জানতে হলে আপনাকে কেবল দুটি স্থানাংক (যথা খাড়াখাড়ি এবং লম্বালম্বি) জানতে হবে। আর একটি দ্বি-মাত্রিক স্থান হল কোনো পাইপের উপরিতল। ঐ স্থানটি নির্দেশ করতে হলে আপনাকে পাইপের দৈর্ঘ্যের কোন জায়গায় বিন্দুটি আছে এবং বৃত্তাকার অংশের কোথায় এটি অবস্থিত, এদুটি বিষয় জানা দরকার। কিন্তু পাইপটি যদি অতি পাতলা হয়, তাহলে আপনাকে কেবল দৈর্ঘ্যকেই বিবেচনায় আনতে হবে, ব্যাসকে বিবেচনা থেকে বাদ দিতে হতে পারে। যদি পাইপটি এক ইঞ্চির মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন ভাগের একভাগ ব্যাসের হয়, তাহলে তা চোখে পড়বে না। এটাই

বাংলা বইয়ের পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্রিং তাত্ত্বিকদের বাড়তি মাত্রিকতা যোগ করতে বাধ্য করেছে। কারণ তা হল অতিরিক্ত কুঞ্চিত যা আমরা চোখে দেখতে পারি না। স্ট্রিং তত্ত্বের মতে বাড়তি মাত্রাগুলি এমন জায়গায় বিদ্যমান থাকে, যা আভ্যন্তরীণ স্থান বলে আমাদের চিরচেনা ত্রিমাত্রিক ধারণার বিপরীত। আমরা দেখব যে এই অন্তঃশীল অবস্থা কেবল লুক্কায়িত মাত্রা নয়, এগুলির যথেষ্ট বাস্তব গুরুত্ব রয়েছে।

অতিরিক্ত মাত্রার ব্যাপার ছাড়াও স্ট্রিং তত্ত্বে আরো একটি বিষয় অস্পষ্ট। এখানে কমপক্ষে পাঁচটি ভিন্নরকমের তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে এবং বাড়তি মাত্রার কুঞ্চিত অবস্থায় থাকারও লক্ষ লক্ষ পথ আছে। এটা স্ট্রিং তত্ত্বের প্রবক্তাদের বেশ বড় অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছে, যারা মনে করেন স্ট্রিং তত্ত্বই সবকিছুর পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব। এরপর ১৯৯৪ সালের দিকে দ্বৈততার আবিষ্কার হয়– যা ভিন্ন রকমের স্ট্রিং তত্ত্ব; যা সহজভাবে অতিরিক্ত মাত্রাকে কুঞ্চনের কারণ ব্যাখ্যা করেছে, একই রকম কুঞ্চনের ঘটনাকে চতুর্মাত্রিকতায় ব্যাখ্যা করেছে। উপরন্তু তারা দেখেছেন যে, অতি মহাকর্ষ অন্যান্য সূত্রের সাথে সম্পর্কিত। স্ট্রিং তত্ত্বের প্রবক্তারা এ বিষয়ে সন্তুষ্ট যে, পাঁচটি বিভিন্ন প্রকার স্ট্রিং তত্ত্ব এবং অতি মহাকর্ষ, যা আরো একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বের জন্য বিভিন্ন ফলাফলের এবং বিভিন্ন অবস্থার সাপেক্ষে বিধৃত করা যায়।

এই অতি চৌকষ মূল পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বটিকে বলা হয় M-তত্ত্ব (M-theory), যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কেউই হয়তো জানেন না যে M-তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? M হতে পারে মাস্টার (Master) বা মিরাকল (Miracle) বা মিষ্ট্রি, (Mystery) অথবা এ তিনটির সবগুলিই। এখনো মানুষ M-তত্ত্বের প্রকৃতি ও রহস্য উন্মোচনে সচেষ্ট– কিন্তু এটা সম্ভব নাও হতে পারে। এটা এমনো হতে পারে পদার্থবিদদের চিরাচরিত একটি পূর্ণাঙ্গ সূত্রের অনুসন্ধানের আর প্রয়োজনীয়তা নেই- কোনো একটি নির্দিষ্ট সমীকরণে সব রহস্যের সমাধান নেই। এমনও হতে পারে যে মহাবিশ্বের ব্যাখ্যার জন্য বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার সূত্রের প্রয়োজন। প্রত্যেকটি সূত্রের তার নিজস্ব বাস্তবতার একটা ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু মডেল নির্ভর বাস্তবতার আলোকে এটা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখনই কোনো তাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে প্রমাণিত হবে।

M-তত্ত্ব কী একটি মাত্র নির্দিষ্ট সূত্রবদ্ধ রূপ বা কতগুলি সূত্রের একটি জাল? যাই হোক, আমরা এই সূত্রের কতগুলি ধর্ম জানতে পেরেছি। প্রথমত : M-তত্ত্বে এগারোটি স্থান-কাল মাত্রা আছে, দশটি নয়। স্ট্রিং তত্ত্বের প্রবক্তাগণ দীর্ঘদিন দশমাত্রার ভেতর সবকিছু ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু কিছুদিন আগে জানা গেছে যে একটি মাত্রাকে বিবেচনায় আনা হয়নি। এছাড়াও M-তত্ত্ব কেবল কম্পমান স্ট্রিং নয়– বিন্দু, কণিকারও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। দ্বিমাত্রিক ঝিল্লি, ত্রিমাত্রিক বিন্দু এবং অন্যান্য বস্তু, যা মহাশূন্যে নয় মাত্রার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা বা অবস্থান করানোর ব্যাখ্যা করা কঠিন– তা M-তত্ত্বে সম্ভব হয়েছে। এই সমস্ত বস্তুকে বলা হয় পি-ব্রান্স (P-branes) (যেখানে পি এর মান শূন্য থেকে ৯ এর ভেতর)

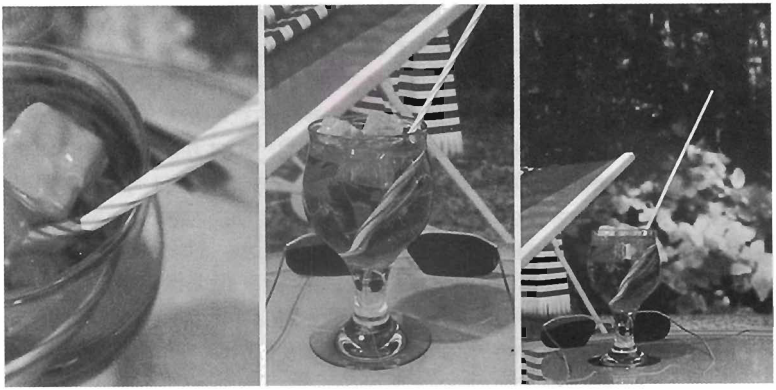

পাইপ এবং রেখা : যদি কোনো পাইপের ব্যাস কম হয়, তবে তা দ্বিমাত্রিক। যদি দূর থেকে দেখা হয়, তখন এটাকে একমাত্রিক মনে হয়– কেবল একটি রেখার মতো।

এই ছোট মাত্রাগুলির অসংখ্য পদ্ধতিতে এর মধ্যে কুঞ্চিত থাকার বিষয়টি আসলে কী? M-তত্ত্বে ঐ সমস্ত বাড়তি গাণিতিক মাত্রাগুলি যেন-তেন প্রকারে কুঞ্চিত করা সম্ভব নয়। গাণিতিকভাবে, এই তত্ত্ব-আভ্যন্তরীণ স্থানে এই মাত্রাগুলিকে কুঞ্চনের প্রমাণ দেয় না। আভ্যন্তরীণ স্থানের সঠিক আকৃতি ভৌত ধ্রুবকগুলির মান নির্ণয় করে– যেমন, ইলেক্ট্রন এর চার্জ এবং মৌলিক কণিকার সাথে মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি। ভিন্ন অর্থে এটা প্রকৃতির আপাতঃ তত্ত্বের নির্দেশনা দান করে। আমরা আপাতঃ শব্দটি উল্লেখ করেছি এই কারণে, যে সমস্ত সূত্র আমরা আমাদের মহাবিশ্বে দেখি– চারটি বলের সূত্রসমূহ এবং সেই সমস্ত উপাদান অর্থাৎ ভর এবং চার্জ, যা মৌলিক কণিকাসমুহের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এর চেয়েও আরো বেশী মৌলিক তত্ত্ব হল M-তত্ত্ব।

M-তত্ত্বের সূত্র তাই বিভিন্ন মহাবিশ্বে বিভিন্ন আপাতঃ সম্ভাব্য সূত্রের সম্ভাবনার কথা বলে, এটা নির্ভর করে কীভাবে আভ্যন্তরীণ স্থান কুঞ্চিত অবস্থায় আছে। এম তত্ত্বে বহু বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ স্থানের কথা উল্লেখ করা যায়, সম্ভবত $১০^{৫০০}$ এর অধিক। এর অর্থ $১০^{৫০০}$ টি মহাবিশ্বের উপস্থিতির ধারণা, যাদের প্রত্যেকটির নিজস্ব সূত্র আছে। কতগুলি মহাবিশ্ব থাকতে পারে, এরকম একটি ধারণার কথা চিন্তা করুন। কেউ যদি মহাবিস্ফোরণের পর থেকে একেকটি মহাবিশ্বের নিজস্ব সূত্র ব্যাখ্যা শুরু করেন এবং এক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে শেষ করতে পারেন, তবে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরতি ছাড়া মাত্র $১০^{২০}$ টির ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। এখানে কফির জন্য বিরতি দেয়ার সময়ও দেয়া যাবে না।

কয়েক শতাব্দী পূর্বে নিউটন দেখিয়েছেন যে, গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে স্বর্গে এবং মর্ত্যে বস্তুসমূহের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করা যায়। বিজ্ঞানীরা তখন বিশ্বাস করতেন সমগ্র মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ বলে দেয়া সম্ভবপর হবে, যদি আমরা সঠিক তত্ত্বটি জানতে পারি এবং গাণিতিক পারঙ্গমতা অর্জন করতে পারি। তারপর আমরা জানতে পেরেছি কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা, কুঞ্চিত স্থান, কোয়ার্ক, স্ট্রিং তত্ত্ব, অতিরিক্ত মাত্রাসমূহ এবং এইসবের ফলাফল দাঁড়ালো $১০^{৫০০}$ টি মহাবিশ্বের সম্ভাবনা, যার প্রত্যেকটির ভিন্ন-ভিন্ন সূত্র আছে এবং এর ভেতর একটি আমাদের এই মহাবিশ্ব। পদার্থবিজ্ঞানীদের মূল আশা একটি মাত্র তত্ত্বের আবিষ্কারের মাধ্যমে আমাদের আপতত দেখা এই মহাবিশ্বের সূত্র সমূহের ব্যাখ্যা করা, এতে করে এই মহাবিশ্বের কিছু সাধারণ সূত্রের ধারণা হয়তো আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু এটা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে? যদি M-তত্ত্ব $১০^{৫০০}$ ধারণার মধ্যে $১০^{৫০০}$ সূত্র থেকে থাকে, তাহলে আমরা এই মহাবিশ্বকে জানা কীভাবে শেষ করব? আর ঐসব সম্ভাব্য মহাবিশ্বের ভেতর কী আছে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

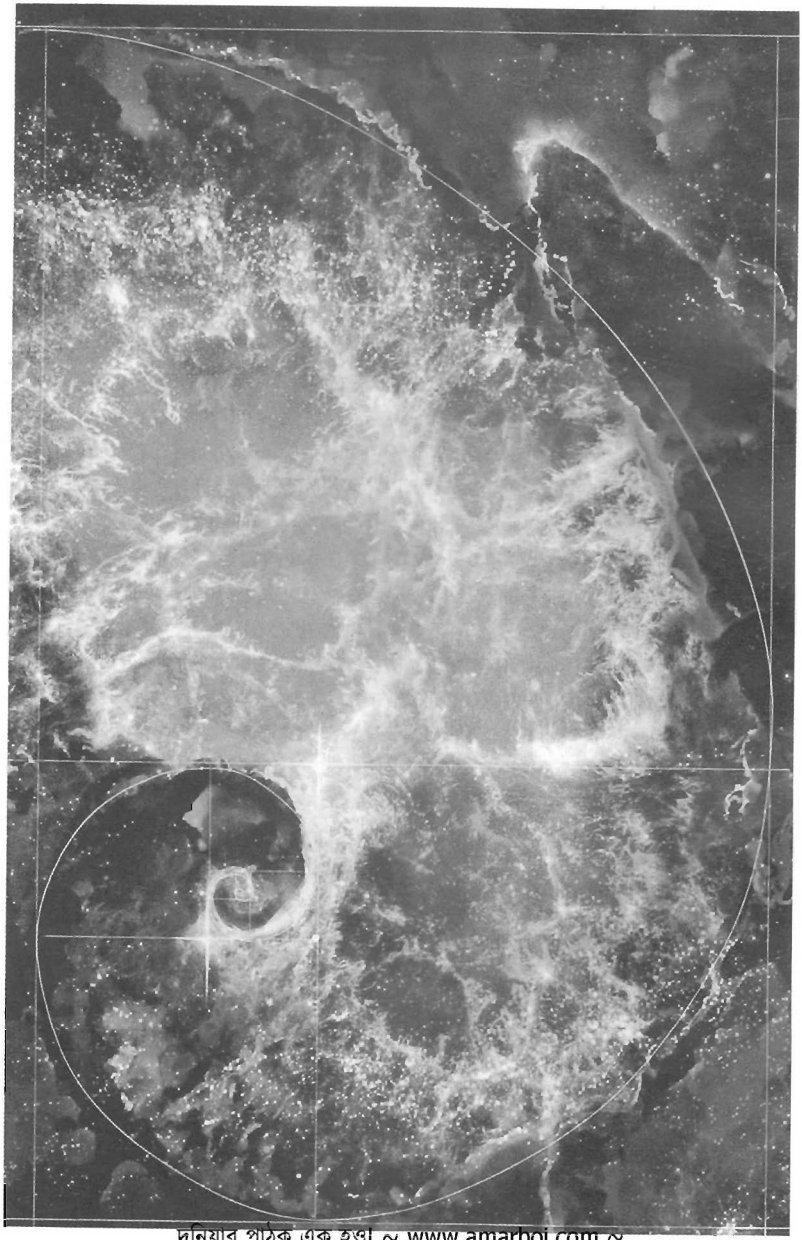

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মহাবিশ্বকে বেছে নেয়া

মধ্য আফ্রিকার বোসোঙ্গো জনগোষ্ঠির মতে, মহাবিশ্বের শুরুতে কেবল অন্ধকার, পানি এবং মহান ঈশ্বর বুম্বা ছিলেন। একদিন প্রচণ্ড পেটব্যাথার ফলে বুম্বা বমি করে সূর্যকে উগরে দিলেন। এর কিছুকাল পর সূর্যের তেজে পানি ও জমি শুকিয়ে গেল। কিন্তু বুম্বার পেটব্যাথার তখনও নিরাময় হয়নি। তিনি চাঁদ, তারকা, কিছু জীবজন্তু– যেমন চিতাবাঘ, কুমির, কচ্ছপ এবং সবশেষে মানুষ বমি করে বের করলেন। মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতায় সৃষ্টির পূর্বে একই সময়ে সাগর, আকাশ এবং সৃষ্টিকর্তার বর্ণনা আছে। মায়াদের পুরাকাহিনি বলে যে, সৃষ্টিকর্তা তখন অসন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ সে সময়ে তাঁর প্রার্থনা করার মতো কেউই ছিল না। তিনি তাই পৃথিবী, পাহাড়, বৃক্ষরাজি এবং বেশির ভাগ জীবজন্তু সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তারা কেউই কথা বলতে পারতো না, তাই তিনি মানুষ সৃষ্টি করতে মনস্থ করলেন। প্রথমে তিনি পৃথিবী এবং মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করলেন। কিন্তু সেইসব মানুষেরা আহম্মকের মতো কথা বলা শুরু করল। অতএব তিনি সমস্ত মানুষ নিশ্চিহ্ন করে কাঠ দিয়ে আবার মানুষ সৃষ্টি করলেন। সে সমস্ত মানুষেরা নির্বোধ হল। ঈশ্বর তাদেরকেও নিশ্চিহ্ন করতে চাইলেন, কিন্তু এরা পালিয়ে গভীর জঙ্গলে চলে যায়। এই পালানোর সময়ে তাদের কিছু ক্ষতি হলো এবং তারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে আজকের বানরে রূপান্তরিত হল। এরপর ঈশ্বর একটি কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন করলেন– তিনি সাদা এবং হলুদ শস্যদানা থেকে মানুষ তৈরি করলেন। আজ আমরা শস্যদানা থেকে ইথানল তৈরি করি এবং পান করি, কিন্তু এটা ঈশ্বরের অসাধারণ কীর্তির তুলনায় কিছুই নয়।

এই বইয়ে আমরা সৃষ্টি রহস্যের এ সমস্ত গল্প কাহিনির উত্তর দিতে সচেষ্ট হয়েছি : কেন এই মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল? এই মহাবিশ্ব কেন ঠিক এরকম? প্রাচীন গ্রিকদের থেকে শুরু করে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার সামর্থ্য ও দক্ষতা আমাদের বেড়েছে, বিশেষ করে বিগত শতাব্দীতে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচিত ও অর্জিত ধারণাসমূহের আলোকে এই অধ্যায়ে এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত।

একটি বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই এরকম বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে নিকট অতীতে অথবা মহাবিশ্বের মাপকাঠিতে মানুষের উৎপত্তির ইতিহাস খুবই স্বল্প সময়ের। এর কারণ, মানুষের বুদ্ধি ও প্রযুক্তির বিকাশ এত দ্রুত গতিতে ঘটেছে যে মানুষের উৎপত্তি যদি আরো লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে হতো, তবে তা আরো শানিত ও উন্নততর হতো।

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (ওল্ড টেস্টামেন্ট) অনুসারে, ঈশ্বর আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টির ষষ্ঠ দিনে সৃষ্টি করেছেন। বিশপ উসার, যিনি ১৬২৫ থেকে ১৬৫৬ সন পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডের প্রধান যাজক ছিলেন; আরো নিখুঁতভাবে তা হিসেব করলেন– বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে ৪০০৪ খ্রিস্টপূর্বের ২৭ শে অক্টোবর, সকাল নয়টায়। আমরা এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করি : আমরা বলি, মানুষ নিকট অতীতের সৃষ্টি ঠিকই, কিন্তু মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে আরো অনেক যুগ আগে; প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর পূর্বে।

মহাবিশ্বের যে একটি প্রারম্ভকাল আছে, তার প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া গেছে ১৯২০ সালে। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে যেমনটি বলেছি, তখন বেশির ভাগ বিজ্ঞানী মনে করতেন যে মহাবিশ্ব স্থির এবং অনাদিকাল থেকে বিরাজমান। এর বিপরীত মতটি পরোক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে গৃহীত হয়, যা ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডোনাস্থ মাউন্ট উইলসনের পাহাড়চূড়ায় স্থাপিত ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীন দিয়ে এডউইন হাব্‌ল প্রত্যক্ষ করলেন। গ্যালাক্সিসমূহের বিচ্ছুরিত আলোক বর্ণালী বিশ্লেষণ করে এডউইন হাব্‌ল দেখালেন যে সেগুলো আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ছায়াপথগুলোর যেটি যত দূরে রয়েছে, সেটি ততই দ্রুততর গতিতে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই দূরে সরে যাওয়ার হার এবং মহাবিশ্ব যে সম্প্রসারণশীল– এই তত্ত্ব তিনি ১৯২৯ সনে প্রকাশ করলেন। যদি একে সঠিক বলে ধরা হয়, তবে মহাবিশ্ব অবশ্যই অতীতে ক্ষুদ্রতর ছিল বলে মেনে নিতে হয়। সত্যিকার অর্থে আমরা যদি দূর অতীতের হিসেব করি, তাহলে মহাবিশ্বের সব পদার্থ এবং শক্তি অকল্পনীয় ক্ষুদ্রাকারে, অকল্পনীয় ঘনত্ব ও তাপমাত্রায় পুঞ্জীভূত ছিল বলে দেখতে পাই। তখন এমন এক সময়ে উপনীত হই, যখন সবকিছুর শুরু হয়েছিল– যে ঘটনাটিকে আমরা বৃহৎ বিস্ফোরণ বা 'বিগ ব্যাংগ' বলে থাকি।

মহাবিশ্ব যে সম্প্রসারিত হচ্ছে, এই ধারণাটি বুঝে উঠা কিছুটা দুরূহ। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা কিন্তু বুঝাতে চাচ্ছিনা মহাবিশ্ব এভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে, যেভাবে একজন তার বাড়ির দেয়াল ভেঙ্গে সীমানা বৃদ্ধি করেন– যেখানে হয়তো একটি বিশাল ওকগাছ ছিল, তা কেটে একটি নতুন গোসলখানা নির্মাণ করেন। কোনো স্থান বেড়ে যাচ্ছে মানে এরকম কিছু নয়; আসলে মহাবিশ্বের ভেতর দুটো বিন্দুর দূরত্ব মহাবিশ্বের ভেতরই বাড়ছে। এই ধারণাটি যথেষ্ট সমালোচনার মধ্য দিয়েই ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। এটা দেখার সর্বোত্তম পন্থা ১৯৩১ সালে কেমব্রিজ

পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

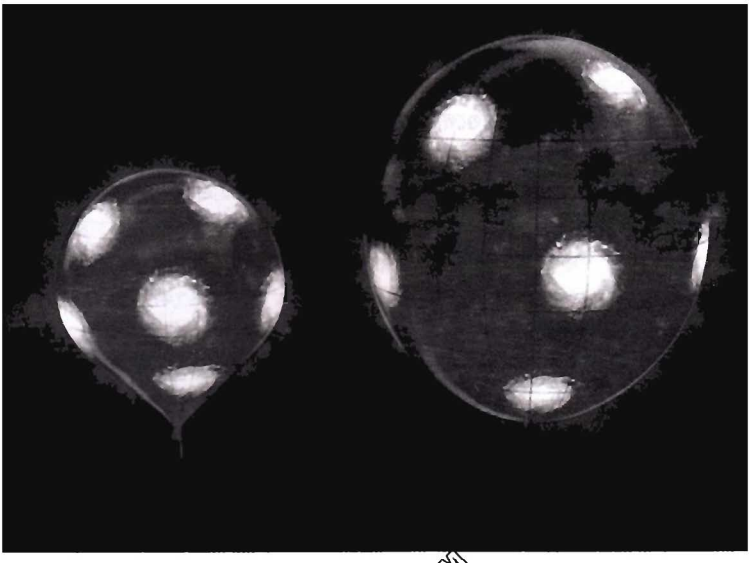

বেলুন মহাবিশ্ব : দূরবর্তী ছায়াপথগুলো আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সমগ্র মহাবিশ্ব একটি বৃহৎ বেলুনের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত।

AMARBOI.COM

বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিপদার্থবিদ আর্থার এডিংটন একটি রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এডিংটন মহাবিশ্বকে একটি প্রসারমান বেলুনের পৃষ্ঠদেশ হিসেবে দেখলেন, যার উপর সমস্ত ছায়াপথগুলি বিন্দু দিয়ে নির্দিষ্ট করলেন। এই চিত্রের মাধ্যমে সহজেই বুঝা গেল, দূরবর্তী ছায়াপথগুলো কীভাবে কাছেরগুলোর চেয়ে দ্রুততর গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি বেলুনটির ব্যাসার্ধ এক ঘণ্টায় দ্বিগুণ বাড়ে, তবে বেলুনের উপর যে কোনো দুটি ছায়াপথের দূরত্বও এক ঘণ্টায় দ্বিগুণ হবে। যদি কোনো একসময়ে দুটো ছায়াপথের দূরত্ব এক ইঞ্চি হয়, তবে তা এক ঘণ্টা পরে দু'ইঞ্চি হবে। এদের একটি অন্যটির থেকে ঘণ্টায় এক ইঞ্চি হারে দূরে সরে যেতে থাকবে। কিন্তু শুরুতেই যদি দূরত্ব দুই ইঞ্চি হয়, তবে তা এক ঘণ্টায় চার ইঞ্চি দূরে সরে যাবে এবং ঘণ্টায় দুই ইঞ্চি হারে দূরে সরতে থাকবে। হাব্‌ল এটাই দেখিয়েছিলেন যে, ছায়াপথগুলো যত দূরে অবস্থিত, তাদের দূরে সরে যাওয়াও ততটা দ্রুততর।

এটা বুঝা জরুরি যে স্থানের এই সম্প্রসারণশীলতা বস্তুপিন্ডের উপর; অর্থাৎ ছায়াপথ, তারকা, আপেল, পরমাণু অথবা কোনো বল দিয়ে একত্রিত থাকা কোনো পদার্থের উপর প্রভাব ফেলে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা একগুচ্ছ ছায়াপথকে

ঘিরে বৃত্ত আঁকি, তখন বেলুনটি সম্প্রসারিত হলেও বৃত্তটি সম্প্রসারিত হবে না। এর কারণ, ছায়াপথগুলো মহাকর্ষ বল দিয়ে আবদ্ধ। বেলুনটি সম্প্রসারিত হলেও বৃত্তটি এবং ছায়াপথগুলো তাদের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে একই রকম থাকবে। এটি খুব উল্লেখযোগ্য, কারণ আমরা কেবল সম্প্রসারণশীলতার পরিমাপ করতে পারি তখনই, যখন পরিমাপক যন্ত্রগুলো সুনির্দিষ্ট মানের হয়। যদি সবকিছুই স্বাধীনভাবে সম্প্রসারিত হতে পারতো, তাহলে আমাদের মাপকাঠি, আমাদের গবেষণাগার– ইত্যাদি সবকিছুই আনুপাতিক হারে সম্প্রসারিত হত এবং সেক্ষেত্রে আমরা পরিমাপের কোনো পার্থক্য অনুধাবন করতে পারতাম না।

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণশীলতার বিষয়টি আইনস্টাইনের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য খবর বলে মনে হলো। আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকেই কয়েক বছর আগে তাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে হাব্‌ল ছায়াপথগুলো পরস্পর দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। রাশিয়ান গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্রেডম্যান দুটি ধারণার উপর নির্ভর করে ১৯২২ সালে মহাবিশ্বের একটি মডেলের সহজ গাণিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। সে দুটি ধারণা হল, মহাবিশ্ব যে কোনো দিক থেকে দেখলে একই রকম দেখা যাবে এবং তা প্রতিটি বিন্দু থেকেই এক রকম দেখা যাবে। আমরা জানি যে, ফ্রেডম্যানের প্রথম ধারণাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। সৌভাগ্যবশত, মহাবিশ্ব সর্বত্র সুষম নয়। আমরা যদি উপরে কোনো একদিকে তাকাই, তাহলে হয়তো সূর্যকে দেখব; অন্যদিকে চাঁদ কিংবা রক্তচোষা বাদুড়গুলো দেখতে পাব। কিন্তু বৃহৎ স্কেলের মাপকাঠিতে, অর্থাৎ দুটো ছায়াপথের ভেতরের দূরত্বের চেয়ে বড় পরিমাপে দেখলে মহাবিশ্বকে মোটামুটিভাবে সবদিকে প্রায় একইরকম দেখা যাবে। এটা অনেকটা উপর থেকে বনভূমির দিকে তাকানোর মতো। যদি কাছাকাছি দূরত্ব থেকে দেখি, তবে পাতা বা অন্ততপক্ষে গাছগুলোকে দেখতে পাব এবং গাছগুলোর ভেতরের দূরত্বকেও দেখব। কিন্তু যদি আরো দূর থেকে দেখি, যে দূরত্বে আপনার বুড়ো আঙুল অন্তত এক বর্গকিলোমিটার বনভূমি ঢেকে দেবে, তখন সমস্ত বনকে একই রকম সবুজ আবহে দেখতে পাব। আমরা তখন বলতে পারি যে ঐ দূরত্বে, ঐ স্কেলে বনটি সর্বত্র একই রকমের।

ফ্রেডম্যান তাঁর ধারণার উপর ভিত্তি করে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সম্পর্কে আইনস্টাইনের সমীকরণের একটি সমাধান প্রদানে সমর্থ হলেন এবং মহাবিশ্বের সে সম্প্রসারণশীলতার তথ্য পরবর্তীকালে হাব্‌ল সঠিক বলে প্রমাণ করলেন। বিশেষ করে ফ্রেডম্যানের মহাবিশ্ব-মডেলে শূন্য আকার থেকে মহাবিশ্বের শুরু এবং মহাবিশ্বের অভিকর্ষবল যতক্ষণ না সম্প্রসারণকে কমিয়ে দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা সম্প্রসারণশীল থাকবে– পরে তা কমতে কমতে মহাবিশ্ব নিজের ভেতরই নিজে সংকুচিত হয়ে যাবে। (আইনষ্টাইনের সমীকরণে আরো দুই ধরনের সমাধান পাওয়া যায়। সে দুটিও ফ্রেডম্যানের ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এর একটি হল, মহাবিশ্ব চিরকাল সম্প্রসারণশীল থাকবে, যদিও তা সামান্য ধীরগতিতে সম্প্রসারিত হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর অন্যটি হল, ধীরগতিতে সম্প্রসারিত হয়ে এর হার কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় দাঁড়াবে, যদিও তা একেবারে শূন্য হবে না)। এই ধারণা প্রকাশের কয়েক বছর পর ফ্রেডম্যান মারা যান এবং যতক্ষণ পর্যন্ত হাব্‌ল তাঁর যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণে সম্প্রসারণশীলতা আবিষ্কার না করলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ধারণাটি বেশির ভাগ মানুষের কাছে অজ্ঞাতই ছিল। কিন্তু ১৯২৭ সালে রোমান ক্যাথলিক যাজক ও পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক জর্জেস লেমিটার একই রকম ধারণা প্রকাশ করলেন। তা হচ্ছে : যদি আপনি অতীতে মহাবিশ্বের গোড়ার দিকে যেতে থাকেন, তাহলে মহাবিশ্বকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর দেখতে পাবেন এবং সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণে উপস্থিত হবেন– যাকে আমরা এখন বিগ ব্যাংগ বা বৃহৎ বিস্ফোরণ বলে থাকি।

বৃহৎ বিস্ফোরণের চিত্রটি সবার মনঃপুত হয়নি। "বৃহৎ বিস্ফোরণ" শব্দটি মূলতঃ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিপদার্থবিদ ফ্রেড হোয়েল ১৯৪৯ সালে প্রথম উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মহাবিশ্ব চিরকাল সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। তিনি এ শব্দটিকে উপহাসচ্ছলে উল্লেখ করেছিলেন। আর এই ধারণার কোনো পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রমাণ ১৯৬৫ সালের আগে পাওয়া যায়নি– যতক্ষণ না মহাবিশ্বের অতীত পটভূমি থেকে দূর্বল মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ মহাশূন্যে ধরা না পড়ে। এই মহাজাগতিক অতীত পটভূমির বিকিরণ (Cosmic Microwave Background Radiation – CMBR) আমাদের প্রচলিত মাইক্রোওয়েভ ওভেনের বিকিরণের মতোই, যদিও তা আরো অনেক দূর্বল। টেলিভিশনের অব্যবহৃত চ্যানেল খুললে যখন কিছু তুষারকণার মতো বিন্দু দেখতে পান, সেগুলোও এই বিকিরণের ফলেই দেখা যায়। এই বিকিরণ বেল ল্যাবরেটরির দু'জন বিজ্ঞানী হঠাৎ করেই আবিষ্কার করেন, এন্টেনা থেকে এ ধরনের অবাঞ্ছিত বিকিরণের ছাপ দূর করতে গিয়ে। তারা প্রথমে মনে করেছিলেন যে এটা কোনো কবুতরের পরিত্যক্ত মল, যা হয়তো এন্টেনার উপর পড়েছে। কিন্তু শীঘ্রই এটি একটি আকর্ষণীয়, অভাবিত আবিষ্কারে রূপান্তরিত হল। CMBR হচ্ছে এক ধরনের বিকিরণ, যা অতি উষ্ণ এবং ঘন। এটি প্রাথমিক মহাবিশ্ব থেকে বিকিরিত এবং কালক্রমে মহাবিশ্ব যখন সম্প্রসারিত হয়েছে, তখন ধীরে ধীরে তা ঠান্ডা হয়েছে। বর্তমানে এই বিকিরণ আরো দূর্বল হয়েছে এবং আমরা আজ তা দেখতে পাচ্ছি। বর্তমান সময়ে এই মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ আপনার খাদ্যকে পরম তাপমাত্রার তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উপরে– অর্থাৎ মাইনাস ২৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ প্রদান করতে সক্ষম, যা দিয়ে পপকর্ণ ভাজাও সম্ভব নয়।

বৃহৎ বিস্ফোরণের সময়কালীন ক্ষুদ্র, উত্তপ্ত প্রাথমিক মহাবিশ্বের আরো প্রমাণ জ্যোতির্বিদেরা পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, মহাবিস্ফোরণের প্রথম এক মিনিটের মধ্যে মহাবিশ্ব একটি সাধারণ তারকার কেন্দ্রের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি উত্তপ্ত ছিল। ঐ সময়ে সমগ্র মহাবিশ্বই পারমাণবিক চুল্লির মতো কাজ করেছে। যখন মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়ে ঠান্ডা হয়েছে, এই বিক্রিয়া কেবল তখনই বন্ধ হয়েছে। এটা হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকলে, তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বে মূল উপাদান হাইড্রোজেন ছাড়াও ২৩ শতাংশ হিলিয়াম এবং সামান্য লিথিয়াম থাকতে হবে। (অন্যান্য ভারী পদার্থ পরে তারকার অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল)। আমরা আজকের মহাবিশ্বে যে অনুপাতে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও লিথিয়াম দেখতে পাই, এই হিসেব তার সাথে মিলে যায়।

প্রাথমিক মহাবিশ্বের বৃহৎ বিস্ফোরণের প্রমাণ হলো আজকের প্রাপ্ত হিলিয়াম-এর পরিমাণ এবং CMBR-এর উপস্থিতি। যদিও প্রাথমিক মহাবিশ্বের পর্যালোচনা করে যে কেউ মহাবিস্ফোরণের পক্ষে দাঁড়াতে পারেন, তবে মহাবিস্ফোরণকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করাটা ভুল। অর্থাৎ, আইনস্টাইনের সূত্রকে মহাবিশ্বের এ চিত্রের উৎস বিবেচনা করা সঠিক হবেনা। কারণ সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মতে, একটি সময়ে তাপমাত্রার ঘনত্ব এবং মহাবিশ্বের বক্রতা অসীম ছিল– এমন একটি অবস্থাকে গণিতবিদগণ বলেন অনন্য এককত্ব (Singularity)। একজন পদার্থবিজ্ঞানীর কাছে এর অর্থ হচ্ছে, ঐ সময়ে আইনস্টাইনের তত্ত্ব অকার্যকর হয়ে পড়ে। অতএব মহাবিশ্ব কী করে শুরু হল, এর ব্যাখ্যা দেয়া এই তত্ত্বের মাধ্যমে সম্ভব নয়। কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে কী করে মহাবিশ্ব গড়ে উঠল, এই তত্ত্ব দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অতএব যদিও আমরা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বকে প্রাথমিক মহাবিশ্বের ধারণা বুঝতে ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু একে আরো অতীতে টেনে নিয়ে মহাবিশ্বের একেবারে সৃষ্টি মুহূর্তকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা ঠিক নয়।

আমরা মহাবিশ্বের উদ্ভবের বিষয়টি নিয়ে একটু পরেই আলোচনা করব, কিন্তু এর আগে সম্প্রসারণশীলতার প্রাথমিক ধাপ নিয়ে দু'একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। এই সম্প্রসারণশীলতাকে পদার্থবিদেরা বলেন স্ফীতি। আপনি যদি জিম্বাবুয়েতে বাস না করেন, যেখানে মুদ্রাস্ফীতি ২০০,০০০,০০০ শতাংশ অতিক্রম করেছে; সেক্ষেত্রে এই স্ফীতির পরিমাণটা আপনার কাছে ভয়াবহ মনে হবে। কিন্তু মহাবিশ্বের স্ফীতিকালীন সময়ে খুব কম করে হলেও প্রাথমিক স্ফীতি ঘটেছে প্রতি .০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১ সেকেন্ডে ১,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ গুণ হারে। এটা অনেকটা এক সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি মুদ্রার হঠাৎ করেই ছায়াপথের ব্যাসের চাইতে ১০ মিলিয়ন গুণ বড় হয়ে যাওয়ার মতোই ঘটনা। এরকম ঘটনা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রের লঙ্ঘন বলে মনে হয়, যে সূত্র অনুসারে কোনো কিছুই আলোকবেগের চেয়ে দ্রুততর গতিতে চলতে পারেনা। কিন্তু এই গতিসীমা মহাবিশ্বের স্থানিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের গন্ডির বাইরে গিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোকে এরকম স্ফীতির ধারণার প্রথম প্রস্তাবনা হয় ১৯৮০ সনে। যেহেতু আমরা এখনও মহাকর্ষীয় কোয়ান্টাম তত্ত্বের সম্পূর্ণ ধারণা পাইনি (যার পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে কাজ চলছে), তাই পদার্থবিদগণ সূচারুভাবে বর্ণনা করতে পারেন না কীভাবে এই স্ফীতি ঘটেছে। কিন্তু সূত্রমতে এই স্ফীতি সম্পূর্ণ সুসামঞ্জস্য বজায় রেখে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটেনি, যা প্রচলিত বৃহৎ বিস্ফোরণের চিত্রে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এই নিয়মহীনতার জন্য বিভিন্ন দিকে CMBR-এর তাপমাত্রার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬০ সালের দিকে এই তারতম্য অত্যন্ত স্বল্পমাত্রার বলে উল্লেখ করা হয়, আর ১৯৯২ সনে নাসার কোবে উপগ্রহের মাধ্যমে এটা প্রথমবারের মতো আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে ২০০১ সালে উৎক্ষিপ্ত WAMP উপগ্রহের মাধ্যমে এটার পরিমাপ করা হয়, যার ফলে আজ আমরা নিশ্চিত যে এরকম স্ফীতি অবশ্যই ঘটেছিল।

মজার বিষয় হলো যে, CMBR-এর প্রায় সুষম, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ তাপমাত্রার বিকিরণ লক্ষ করেই স্ফীতির এই ধারণাটিরও জন্ম। আপনি যদি কোনো বস্তুর একটি মাত্র অংশে তাপ সঞ্চালন করেন এবং অপেক্ষা করেন, তাহলে দেখবেন তপ্ত অংশটি ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে থাকবে এবং তার অন্যান্য অংশেও তাপ ছড়িয়ে পড়বে– যতক্ষণ পর্যন্ত তাপমাত্রার সামঞ্জস্য না ঘটে। একইভাবে একজন আশা করতে পারেন যে একদিন সমগ্র মহাবিশ্বে তাপমাত্রার সুসামঞ্জস্য আসবে। কিন্তু এটা হওয়ার জন্য সময়ের প্রয়োজন। যদি প্রসারণ না ঘটত, তাহলে বহুল বিস্তৃত এই মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রার সমতা দেখা যেতো না; কারণ এ ধরনের তাপমাত্রা সম্প্রসারণের গতি আলোর গতিসীমার মধ্যে সীমিত। অতি দ্রুত সম্প্রসারণকালীন সময়কে (আলোর গতির চেয়েও অনেক বেশি গতিতে) বিবেচনায় আনলে ক্ষুদ্র, আদি মহাবিশ্বের তাপমাত্রার এই প্রসারকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

স্ফীতি বিগ ব্যাংগ বা বৃহৎ বিস্ফোরণের ভেতর বিস্ফোরণের মাত্রার কথা বলে দেয়। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সূত্রমতে প্রচলিত বিগ ব্যাংগ তত্ত্বে যে রকম বিস্ফোরণের ধারণা করা যায়, ঐ সময়ে ঐ স্ফীতি তারচেয়ে আরো বিশাল ও ব্যাপক মাত্রার ছিল। সমস্যা হল এই যে, স্ফীতির এই তাত্ত্বিক মডেলকে উপযোগী মনে করলে মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থাকে বিশেষ মাত্রাতিরিক্ত ও অসম্ভব বিবেচনা করতে হয়। তাই প্রচলিত স্ফীতির তত্ত্ব একটি সমস্যার সমাধান করে ঠিকই, কিন্তু আর একটি সমস্যার সৃষ্টি করে– এটি কেবল একটি বিশেষ প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনার প্রয়োজন সৃষ্টি করেছে। সেটি হচ্ছে, শূন্য সময়কে তত্ত্বের পরিধিতে আনা, যা আমরা পরবর্তীকালে ব্যাখ্যা করব।

amarboi.com

যেহেতু আমরা আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে সৃষ্টিরহস্যের ব্যাখ্যা করতে পারছি না, সেহেতু আমরা যদি মহাবিশ্বের গোড়ার অবস্থা ব্যাখ্যা করতে চাই, তবে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে অন্য একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। যদি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব হিসেবে অকার্যকর প্রমাণিত না-ও হয়, তথাপিও একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বের প্রয়োজন– কেননা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ বস্তুর গঠনের ক্ষুদ্র মাপকাঠিকে বিবেচনায় আনেনি, যাকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিবেচনায় এনেছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোয়ান্টাম তত্ত্ব মহাবিশ্বের বৃহৎ পরিসরের মাপকাঠি ব্যাখ্যায় ততটা প্রযোজ্য নয়– কারণ এই তত্ত্ব বস্তুকণিকার আনুবীক্ষণিক পর্যায় নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

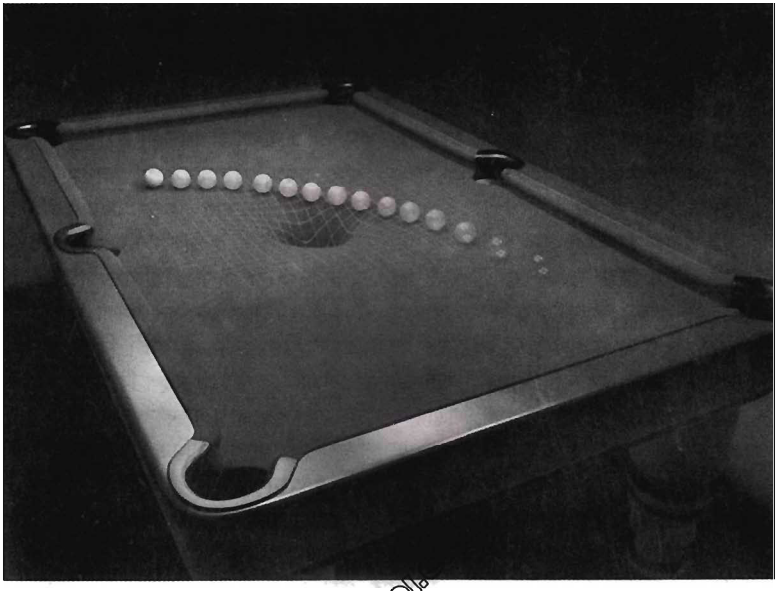

মোচড়ানো স্থান : বস্তু এবং শক্তি স্থানকে মুচড়ে দেয় এবং এক্ষেত্রে বস্তুর পথ পরিবর্তিত হয়।

আপনি যদি সময়ের অনেক পিছনে যেতে থাকেন, যখন মহাবিশ্ব প্লাঙ্কের আকারের মতো ক্ষুদ্র ছিল; যা এক সেন্টিমিটারের বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগের মতো– সেই মাপকাঠিতে কোয়ান্টাম তত্ত্বই বিবেচনায় আসা উচিত। অতএব, আমরা যদিও এখন পর্যন্ত মহাকর্ষীয় কোয়ান্টাম তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা জানি না, তথাপি আমরা জানি যে মহাবিশ্বের শুরুটা ছিল একটি কোয়ান্টাম ঘটনা। ফলে যখনই আমরা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথে মেলাতে চাই, তখনই মহাবিশ্বের স্ফীতি তত্ত্বের জন্য আমাদেরকে আরো পিছনে ফিরে মহাবিশ্বের উৎপত্তি লগ্নকে বুঝতে হবে; আমাদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে একীভূত করে দেখতে হবে।

এটি কীভাবে কাজ করে, তা বুঝার জন্য আমাদের জানা প্রয়োজন কীভাবে সময় ও স্থানকে মহাকর্ষবল দুমড়ে-মুচড়ে বাঁকিয়ে দেয়। স্থানের বক্রতাকে বুঝা সময়ের বক্রতাকে বুঝার চেয়ে সহজতর। মনে করুন, মহাবিশ্ব একটি বিলিয়ার্ড টেবিলের পৃষ্ঠদেশের মতো। টেবিলের একপিঠ সমতল, কমপক্ষে তাতে দুটি মাত্রা রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি আপনি একটি বল এই টেবিলের উপর গড়িয়ে দেন, তবে এটা সরলপথে চলবে। কিন্তু যদি টেবিলটি কিছুটা বাঁকানো বা গর্তবিশিষ্ট হয় (নিচের চিত্র অনুসারে), তাহলে বলটির গতিপথ বেঁকে যাবে।

এই উদাহরণে এটা দেখা সহজ যে বিলিয়ার্ড বোর্ডটি কীভাবে বাইরের একটি তৃতীয় মাত্রার কারণে বেঁকে যাচ্ছে– যা আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি। যেহেতু আমরা আমাদের সময়কালের বাইরে গিয়ে এই বক্রতাকে দেখতে পারি না, তাই আমাদের পক্ষে মহাবিশ্বের এই বক্রতা কল্পনা করাও কঠিন। কিন্তু বাইরে যেতে না পারলেও বড় স্থানিক মাপকাঠিতে এই বক্রতাকে দেখা যায়। এটা স্থানের ভেতর থেকেই নির্ধারণ করা যায়। একটি ক্ষুদ্র পিঁপড়াকে টেবিলের উপর আটকানো অবস্থায় কল্পনা করুন। এই পিঁপড়ার টেবিল থেকে বের হওয়ার ক্ষমতা না থাকলেও দূরত্বকে মেপে এই বক্রতাকে পিঁপড়াটি দেখতে পাবে। উদাহরণস্বরুপ, সমতলে বৃত্তের চারপাশের দূরত্ব বৃত্তের ব্যাসার্ধের চেয়ে তিনগুণের একটু বেশি (মূল ব্যাসার্ধকে পাই দিয়ে গুণ করা)। কিন্তু যদি পিঁপড়াটি বৃত্তটির ব্যাসের বরাবর টেবিলের উপর চিত্রের গর্তের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করে, তাহলে দেখা যাবে যে বৃত্তটির চারপাশের দূরত্বের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আসলে গর্তটি যদি বেশি গভীর হয়, তাহলে

AMARBOI.COM

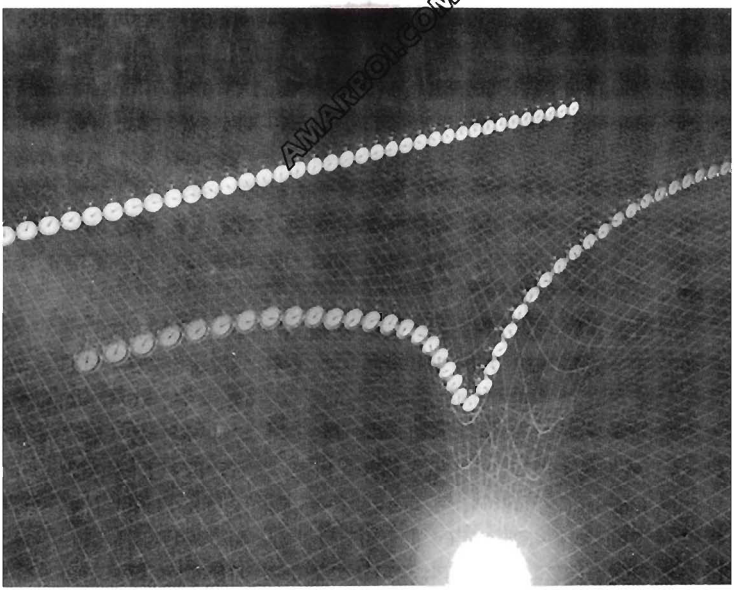

স্থান-সময় মোচড়ানো : বস্তু ও শক্তি সময়কে মুচড়ে দেয় এবং সময়ের মাত্রাকে স্থানের মাত্রার সাথে 'মিশিয়ে' দেয়।

পিঁপড়াটি কম দূরত্ব দেখতে পাবে। আমাদের মহাবিশ্বের বক্রতার বিষয়টি এ রকমই। মহাবিশ্ব তার স্থানের ভেতর দুটি বিন্দুর দূরত্ব কমাতে বা বাড়াতে পারে, এর জ্যামিতিকে বা এর আকারকে পরিবর্তিত করতে পারে– যা মহাবিশ্বের ভেতর থেকে মাপা যায়। সময়ের বক্রতাও একইভাবে সময়কে সংকুচিত অথবা প্রসারিত করে।

এই ধারণার উপর নির্ভর করে আসুন আমরা মহাবিশ্বের প্রারম্ভ নিয়ে আলোচনা করি। আমরা সময় এবং স্থানকে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করতে পারি, যেমনটি আমরা এই আলোচনায় মন্থরগতি এবং দুর্বল মহাকর্ষের ক্ষেত্রে দেখেছি। সাধারণভাবে যা-ই হোক না কেন, সময় এবং স্থানকে একসাথে মেশানো বা জড়ানো যায়। অতএব তাদের প্রসারণ বা সংকোচন একসাথে মেশানোর মাত্রার উপর নির্ভর করে। এই মেশানোর বিষয়টি প্রাথমিক মহাবিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়ের প্রারম্ভ বুঝার মূল চাবিকাঠি।

সময়ের প্রারম্ভের বিষয়টি মহাবিশ্বের কিনারা খোঁজার মতোই একটা বিষয়। যখন মানুষ পৃথিবীপৃষ্ঠকে সমতল বলে ভাবত, তখন তারা বিস্মিত হয়ে ভাবত যে সমুদ্র হয়তো পৃথিবীর কিনারা দিয়ে উপচে পড়ছে। এটা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। একজন পৃথিবীর কিনারা দিয়ে যেতে পারেন এবং তিনি তাতে পড়ে যাবেন না। পৃথিবীর কিনারায় গেলে মানুষ যে পড়ে যাবে না, এটা যখন তারা বুঝল, তখন সে জানতে পারলো যে পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল নয়– এটি একটি বাঁকানো স্থান। সময় এখানে অনেকটা রেললাইনের মতো। যদি সময়ের শুরু বলে কিছু একটা থাকত, তাহলে ট্রেনটিকে চালু করার জন্য কারো না কারোর উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল (যেমন ঈশ্বর)। যদিও আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে সময় ও স্থানকে একত্রে মিশিয়ে স্থান-কাল করা হয়েছে, তথাপি সময় ও স্থান দুটি ভিন্ন বিষয়। সময়ের এখানে একটি প্রারম্ভ ছিল এবং তার শেষও আছে অথবা এটি চিরকালীন চলমান বিষয় হিসেবে গণ্য হয়েছে। যাই হোক, যখন আমরা কোয়ান্টাম তত্ত্বের ফলাফলকে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাথে যুক্ত করি, তখন খুবই অস্বাভাবিক পরিমাণে বক্রতার উদ্ভব ঘটতে পারে এবং সময় তখন স্থানের অন্য আর একটি মাত্রার মতো আচরণ করতে পারে।

প্রাথমিক মহাবিশ্ব যখন ক্ষুদ্র ছিল এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব– উভয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, তখন মহাবিশ্বে স্থানের চারটি মাত্রা ছিল, কিন্তু সময়ের কোনো মাত্রা ছিল না। এর অর্থ হল, যখন আমরা মহাবিশ্বের 'প্রারম্ভের' কথা বলি, তখন আমরা অতি পেছনের প্রাথমিক মহাবিশ্বের ধারণার ভেতর চলে যাই, যেখানে সময় বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকেনা। আমাদের এটি অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, আমাদের স্থান ও কালের সাধারণ ধারণা একেবারে প্রাথমিক মহাবিশ্বের ধারণার সাথে খাপ খায় না। এটি আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে, কিন্তু আমাদের চিন্তার বাইরে নয়; এমনকি গণিতের আওতার বাইরেও নয়। যদি প্রাথমিক মহাবিশ্বের চারটি মাত্রাই স্থানিক মাত্রার মতো আচরণ করতো, তাহলে সময়ের প্রারম্ভের বিষয়টি কী হতো?

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়কে যদি স্থানের আর একটি মাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তবে সময়ের শুরুটা নিয়ে ভাবনার কোনো বিষয় থাকে না। এটা অনেকটা পৃথিবীর কিনারা না থাকার সমস্যার মতোই। ধরুন, মহাবিশ্বের শুরু হওয়াটা অনেকটা দক্ষিণ মেরুর মতো, অক্ষরেখাগুলো কাজ করছে সময় হিসেবে। এখন কেউ যদি উত্তরে যান, তবে অক্ষরেখাগুলো, যা মহাবিশ্বের আকারকে প্রতিনিধিত্ব করছে– তা প্রসারিত হবে। মহাবিশ্ব এখানে দক্ষিণ মেরুর একটি বিন্দুতে শুরু হয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণমেরু অন্য যে কোনো একটি বিন্দুর মতোই। মহাবিশ্ব শুরুর পূর্বে কী ঘটেছিল, এমন প্রশ্ন করা অর্থহীন; কারণ দক্ষিণ মেরুর দক্ষিণে কোনো স্থান নেই। এই ধারণার ভেতর স্থান-কালের কোনো সীমানা নেই। প্রকৃতির যে নিয়ম দক্ষিণ মেরুতে চলবে, তা সর্বত্র চলবে। একইভাবে কেউ যদি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথে যুক্ত করেন, তখন মহাবিশ্ব শুরুর পূর্বে কী ঘটেছিল, তা জিজ্ঞেস করা অর্থহীন। এই ধারণাকে সীমানাহীন অবস্থা (No-boundary Condition) বলা হয়, যেখানে ঘটনাসমূহ আবদ্ধ তলের ভেতর সীমানাহীন অবস্থায় ঘটে থাকে।

কয়েক শতাব্দী আগে এরিস্টোটলসহ অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে মহাবিশ্ব চিরকাল ধরেই বিরাজমান। মহাবিশ্ব কীভাবে তৈরি হয়েছে, এ সমস্যাটিকে পরিহার করার সুবিধার্থেই তাদের এ বিশ্বাস ছিল। অন্যরা বিশ্বাস করতেন, মহাবিশ্বের একটা প্রারম্ভ রয়েছে এবং এটাকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করাতেন। আজকের দিনে সময়, স্থান হিসেবে আচরণ করে, এই ধারণা এক নতুন বিকল্প উপস্থাপন করেছে। এটা মহাবিশ্বের শুরুর বিরোধিতার যে যুক্তি ছিল, সেই প্রাচীন ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। এটা বোঝায় যে মহাবিশ্বের শুরুটা হয়েছিল বিজ্ঞানের সূত্রমতে, এবং তা শুরু করার জন্য কোনো ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই।

যদি মহাবিশ্বের প্রারম্ভ একটি কোয়ান্টাম ঘটনা হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ফেইনম্যানের ইতিহাসসমূহের যোগফলের সাহায্যে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে। যেখানে দর্শক নিজেই মহাবিশ্বের ভেতরে অবস্থিত, সেখানে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে সমগ্র মহাবিশ্বের জন্য প্রয়োগ করাটা একটা চালাকি বটে। যা হোক, চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে বস্তুকণিকা কীভাবে দুই ফুটো বিশিষ্ট পর্দার উপর নিক্ষেপ করলে পানির ঢেউয়ের মতো সংঘর্ষ ঘটে। ফেইনম্যান দেখিয়েছেন যে, এটা ঘটে; কারণ একটি কণিকার শুধুমাত্র একটি ইতিহাস থাকে না। শুরুর A বিন্দু থেকে কণিকাটির শেষবিন্দু B তে যাওয়ার পথ কোনো নির্দিষ্ট একটি পথ নয়– এটা একই সাথে সকল সম্ভাব্য পথই বেছে নেয়। এই মতানুসারে কণিকার সংঘর্ষ কোনো অবাক করা ঘটনা নয়। উদাহরণস্বরূপ, কণিকা একই সাথে উভয় ছিদ্রপথে ভ্রমণ করতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। কণিকার গতি বিবেচনা করে যদি ফেইনম্যানের পদ্ধতি অনুযায়ী বলা যায় যে, কোনো কণিকার শেষ গন্তব্যটি নির্ধারণ করতে হলে আমাদেরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কণিকার গন্তব্যপথের সম্ভাব্য সমস্ত ঘটনাকে বিবেচনায় আনতে হবে। এখন আমরা ফেইনম্যানের পদ্ধতিকে কোয়ান্টাম সম্ভাবনার আলোকে মহাবিশ্বের জন্য প্রযোজ্য মনে করি, তাহলে A বলে কোনো প্রারম্ভিক

বিন্দু নেই। সুতরাং আমরা সীমানাহীন অবস্থার আওতায় সমস্ত ঘটনাকে একত্র করে আজকের যে মহাবিশ্বকে দেখতে পাচ্ছি সেখানে এসে শেষ করতে পারি।

এই মতানুসারে মহাবিশ্ব স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই সৃষ্টি হয়েছে এবং সম্ভাব্য সব পথেই যাত্রা শুরু করেছে। অন্যান্য মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেও এটা একই রকমভাবে ঘটেছে বলে বলা যায়। সেখানে কিছু মহাবিশ্ব আমাদের মতোই, কিন্তু বেশির ভাগই ভিন্ন প্রকারের। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে সেগুলোর ঘটনাপ্রবাহই যে ভিন্ন, তা নয়– যেমন এলভিস সত্যই অল্পবয়সে মারা গিয়েছেন কিনা, বা টার্নিপ মরুভূমির খাদ্য কিনা– এগুলো সেখানে বিবেচ্য নয়। বরং প্রকৃতির সূত্রগুলোই সেখানে ভিন্নতর। আসলে অনেকগুলো মহাবিশ্ব প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন সূত্র অনুসারে চলছে। কিছু লোক এটিকে একটি বড় রকমের রহস্য মনে করেন, কেউ একে বহু মহাবিশ্বের ধারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ফেইনম্যানের সমস্ত সম্ভাব্য সংঘটনের ইতিহাসের একটি বহুবিচিত্র রূপায়ন।

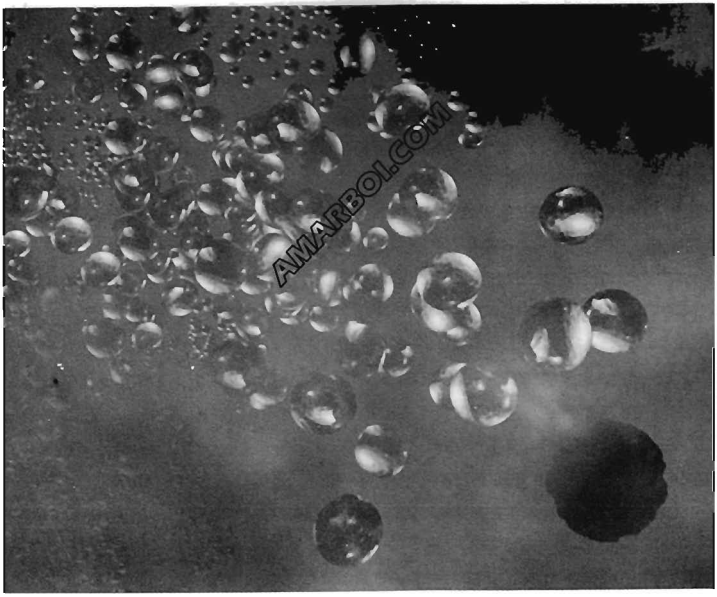

মাল্টিভার্স : শূন্যতা থেকে কোয়ান্টাম চঞ্চলতা ছোট ছোট মহাবিশ্বের সৃষ্টি করেছে। এর ভেতর কোনো কোনোটি একটি বিশেষ আকৃতিতেই উপনীত হয়েছে, তারপর দ্রুত স্ফীততর হচ্ছে– যার ভেতর ছায়াপথ, তারকারাজি এবং অন্তত একটি ক্ষেত্রে আমাদের মতো মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটি বুঝার জন্য আসুন, এডিংটনের বেলুনের পরীক্ষাকে পরিবর্তিত করে চিন্তা করি। সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বকে একটি বেলুনের পৃষ্ঠদেশ বলে কল্পনা করুন। স্বতঃস্ফূর্ত মহাবিশ্বের কোয়ান্টাম সৃষ্টি ফুটন্ত পানির বুদবুদের মতো। অনেক ছোট বুদবুদ সেখানে সৃষ্টি হয় এবং আবার তা হারিয়ে যায়। এটা আনুবীক্ষণিক মাপকাঠিতে ক্ষুদ্র মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং বিলীন হওয়া। এগুলো সম্ভাব্য ভিন্ন মহবিশ্বের প্রতীক, কিন্তু তা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য নয় এজন্য যে এগুলো বেশি সময় টেকেনা– যার ভেতর ছায়াপথ বা তারকার উদ্ভব হতে পারে; বুদ্ধিমান প্রাণীর উদ্ভব হওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার। তবে এদের কিছু কিছু বুদবুদ বড় হয়ে উঠে এবং এগুলো বিলীন না হয়ে টিকে যায়। এগুলো সম্প্রসারিত হতে থাকে দ্রততর গতিতে এবং এ কারণে আমরা তখন বাষ্পের অনেকগুলো বুদবুদ দেখতে পাই। এই চিত্রকে সে সমস্ত মহাবিশ্বগুলোর সাথে মিলিয়ে নেয়া যায়– যা দ্রুততর হারে সম্প্রসারিত হবে, অথবা প্রসারমান পর্যায়ে রয়েছে।

আমরা যেমনটা বলেছি, স্ফীতির কারণে সম্প্রসারণ সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ঘটেনা। সমস্ত সংঘটনের যোগফলে একটি মাত্র নিয়মানুবর্তী, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে; এটা হল সবচেয়ে বেশি ঘটার সম্ভাবনা। কিন্তু অন্যান্য সংঘটনের ইতিহাস খুব স্বল্প মাত্রায় সামঞ্জস্যহীন এবং এটি ঘটার সম্ভাবনার মাত্রাও খুবই বেশি। এজন্যেই স্ফীতি আমাদেরকে বলে দেয় যে বর্তমানকালে আমরা CMBR প্রত্যক্ষ করে তাপমাত্রার যে তারতম্য দেখতে পাই, তার তুলনায় আদি মহাবিশ্ব ছিল সামান্য পরিমাণে অসমসত্ত্ব। এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য। কেননা আদি মহাবিশ্বের সমসত্ত্বতা ভালো জিনিস, যদি আপনি দুধ থেকে মাখন তুলে আনতে না চান। কিন্তু সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমসত্ত্ব মহাবিশ্ব একটি নিরানন্দ জগৎ। প্রাথমিক মহাবিশ্বের অনিয়মটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কোনোস্থানে যদি অন্যস্থানের চেয়ে বেশি ঘনত্ব থাকে, তখন বাড়তি ঘনত্বের কারণে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ সম্প্রসারণকে তুলনামূলকভাবে মন্থর করে তুলে। যখন মহাকর্ষীয় বল বস্তুগুলোকে একত্রিত করে, তখন ক্রমান্বয়ে একীভূত হয়ে গ্যালাক্সি এবং তারকাসমূহের উদ্ভব ঘটে; সেখান থেকে গ্রহ এবং অন্তত একটি গ্রহে মানুষের উদ্ভব ঘটতে পারে। অতএব নিবিষ্টচিত্তে মহাকাশের মাইক্রোওয়েভ চিত্রটি লক্ষ করুন। মহাবিশ্বের সামগ্রিক কাঠামোর এটি একটি নীল নকশা। আমরা প্রাথমিক মহাবিশ্বের কোয়ান্টাম চঞ্চলতা থেকে সৃষ্ট। কেউ যদি ধার্মিক হয়ে থাকেন, তবে তিনি বলতে পারেন– ঈশ্বর নিশ্চিতই পাশা খেলে থাকেন।

এই ধারণা মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা মহাবিশ্বের যে ইতিহাস চিন্তা করতাম, এই ধারণার আলোকে তাকে নতুন করে দেখতে হবে। মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বলার জন্য আমাদেরকে এখনকার মহাবিশ্বের সমস্ত স্থানের সম্ভাব্য অবস্থার হিসেব করতে হবে। পদার্থবিদ্যায় একজন সাধারণত কোনো পদ্ধতির জন্য একটি প্রারম্ভিক পদ্ধতি বিবেচনায় নেন এবং প্রয়োজনীয় গাণিতিক সমীকরণ প্রয়োগ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। একটি পদ্ধতির একটি নির্দিষ্ট সময়ের অবস্থাকে তুলনা করে একজন পরবর্তীকালে বিভিন্ন অবস্থায় পদ্ধতিটির সম্ভাব্যতা যাচাই করেন। মহাকাশবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মহাবিশ্বের মাত্র একটি নির্দিষ্ট ইতিহাসকেই হিসেবে

ধরা হয়। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রসমূহ ব্যবহার করে একজন সময়ের সাথে তার ইতিহাসের পরিবর্তন হিসেব করতে পারেন। আমরা মহাকাশ বিজ্ঞানে এটাকে 'নিচ থেকে উপরে' (Bottom-up) যাওয়ার পদ্ধতি বলি। কিন্তু যেহেতু আমাদেরকে অবশ্যই ফেইনম্যান-এর সংঘটনের যোগফলকে মহাবিশ্বের কোয়ান্টাম পদ্ধতির ব্যাখ্যায় ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে, সুতরাং এখন মহাবিশ্ব যে সম্ভাব্য বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে সম্ভাব্য সীমানাহীন অবস্থার ধারণায় নিয়ে হিসেব করতে হবে। এখানে মহাকাশবিদ্যায় 'নিচ থেকে উপরের' ইতিহাসকে বিবেচনা করলে হবে না; কারণ সেখানে মহাবিশ্বের একটিমাত্র সুস্পষ্ট ইতিহাস ও বিবর্তনকে বিবেচনা করা হয়েছে। এর পরিবর্তে আমাদেরকে 'উপর থেকে নিচ' (Top-down) দেখতে হবে, অর্থাৎ বর্তমান থেকে পেছনের দিকে তাকাতে হবে। কিছু সংঘটন অন্যান্য সংঘটনের চেয়ে বেশি সম্ভাব্য হবে এবং এর যোগফল একটিমাত্র সংঘটনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, যা মহাবিশ্বের সৃষ্টির শুরু থেকে ইতিহাসের ধারণার ভেতর দিয়ে একত্রিত হওয়া। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য অবস্থায় এর সংঘটন বিভিন্নরকম হবে। কার্যকারণ সম্পর্ক এবং ফলাফলের উপর

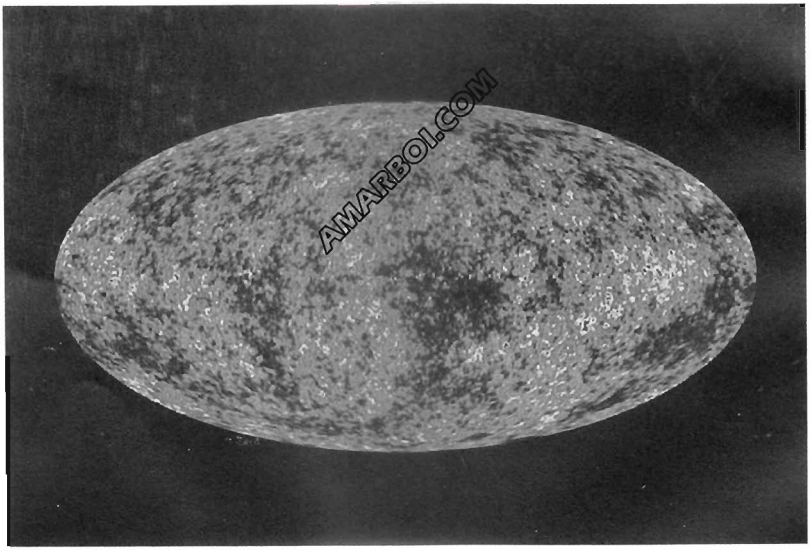
AMARBOI.COM

মাইক্রোওয়েভ পটভূমি : ২০১০ সালে প্রকাশিত এই ছবিটি সাত বছরব্যাপী WMAP উপাত্ত থেকে প্রাপ্ত মহাকাশের ছবি। রঙের পার্থক্য দিয়ে এখানে তাপমাত্রার চঞ্চলতা দেখানো হচ্ছে– যা ১৩.৭ বিলিয়ন বছরের পুরোনো। এই তাপমাত্রার পার্থক্য এক সেন্টিগ্রেডের এক হাজার ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম বলে হিসেব করা হয়েছে। তবু এটাই গ্যালাক্সিগুলো সৃষ্টির বীজ। সৌজন্যে : নাসা/WMAP-র বিজ্ঞানীগণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাকাশবিজ্ঞানে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে। ফেইনম্যানের যোগফল যে সংঘটনের কারণে ঘটেছে, তার কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, বরং এটা নির্ভর করছে প্রাপ্ত পরিমাপের ফলাফলের উপর। আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ইতিহাসকে নির্মাণ করি, ইতিহাস আমাদেরকে নির্মাণ করে না।

মহাবিশ্বের কোনো দর্শক-নির্ভর একক ইতিহাস নেই– এ ধারণাটি মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের প্রাপ্ত জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারো এমন একটি ধারণা থাকতে পারে যে চাঁদ পনিরের তৈরি। কিন্তু আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে চাঁদ পনিরের তৈরি নয়– যা ইঁদুরদের জন্য দুঃসংবাদ। আমাদের মহাবিশ্বের বর্তমান যে অবস্থার বিষয়ে আমরা অবগত হয়েছি, তাতে চাঁদকে পনিরের তৈরি ভাবাটা অসঙ্গতিপূর্ণ; যদিও অন্য মহাবিশ্বে এরকমটা হতে পারে। সেটা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু তা নয়।

'উপর-নিচ' ধারণার ভেতর উল্লেখযোগ্য অংশটি হচ্ছে, সম্ভাব্য প্রাকৃতিক নিয়মাবলি মহাবিশ্বের ভেতরকার সংঘটনের উপর নির্ভর করে। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে সমস্ত ধ্রুবকসহ মহাবিশ্বের সব তত্ত্বকে একটি মাত্র তত্ত্বের ভেতর সংজ্ঞায়িত করা যায়; যেমন ইলেকট্রনের ভর কিংবা স্থান-কালের মাত্রার বিষয়টি। কিন্তু 'উপর-নিচ' মহাকাশবিজ্ঞান অনুসারে সম্ভাব্য প্রাকৃতিক নিয়মাবলি মহাবিশ্বের বিভিন্ন প্রকার সংঘটনগুলোর মতোই বিভিন্ন রকম।

মহাবিশ্বের সম্ভাব্য মাত্রাগুলোর কথা বিবেচনা করুন। M-তত্ত্ব (M-theory) মতে, স্থান-কালের ভেতর স্থানের দশটি মাত্রা আছে এবং সময়ের মাত্রা একটি। এর মধ্যে আবার স্থানের সাতটি মাত্রা কুঞ্চিত এবং সেগুলো এত ক্ষুদ্র যে আমরা সেগুলোকে দেখতে পাই না। এতে আমরা ধাঁধায় পড়ে যাই এবং বাকি তিনটি মাত্রার কথাই ভাবি, যারা বড় মাপের এবং যাদের সাথে আমরা পরিচিত। M-তত্ত্বের কাছে খোলাখুলি মূল প্রশ্ন হল, কেন আমাদের মহাবিশ্বে আরো বেশি বৃহৎ মাত্রা নেই এবং কিছু সংখ্যক মাত্রা কেন কুঞ্চিত?

অনেকেই বিশ্বাস করতে পছন্দ করেন যে, তিনটি মাত্রাকে ছাড় দিয়ে কোনো একটি কারণে স্বাভাবিক ভাবেই এরকমটা হয়েছে। অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, হতে পারে সবগুলো মাত্রাই ছোট আকার থেকে শুরু হয়েছে এবং কিছু বোধগম্য কারণে তিনটি স্থানিক মাত্রা বড় হয়ে গেছে, কিন্তু অন্যগুলো হয়নি। এরকম মনে হয় যেন, মহাবিশ্বের চারটি মাত্রা থাকার বাস্তব কোনো যুক্তি নেই। এর পরিবর্তে 'উপর-নিচ' মহাজাগতিক বিজ্ঞানে বলা হয় যে, পদার্থবিদ্যার কোনো সূত্রই বড় মাপের স্থানিক মাত্রার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারে না। বৃহৎ স্থানিক মাত্রার জন্য শূন্য থেকে দশের মধ্যে প্রতিটি সংখ্যার জন্য কোয়ান্টাম সংখ্যার বিস্তার থাকবে। মহাবিশ্বের সম্ভাব্য সকল সংঘটনের জন্য ফেইনম্যানের যোগফল এটাকে সমর্থন করে; কিন্তু আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের তিনটি বড় স্থানিক মাত্রার গুণাবলি, যা আমরা দেখতে পাই; সেগুলো অনেকগুলো উপশ্রেণী সংঘটন থেকে বের করা হয়েছে। অন্য অর্থে, মহাবিশ্বের তিনটির বেশি বা কম মাত্রা থাকার কোয়ান্টাম সম্ভাব্যতার কথা বলা অসঙ্গতিপূর্ণ– কারণ আমরা ইতোমধ্যেই নির্ধারণ করে নিয়েছি যে আমরা এমন এক মহাবিশ্বে বাস করছি, যেখানে তিনটি বড় স্থানিক মাত্রা

AMARBOI.COM

রয়েছে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবাবিলিটি এমপ্লিচুড-এর মাত্রা শূন্য না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য মাত্রার তুলনায় এগুলো কত ক্ষুদ্র হবে, তা হিসেব করার কোনো উপযোগিতা নেই। এটা অনেকটা একথা বলার মতোই যে বর্তমান পোপ চীনা। আমরা জানি যে বর্তমান পোপ একজন জার্মান, কিন্তু যেহেতু জার্মানদের সংখ্যা চীনাদের চেয়ে অনেক কম– তাই পোপের জার্মান হওয়ার চেয়ে চীনা হওয়ার সম্ভাব্যতাই বেশি বলে ভাবা। একইরকম ভাবে আমরা জানি, আমাদের মহাবিশ্বে মাত্র তিনটি বড় স্থানিক মাত্রা দৃশ্যমান। যদিও অন্যান্য বড় মাপের স্থানিক মাত্রা থাকার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে, তথাপি আমরা এ তিনটিকে বিবেচনায় আনতেই আগ্রহী।

কিন্তু কুঞ্চিত মাত্রাগুলোর ব্যাপারটা কিরকম? স্মরণ করুন, M-তত্ত্বে বাকি সব কুঞ্চিত মাত্রার সঠিক আকার; যেমন আভ্যন্তরীণ স্থান, ইলেকট্রনের চার্জের পরিমাণ ইত্যাদি ভৌতমান মৌলিক কণিকাগুলো বা প্রাকৃতিক বলসমূহের মিথস্ক্রিয়ায় নির্ধারিত হয়। এগুলো খুব সঠিকভাবে নির্ণয় করা যেতো, যদি M-তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা একটি কুঞ্চিত মাত্রা অথবা কয়েকটি কুঞ্চিত মাত্রার আকার জানতে পারতাম। তাহলে প্রকৃতির নিয়মের যে কোনো একটি সম্ভাব্য চিত্র জানা যেত। এর পরিবর্তে, প্রবাবিলিটি এমপ্লিচুড বলে যে সম্ভবত $১০^{৫০০}$ প্রকারের আভ্যন্তরীণ স্থান রয়েছে এবং এর প্রতিটিই আমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রাবলি এবং ভৌত ধ্রুবকের মান নির্দেশ করে।

যদি কেউ 'নিচ থেকে উপরে'র দিকে মহাবিশ্বের একটি চিত্র আঁকি, তাহলে কণিকার মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট আভ্যন্তরীণ স্থানের কারণে মহাবিশ্বের বিলুপ্তির কোনো কারণ নেই– যা আমরা স্ট্যান্ডার্ড মডেলে (প্রাথমিক কণিকার মিথস্ক্রিয়ার ফলে) দেখতে পাই। কিন্তু উপর থেকে নিচের ধারণায় সমস্ত সম্ভাব্য আভ্যন্তরীণ স্থানসহ মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। কোনো কোনো মহাবিশ্বে ইলেকট্রনের ওজন একটি গলফ বলের সমান এবং মহাকর্ষীয় বলও হয়তো চুম্বকীয় বলের চাইতে শক্তিশালী হতে পারে। আমাদের মহাবিশ্ব সীমানাহীন অবস্থার আলোকে আভ্যন্তরীণ স্থানের প্রবাবিলিটি এমপ্লিচুড নিরূপণের মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড মডেলকেই প্রমাণ করে। অন্যান্য সম্ভাবনার তুলনায় সম্ভাব্য বিস্তার যত ছোটই হোক না কেন, তিনটি বড় স্থানিক মাত্রার সাথে আমাদের মহাবিশ্বের ধারণা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই অনুচ্ছেদে আমরা যে তত্ত্ব বর্ণনা করেছি, তা পরীক্ষাযোগ্য। আগের উদাহরণসমূহে ভিন্ন ধরনের অন্যান্য মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে আমরা আপেক্ষিক প্রবাবিলিটি এমপ্লিচুড-এর উপর জোর দিয়েছি, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার স্থানিক মাত্রার কথা বলেছি। এতে কিছু যায় আসে না। প্রতিবেশি (অর্থাৎ একই রকম) মহাবিশ্বের ব্যাখ্যার জন্য আপেক্ষিক প্রবাবিলিটি এমপ্লিচুড গুরুত্বপূর্ণ। সীমানাহীন অবস্থা বলে যে, যে সমস্ত মহাবিশ্ব সর্বপ্রকার সুষমতায় শুরু হয়েছে, সেখানে সংঘটনের জন্য সম্ভাব্য বিস্তারের (প্রবাবিলিটি এমপ্লিচুড) সংখ্যা সর্বোচ্চ। যেখানে মহাবিশ্ব অনিয়মিতভাবে শুরু হয়েছে, সেখানে এই বিস্তারের মান কম হয়। এর অর্থ এই যে ছোট ছোট অসংলগ্নতা থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক মহাবিশ্ব সর্বাঙ্গীন সুষম হতে পারত। আমরা দেখেছি যে স্বল্পমাত্রার তারতম্যসহ আকাশের বিভিন্ন দিক থেকে মাইক্রোওয়েভ রশ্মির মাধ্যমে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসংলগ্নতাকেই পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছি। এটা স্ফীতি তত্ত্বের সাথে সুন্দরভাবে মিলে যায়। যাহোক, উঁচু থেকে নিচু তত্ত্বের আরো সঠিক পরিমাপ করা আবশ্যক– অন্যান্য তত্ত্ব থেকে তাকে আলাদাভাবে বুঝার জন্য এবং তাকে সমর্থন করা অথবা প্রত্যাখ্যান করার জন্য। আগামী দিনের উপগ্রহসমূহ এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাবে।

শতশত বছর আগে মানুষ মনে করত যে পৃথিবী একটি অনন্য সাধারণ স্থান এবং মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত। আজ আমরা জানি যে শত মিলিয়ন বিলিয়ন তারকা শুধুমাত্র আমাদের ছায়াপথেই বিদ্যমান, যার একটি বৃহৎ অংশে রয়েছে গ্রহজগৎ। আর এ ধরনের ছায়াপথ রয়েছে শতকোটি বিলিয়ন। এই পরিচ্ছদে যে কথা বলা হয়েছে, তা হল বহু মহাবিশ্বের মধ্যে আমাদের মহাবিশ্ব হচ্ছে একটি, যার সম্ভাব্য সূত্রসমূহ অনন্য সাধারণভাবে নির্ধারিত হয়নি। তাদের জন্য এটা হতাশার কথা, যারা একটি চূড়ান্ত একীভূত তত্ত্বের আশা করেন– যা আমাদেরকে নৈমিত্তিক পদার্থবিদ্যার রহস্যকে উন্মোচিত করবে। আমরা বৃহৎ স্থানিক মাত্রা অথবা আভ্যন্তরীণ স্থানের সংখ্যা ও পৃথক চরিত্রের ভবিষ্যদ্বাণী করতে অক্ষম, যেগুলো আমাদের দৃশ্যমান জগতের ভৌত পরিমাণকে নির্ধারণ করে (যেমন ইলেক্ট্রন এবং অন্যান্য মৌলিক কণিকার ভর এবং চার্জ)। এর পরিবর্তে আমরা ফেইনম্যানের যোগফল কোন সংঘটনগুলোর মাধ্যমে পাওয়া যাবে, তা জানতে এই সংখ্যাগুলোকে ব্যবহার করি।

আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে রয়েছি, যখন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছার ধারণা এবং পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, এসব বিষয়ে ভাবতে হবে। এটা মনে হচ্ছে যে পরিদৃশ্য প্রাকৃতিক সূত্রের জন্য মৌলিক সংখ্যা, এমনকি এর প্রকৃতি, ইত্যাদি- যুক্তিশাস্ত্র কিংবা ভৌত নিয়মের দ্বারা শাসিত নয়। এই সমস্ত সংখ্যা বা হিসেব-নিকেশ অনেক বিষয়ের জন্য বা কোনো তত্ত্বের জন্য স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা যায়– যা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গাণিতিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটাবে। এর মান বা প্রকৃতি বিভিন্ন মহাবিশ্বের জন্য বিভিন্ন ধরনের হবে। সেগুলো হয়তো আমাদেরকে মানুষ হিসেবে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে না, অথবা প্রকৃতির সব সূত্রের একটি প্যাকেজ হিসেবে ধরা দেবে না। তবে এটাই হয়তোবা প্রকৃতির নিয়ম বা প্রবণতা।

সম্ভাব্য মহাবিশ্বের একটি বিশাল দৃশ্যচিত্র রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। যা-ই হোক না কেন, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব আমাদের মতো জীবনের উদ্ভব ঘটার সম্ভাবনাপূর্ণ মহাবিশ্বের সংখ্যা কতো কম। আমরা এমন একটি মহাবিশ্বে বাস করি, যেখানে জীবনের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু মহাবিশ্ব যদি সামান্য অন্যরকম হতো, তাহলে আমাদের মতো প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে পারতো না। এই সূচারু নিয়ম তৈরিতে আমরা কীভাবে সম্পৃক্ত? এটা কী একজন মহান সৃষ্টিকর্তার অনিবার্য উপস্থিতিই প্রমাণ করে? না কী বিজ্ঞান এক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

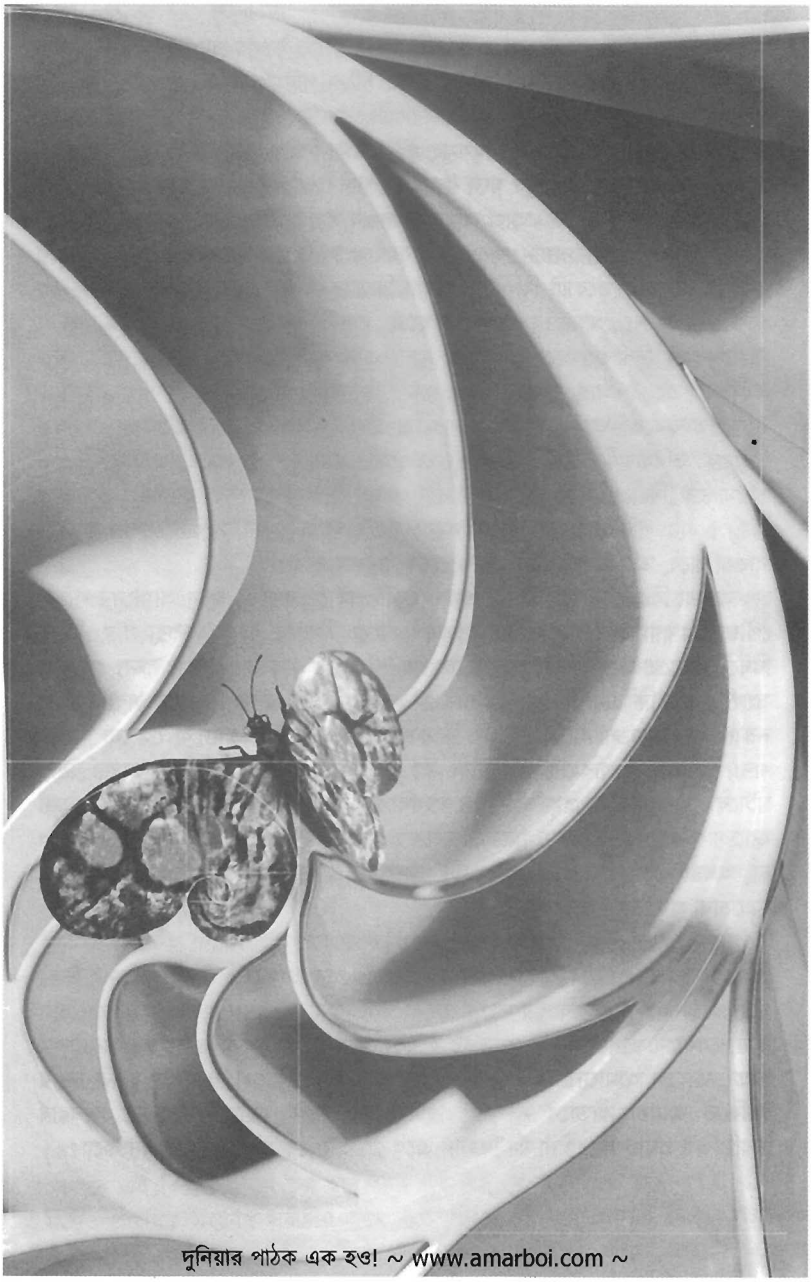

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীয়মান অলৌকিক ঘটনা

চীনের ঝিয়া রাজবংশের শাসনামলের (খৃ:পূ: ২২০৫-খৃ:পূ: ১৭৮২) একটি গল্প প্রচলিত আছে। তখন নাকি আমাদের মহাজাগতিক পরিবেশ হঠাৎ করে পরিবর্তিত হয়েছিল। আকাশে দশটি সূর্যের আবির্ভাব হয়েছিল এবং অত্যধিক তাপমাত্রার কারণে পৃথিবীর মানুষ খুবই কষ্ট পাচ্ছিল। অতএব, রাজা একজন বিখ্যাত তীরন্দাজকে আদেশ দিলেন আকাশের বাড়তি সূর্যগুলোকে তীরবিদ্ধ করে মেরে ফেলতে। পুরস্কার হিসেবে তীরন্দাজকে এমন একটি বড়ি দেয়া হল, যা খেলে তিনি অমরত্ব লাভ করতে পারবেন। কিন্তু তার বউ সেটা চুরি করে খেয়ে ফেললো। এর শাস্তিস্বরূপ সে চাঁদে নির্বাসিত হল।

চীনারা এক অর্থে সঠিক ছিলেন যে আমাদের সৌরজগতে দশটি সূর্যের অবস্থান মানুষের জীবনধারণের জন্য একেবারেই সহায়ক নয়। আজ আমরা যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে সৌরজগতে অনেকগুলি সূর্যের উপস্থিতি রোদে চামড়া পুড়াতে সহায়ক হলেও জীবন বিকাশের জন্য তা কখনো সহায়ক নয়। চীনা রূপকথায় যে অসহনীয় তাপমাত্রাকেই এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, এটা শুধুমাত্র সে সহজ কারণটিই নয়। সত্যি বলতে কি, একটি গ্রহ অনেকগুলো তারকার কক্ষপথ পরিভ্রমণ করলেও এর তাপমাত্রা আরামপ্রদ থাকতে পারে, অন্তত তা কিছু সময়ের জন্য। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে সমানভাবে চলা, উষ্ণতা– যা জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়– তা হওয়ায় সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু কেন? এটা বুঝতে হলে দেখা যাক, সবচেয়ে সহজ একটি বহু-তারকা পদ্ধতির ভেতর কী ঘটে থাকে? তেমন একটি পদ্ধতি, যাকে বলা হয় বাইনারি বা দ্বিতারকা পদ্ধতি এবং তাতে দু'টো সূর্য থাকে। আকাশের প্রায় অর্ধেক তারকাই এই পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু সহজতম দ্বিতারকা পদ্ধতিও বিশেষ ধরনের সুস্থির কক্ষপথ অনুসরণ করে চলতে পারে, যা ১২৪ পৃষ্ঠার ছবিতে দেখানো হয়েছে। এর প্রতিটি কক্ষপথে একটি গ্রহ এক সময়ে এমন অবস্থানে পৌঁছে, যে সময়ে তাপমাত্রা অত্যধিক শীতল কিংবা

স্টিফেন হকিং ও লিওনার্দ মুডিনাও # ১২৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

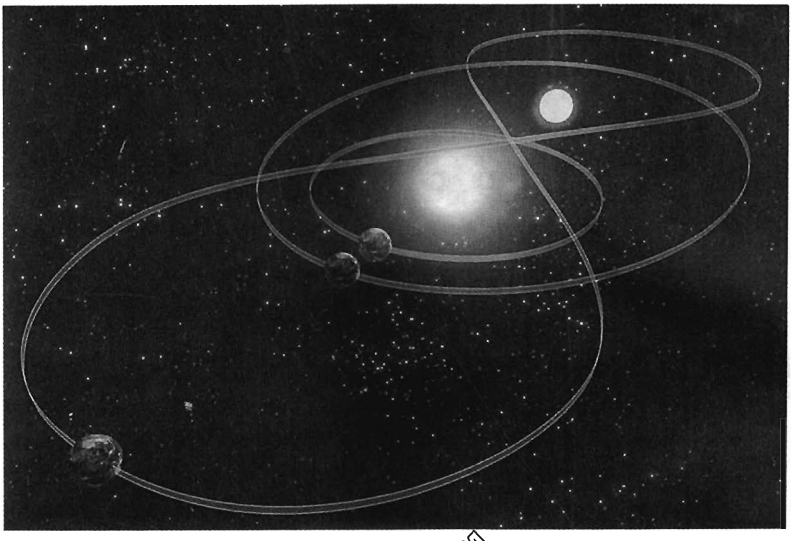

বাইনারি বা দ্বিতারকা কক্ষপথ : বাইনারি তারকা পদ্ধতিতে পরিভ্রমণরত গ্রহসমূহের পরিবেশ জীবনের প্রতি বিরূপ; কোনো ঋতুতে তা অতি উষ্ণ, কোনো ঋতুতে অতি শীতল।

AMARBOI.COM

উষ্ণ। সুতরাং তা জীবনকে পোষণের উপযোগী নয়। আর এ অবস্থাটি বহু তারকা পদ্ধতির ক্ষেত্রে আরো ভয়াবহ।

আমাদের সৌরজগৎ অন্য ধরনের 'সৌভাগ্যবান' গুণাবলি দিয়ে সমৃদ্ধ, যা না হলে তাতে এতটা উঁচুমানের জীবন উদ্ভব সম্ভব হতো না। উদাহরণস্বরূপ, নিউটনের সূত্রাবলি গ্রহসমূহের কক্ষপথকে হয় বৃত্তাকার কিংবা উপবৃত্তাকার হিসেবে বর্ণনা করেছে (উপবৃত্ত হচ্ছে কিছুটা চাপা বৃত্তের মতো, এক অক্ষে যথেষ্ট চওড়া এবং অন্য অক্ষে অপ্রশস্ত)। বৃত্তের তুলনায় উপবৃত্ত কতটুকু চাপা, তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে উৎকেন্দ্রিকতার পরিমাপে, যে সংখ্যাটি শূন্য থেকে এক এর ভেতরে। যে উৎকেন্দ্রিকতার মান শূন্যের কাছাকাছি, তা বৃত্তের মতোই; অন্যদিকে উৎকেন্দ্রিকতার মান এক এর কাছে হলে তা চ্যাপ্টা ধরনের। গ্রহগুলো যে সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে ভ্রমণ করেনা, এ ধারণা লাভ করে কেপলার মানসিক বিপর্যয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা মাত্র ২ শতাংশ, যার অর্থ এই যে, এটা মোটামুটি বৃত্তাকার। ফলে আমাদেরকে খুবই সৌভাগ্যবান বলে অভিহিত করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

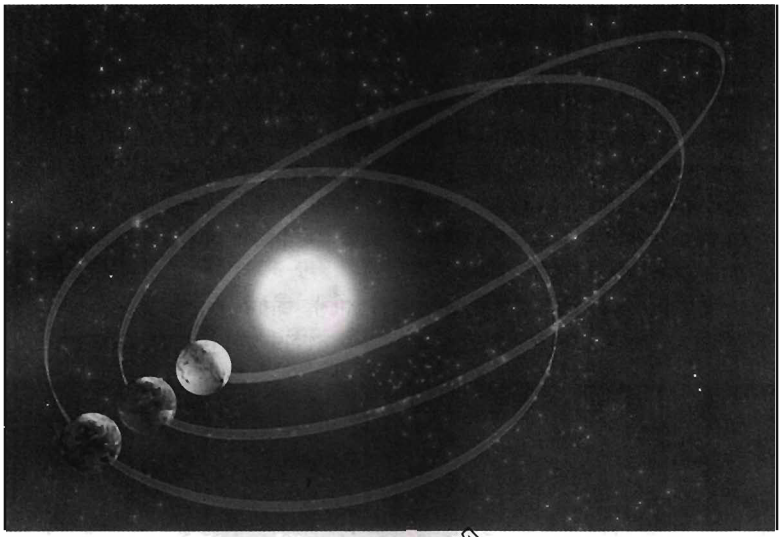

উৎকেন্দ্রিকতা : উপবৃত্ত বৃত্তের কতটা কাছাকাছি উৎকেন্দ্রিকতা হচ্ছে তারই পরিমাপ। বৃত্তাকার কক্ষপথ জীবনের জন্য অনুকূল। অন্যদিকে দীর্ঘায়ত কক্ষপথের কারণে ঋতুকালীন তাপবৈচিত্র্য অনেক বেশি হয়।

AMARBOI.COM

পৃথিবীতে ঋতুবৈচিত্র্য নির্ধারিত হয় প্রধানত সূর্যের চারপাশে পরিভ্রমণরত পৃথিবীর অক্ষের হেলানো তলের কারণে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর গোলার্ধে শীতকালে উত্তর মেরু সূর্যের থেকে দূরে হেলে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী সে সময়টিতে সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে– মাত্র ৯১.৫ মিলিয়ন মাইল দূরে; যেখানে জুলাই মাসের প্রথমদিকে তার দূরত্ব হচ্ছে ৯৪.৫ মিলিয়ন মাইল। তাপমাত্রা হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই দূরত্ব পৃথিবীর অক্ষের হেলানো তলের তুলনায় নগণ্য ভূমিকা রাখে। কিন্তু অন্য গ্রহে, যেখানে উৎকেন্দ্রিকতার মান অনেক বেশি, সেখানে সূর্যের সাথে তার দূরত্ব অনেক বড় ভূমিকা রাখে। উদাহরণস্বরূপ, বুধগ্রহের মাত্র শতকরা ২০ ভাগ উৎকেন্দ্রিকতার ফলে তার তাপমাত্রা সূর্যের নিকটবর্তী অবস্থানকালীন সময়ে (পেরিহেলিয়ন) সূর্য থেকে দূরবর্তী অবস্থান (এফেলিয়ন)-এর তুলনায় ২০০ ডিগ্রি বেশি থাকে। আসলে আমাদের পৃথিবীর উৎকেন্দ্রিকতার মান যদি ১ এর কাছাকাছি থাকতো, তাহলে আমরা যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে আসতাম, তখন সমুদ্রের পানি উবে যেত, আর দূরবর্তী অবস্থানে রাস্তায় বরফ জমে যেত। যার ফলে শীত ও গ্রীষ্মকালীন ছুটির কোনোটাই আনন্দদায়ক হতো না। বৃহৎ মাপের উৎকেন্দ্রিকতা জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য সহায়ক নয়; তাই আমরা ভাগ্যবান যে আমাদের গ্রহের কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতার মান প্রায় শূন্যের কাছাকাছি।

সূর্যের ভর এবং দূরত্বের কারণেও আমরা ভাগ্যবান। এর কারণ, তারকার ভর নির্ভর করে তারকাটি কী পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে তার উপর। সবচেয়ে বড় তারকাগুলোর ভর আমাদের সূর্যের ভরের চেয়ে শতগুণ বেশি, আর ছোট তারকাগুলোর ভর শতভাগ কম। তবুও সূর্য এবং পৃথিবীর দূরত্বের সাপেক্ষে যদি আমাদের সূর্য শতকরা ২০ ভাগ কম অথবা বেশি ভরবিশিষ্ট হত, তাহলে পৃথিবীর তাপমাত্রা আজকের মঙ্গলের চেয়ে কম কিংবা আজকের শুক্রগ্রহের চেয়ে বেশি হত।

প্রথাগতভাবে যে কোনো তারকার পাশে জীবন পোষণের উপযোগী স্থানটিকে বিজ্ঞানীরা বর্ণনা করেন এমন একটি সংকীর্ণ স্থান হিসেবে, যেখানকার

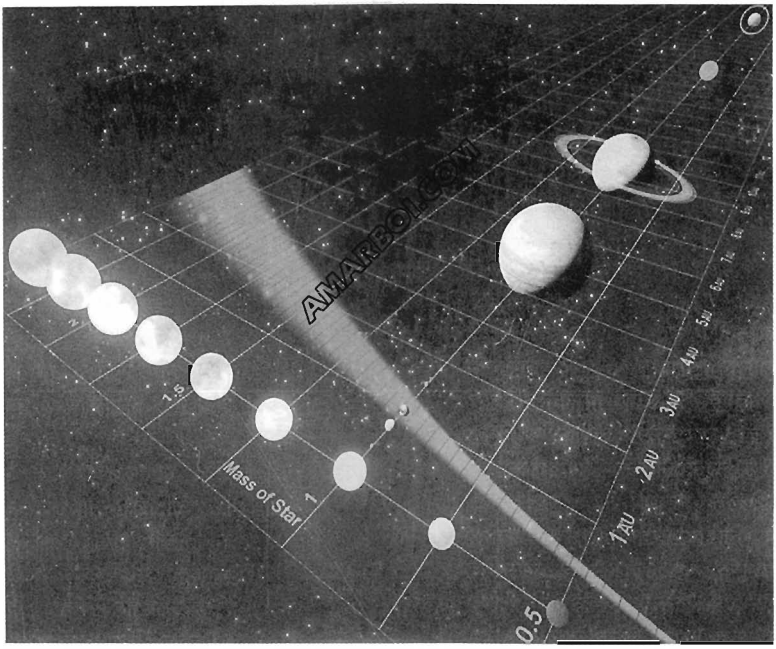

গোল্ডিলকস্ জোন : যদি গোল্ডিলকস্ গ্রহসমূহকে বিচারে আনে তাহলে জীবনের পোষণ সবুজ এলাকায় সম্ভবপর। হলুদ তারকাটি আমাদের সূর্য। সাদা তারকাগুলো বৃহৎ আকৃতির এবং উষ্ণ, লালগুলো ছোট এবং ঠাণ্ডা। সবুজ এলাকার তুলনায় সূর্যের কাছাকাছি গ্রহগুলো জীবন পোষণের জন্য উষ্ণতর এবং এর দূরের গ্রহগুলো অত্যন্ত ঠাণ্ডা। জীবন পোষণের জন্য এলাকাটি ঠাণ্ডা তারকাদের জন্য ক্ষুদ্রতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাপমাত্রা পানিকে তরল অবস্থায় ধরে রাখতে সক্ষম। জীবনের বাসযোগ্য স্থানটিকে প্রায়শ বলা হয় 'গোল্ডিলকস্ জোন', কারণ তরল পানির উপস্থিতির অর্থ বুদ্ধিমান প্রাণীর টিকে থাকার 'অনুকূল সঠিক' তাপমাত্রারও উপস্থিতি। আমাদের সৌরজগতে এই আবাসযোগ্য স্থানটি সংকীর্ণ, যা চিত্রে দেখানো হয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ, আমাদের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীদের আবাসস্থল এই পৃথিবী সে এলাকাটির মধ্যেই অবস্থিত।

নিউটন বিশ্বাস করতেন যে আমাদের এই আশ্চর্য আবাসযোগ্য সৌরজগৎ কেবল প্রকৃতির সূত্রাবলির নিয়মে গোলযোগের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। এর পরিবর্তে তিনি মনে করতেন মহাবিশ্বের নিয়মানুবর্তিতা "ঈশ্বর শুরুতে সৃষ্টি করেছেন এবং আজ পর্যন্ত তাকে একই নিয়মে, একই অবস্থায় রক্ষা করে চলেছেন"। কেন একজন এরকম চিন্তা করেছিলেন, তা বোঝা সহজ। অনেক অনেক অসম্ভব ঘটনাপ্রবাহের পরও আমাদের উদ্ভব, টিকে থাকা ও আমাদের পৃথিবীর এই জন-বান্ধব পরিবেশ অবশ্যই বিভ্রান্তিকর– যদি আমাদের এই সৌরজগৎ মহাবিশ্বের একমাত্র জগৎ হয়ে থাকে। কিন্তু ১৯৯২ সালে আমাদের সূর্যের বাইরে অন্য একটি তারকার পাশে একটি ভিন্ন গ্রহের পরিক্রমণ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি। আজ আমরা এরকম শত শত গ্রহের কথা জানি এবং আমাদের মহাবিশ্বের বিলিয়ন বিলিয়ন তারকার সাথে অসংখ্য গ্রহের উপস্থিতির বিষয়ে অল্প লোকই সন্দেহ পোষণ করেন। আমাদের গ্রহে অনুকূল শর্তসমূহের উপস্থিতি– একটি মাত্র সূর্য, সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের সাথে সৌরভরের সৌভাগ্যবান অনুপাত– মানবজাতিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যই পৃথিবীকে সযত্নে তৈরি করা হয়েছিল বলে কোনো প্রমাণ বহন করে না। সবধরনের গ্রহের উপস্থিতিই রয়েছে, যার মধ্যে কিছু কিছুতে– অথবা অন্তপক্ষে একটার মধ্যে জীবনের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। যদি কোনো গ্রহের প্রাণী তার নিজস্ব পৃথিবীর বিশেষ অবস্থাটি পরীক্ষা করে দেখে, তাহলে তারা এটাই দেখতে বাধ্য যে ঐ পৃথিবীটির পরিবেশ তাদের অস্তিত্বের জন্য সহায়ক হিসেবে সৃষ্ট।

শেষের এই বক্তব্যটিকে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় : আমাদের এই অস্তিত্ব এমন কিছু নিয়ম তৈরি করে, যা বলে দেয় কোথা থেকে এবং কোন সময়ে আমরা আমাদের মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। অর্থাৎ আমাদের অস্তিত্বের বাস্তবতাই কোন পরিবেশে আমরা আমাদেরকে দেখতে পাবো, তার ধর্মকে নির্দিষ্ট করে দেয়। এই সূত্রকেই বলা হয়ে থাকে দূর্বল এ্যানথ্রপিক সূত্র (আমরা একটু পরেই ব্যাখ্যা করব কেন আমরা 'দূর্বল' বিশেষণটি ব্যবহার করেছি)। এ্যানথ্রপিক নিয়মের ভালো প্রতিশব্দ হতে পারে 'নির্বাচনের নিয়ম,' কারণ এই নিয়ম বলে দেয় কীভাবে আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান সে নিয়মগুলোকে নির্বাচিত করে, যেগুলো বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ থেকে শুধুমাত্র আমাদের জীবন-অনুকূল পরিবেশকেই বেছে নেয়।

যদিও এটা শুনতে দর্শনের মতো লাগে, তবুও দূর্বল এ্যানথ্রপিক নিয়মকে বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে ব্যবহার করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, মহাবিশ্বের বয়স কত? আমরা শীঘ্রই দেখব, আমাদের অস্তিত্বের জন্য মহাবিশ্বে কার্বন মৌলের উপস্থিতি প্রয়োজন, যেগুলো তারকার অভ্যন্তরে হালকা মৌলসমূহের দহন-প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়েছে। এরপর এই কার্বন সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হয়ে একটি নবপ্রজন্মের তারকার পাশের গ্রহে স্থান নিয়েছে। ১৯৬১ সনে পদার্থবিদ রবার্ট ডাইক যুক্তি দিলেন যে এই পদ্ধতিতে প্রায় ১০ বিলিয়ন বছর লাগে, সুতরাং আমাদের বর্তমান অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে মহাবিশ্ব কমপক্ষে ততটুকু বয়সী। অন্যদিকে মহাবিশ্বের বয়স ১০ বিলিয়ন বছরের বেশি হতে পারে না, কেননা তাহলে আমাদের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় তারকার জ্বালানি দূর ভবিষ্যতে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন উত্তপ্ত তারকার উপস্থিতি। সুতরাং মহাবিশ্ব অবশ্যই ১০ বিলিয়ন বছর বয়সী। এটা অবশ্য নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না, বর্তমানে প্রাপ্ত সঠিক উপাত্ত অনুসারে মহাবিশ্বের সৃষ্টিলগ্ন, 'বিগব্যাংগ' ঘটেছিল ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে।

মহাবিশ্বের বয়সের পরিমাপের জন্য এানথ্রপিক নিয়ম কতগুলো ধ্রুবকের উপর নির্ভর করে বিন্যস্ত মানের সৃষ্টি করে। এটা সুনির্দিষ্টভাবে মানটি বের করতে পারে না। সম্ভবত এর কারণ আমাদের অস্তিত্ব; কিছু বিশেষ ধ্রুবক হয়তো নির্দিষ্ট মানের উপর নির্ভরশীল নয়, এটি প্রায়শ এমন ধ্রুবকগুলোর উপর নির্ভর করে বের করা হয়, যেগুলোর মানও সুনির্দিষ্ট নয়। আমরা আরো আশা করি যে, আমাদের পৃথিবীর ভেতরে প্রকৃত অবস্থাটি এ্যানথ্রোপিক স্বীকৃত বিন্যাসের মধ্যে পড়ুক। উদাহরণ স্বরূপ, যদি একটি কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতার মান ০ থেকে ০.৫ এর ভেতর হয়, তবে তা জীবন-উদ্ভবের উপযোগী হবে। সুতরাং, উৎকেন্দ্রিকতার মান ০.১ হলে আমাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ মহাবিশ্বের অনেক গ্রহের কক্ষপথেই এ ধরনের উৎকেন্দ্রিকতার মান রয়েছে। কিন্তু যদি এটা হয় যে, পৃথিবী প্রায় বৃত্তাকার পথে চলে, যার উৎকেন্দ্রিকতার মান ০.০০০ ০০০ ০০০ ০১, তাহলে পৃথিবী নামক এই গ্রহটি সত্যিই হবে এক বিশেষ চরিত্রের এবং এটাই আমাদের জানতে আগ্রহী করবে, আমরা কেন এরকম অস্বাভাবিক একটি গ্রহে এসে জন্ম নিয়েছি। এই ধরনের ধারণাকে প্রায়শ সাধারণত্বের তত্ত্ব (Principle of mediocrity) বলা হয়ে থাকে।

এই সৌভাগ্যবান গ্রহদের কক্ষপথের আকার, সূর্যের ভর ইত্যাদিকে পরিবেশ বলে ভাবা হয়; কারণ এর উদ্ভব হয়েছে আমাদের পারিপার্শ্বিকতার কারণে– প্রকৃতির মৌলিক সূত্রসমূহের কারণে নয়। মহাবিশ্বের এই বয়সও পরিবেশেরই একটি কারণ, যেহেতু মহাবিশ্বে সময়ের একটি পূর্বাপর ইতিহাস আছে। কিন্তু আমাদের তো এমন সময়েই থাকার কথা, যে সময়ে মহাবিশ্বে জীবন সৃষ্টি এবং পোষণ করা সম্ভবপর। পরিবেশের এই যোগসূত্রের কথা সহজেই বোঝা যায়, কারণ আমাদের এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাবিশ্বে আমরাই একমাত্র বাসিন্দা। আমাদেরকে এমন স্থানেই বাস করতে হবে, যেখানে জীবনকে পোষণ করা সম্ভব।

দূর্বল এ্যানথ্রপিক সূত্র খুব বেশি বিতর্কিত নয়। কিন্তু এর একটি শক্তিশালী রূপ রয়েছে, যা আমরা আলোচনা করব, যদিও কিছু পদার্থবিজ্ঞানী এই তত্ত্বকে তাচ্ছিল্য করে থাকেন। শক্তিশালী এ্যানথ্রপিক তত্ত্বমতে, আমাদের এই অস্তিত্ব কেবল পরিবেশের জন্য আড়ষ্টতা নয়, সম্ভবত তা প্রাকৃতিক সূত্রাবলির বিন্যাস এবং অন্তর্গত বিষয়ের জন্যও আড়ষ্টতা আরোপ করে। এটা কেবল এজন্যই নয় যে আমাদের জীবনের উদ্ভব এবং টিকে থাকা এই সৌরজগতের অদ্ভুত একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এটা আমাদের মহাবিশ্বেরও একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, যা ব্যাখ্যা করা কঠিন।

আমাদের মতো অন্ততপক্ষে একটি পৃথিবীতে বুদ্ধিমান জীবনের উদ্ভবসংক্রান্ত গল্প বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাথমিক মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও কিছুটা লিথিয়াম উদ্ভবের কারণ বর্ণনা করতে গেলে অনেকগুলি পরিচ্ছেদ লিখতে হবে। আমরা পূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, প্রাকৃতিক বলসমূহ এমন হতে হবে যাতে ভারী কণিকাসমূহ, বিশেষ করে কার্বনকে প্রাথমিক কণিকা থেকে সৃষ্ট হতে হবে এবং তা বিলিয়ন বিলিয়ন বছর স্থিতিশীল থাকতে হবে। এসব ভারী কণিকা তারকা-চুল্লির ভেতর সৃষ্টি হয়েছে, অতএব বলসমূহকে প্রথমে তারকা এবং গ্যালাক্সি সৃষ্টি করতে হয়েছে। এগুলো ক্ষুদ্র, অসমসত্ত্ব মিশ্রণের প্রাথমিক মহাবিশ্বের বীজ থেকে উৎপত্তি হয়েছে, যা ছিল প্রায় সুষম। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে এর ঘনত্বের তারতম্য ছিল ১ অংশে ১০০,০০০ এর মতো। যাহোক, তারকাদের উপস্থিতি এবং তারকাদের ভেতর যেসব মৌল থেকে আমরা সৃষ্ট, তার পরিমাণ পর্যাপ্ত ছিল না। তারকার গঠনপ্রণালী এমন হতে হবে, যে এটা কালক্রমে বিস্ফোরিত হবে; এমনভাবে তা হতে, যাতে ভারী মৌলসমূহ মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। উপরন্তু প্রকৃতির নিয়ম এটা বলে যে, এই ছড়িয়ে পড়া মৌলসমূহ নতুন প্রজন্মের তারকা সৃষ্টি করতে পারে, যে সমস্ত তারকারা নতুন ভারী মৌলের সমন্বয়ে তৈরি গ্রহ দিয়ে গঠিত। প্রাথমিক মহাবিশ্বে কয়েকটি ঘটনা ঘটার কারণেই আমাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের অস্তিত্বের জন্য একটির পর একটি ঘটনার যোগসূত্র প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু মহাবিশ্বের বিকাশের জন্য সংঘটনসমূহ প্রকৃতির মূল বলসমূহের নিয়ম মেনেই ঘটেছে এবং এই নিয়মগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়াই আমাদের অস্তিত্বের জন্য সহায়ক হয়েছে।

ফ্রেড হোয়েল হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ১৯৫০ সালে ভাবলেন যে এ ধরনের ধারণা ও ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। হোয়েল বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত রাসায়নিক মৌল হাইড্রোজেন থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি হাইড্রোজেনকে সত্যিকার প্রাথমিক মৌল বলে মনে করতেন। হাইড্রোজেন সরলতম পারমাণবিক নিউক্লিয়াস দিয়ে গঠিত, যা কেবল একটি প্রোটন কণিকা দিয়ে গঠিত– হয় একাকি, অথবা একটি বা দু'টি নিউট্রন কণিকা সহযোগে। (হাইড্রোজেনের বিভিন্ন রূপ, অথবা কোনো নিউক্লিয়াসে যখন সমান সংখ্যক প্রোটন কণিকা থাকলেও বিভিন্ন সংখ্যার নিউট্রন থাকে, তখন তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইসোটোপ বলে)। আজ আমরা জানি যে হিলিয়াম ও লিথিয়ামের পারমাণবিক গঠন এরকম যে এর নিউক্লিয়াসে দু'টি অথবা তিনটি প্রোটন আছে, এগুলিও মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থায় সামান্য পরিমাণে হলেও সংশ্লেষিত হয়েছে– যখন মহাবিশ্বের বয়স ছিল মাত্র ২০০ সেকেন্ড। অন্যদিকে, জীবন আরো জটিল মৌল থেকে সৃষ্ট; এর ভেতর কার্বন হলো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌল, যা সমগ্র জৈবরসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি।

যদিও একজন কল্পনা করতে পারেন যে, বুদ্ধিমান কম্পিউটারের মতো 'জীবন্ত' জিনিস সিলিকন নামক ভিন্ন মৌলের সৃষ্টি, অতএব জীবন কার্বন ছাড়াই হয়তো স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আসলে এ যুক্তিটি প্রযুক্তিসম্মত, আর কার্বনের বিশেষ গুণ হল যে তা অসাধারণভাবে অন্য মৌলের সাথে বন্ড তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কার্বন ডাই-অক্সাইড, যা ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বায়বীয় রূপে থাকে এবং জীববিজ্ঞানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সিলিকন যেহেতু পিরিয়ডিক তালিকায় কার্বনের নিচেই অবস্থান করে, তাই এর রাসায়নিক ধর্ম অনেকটা কার্বনের মতোই। যাহোক, সিলিকন ডাই-অক্সাইড কোয়ার্টজ পাথরের ভেতর প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, যা প্রাণীর ফুসফুসের মধ্যে নেই। তবুও সিলিকন দিয়ে কোনো জীবনের উদ্ভব হতে পারে, হয়তো সে প্রাণীর লেজটা তরল এ্যামোনিয়ার ভেতর নড়াচড়া করছে। তারপরও এরকম উদ্ভট জীবন প্রাথমিক মৌল থেকে উদ্ভব হতে পারে না, কারণ ঐ সমস্ত মৌল দুটি স্থিতিশীল যৌগ তৈরি করতে পারে– যার একটি হল লিথিয়াম হাইড্রাইড নামের একটি রঙহীন, দানাদার কঠিন বস্তু; এবং অন্যটি হল হাইড্রোজেন গ্যাস। এরকম দুটি মিলে অন্য কোনো কিছুর সৃষ্টি তো করতেই পারে না– এমনকি একটি অন্যটির প্রেমেও পড়তে পারে না। আরো বলা যায়, এটা প্রমাণিত যে আমাদের জীবন কার্বন দ্বারা গঠিত এবং এ প্রসঙ্গে একই সাথে এ প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে কীভাবে ছয়টি প্রোটনবিশিষ্ট নিউক্লিয়াস দিয়ে গঠিত কার্বন এবং আমাদের শরীর যে সমস্ত ভারী মৌল দিয়ে গঠিত, তাদের সৃষ্টি হয়েছে?

প্রথম ধাপ ঘটেছে যখন প্রাচীন তারকাগুলো হিলিয়াম জড়ো করা শুরু করেছে– সেটা তৈরি হয়েছে, যখন দুটো হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং একত্রিত হয়েছে। এই ফিউশন প্রক্রিয়ায় তারকার অভ্যন্তরে শক্তির উদ্ভব ঘটে, যা আমাদের উত্তাপ প্রদান করে। দুটি হিলিয়ামের পরমাণু সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে বেরিলিয়াম সৃষ্টি করে, যার পরমাণুর ভেতর চারটি প্রোটন রয়েছে। একবার যখন বেরিলিয়াম সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন এটি তৃতীয় একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বন সৃষ্টি করার কথা। কিন্তু এরকমটা ঘটে না, কারণ বেরিলিয়ামের যে আইসোটোপ সৃষ্টি হয়, সেটা সাথে সাথেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং আবার তা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।

AMARBOI.COM

পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন হয়, যখন কোনো তারকার ভেতর হাইড্রোজেন ফুরিয়ে যেতে থাকে। যখন এরকম অবস্থা ঘটে, তখন তারকাটির কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা ১০০ মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিনে পৌঁছে। এই অবস্থায় নিউক্লিয়াসগুলো প্রায়ই একটি অপরটির সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং কিছু বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াস একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, সেগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার আগেই। বেরিলিয়াম তখন হিলিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে স্থিতিশীল কার্বনের আইসোটোপ জন্ম দেয়। কিন্তু এ ধরনের কার্বন এখনও রাসায়নিক যৌগ গঠন করা থেকে অনেক দূরে– যা একগ্লাস বর্দো পানীয় উপভোগ করতে পারে, অথবা মহাবিশ্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে। আমাদের মতো মানুষ উদ্ভবের জন্য কার্বনকে তারকার অভ্যন্তর থেকে বের হয়ে আরো সহায়ক পরিবেশ-প্রতিবেশের সান্নিধ্যে আসতে হবে। যেমনটা আমরা বলেছি, একটি তারকা তার জীবনকালের শেষে সুপারনোভা হিসেবে বিস্ফোরিত হয়; কার্বন এবং অন্যান্য ভারী মৌল পরিত্যাগ করে, যেগুলো পরবর্তীকালে ঘনীভূত হয়ে গ্রহজগতের সৃষ্টি করে।

এই ধরনের কার্বন তৈরির পদ্ধতিকে 'ট্রিপল আলফা' পদ্ধতি বলা হয়, কারণ

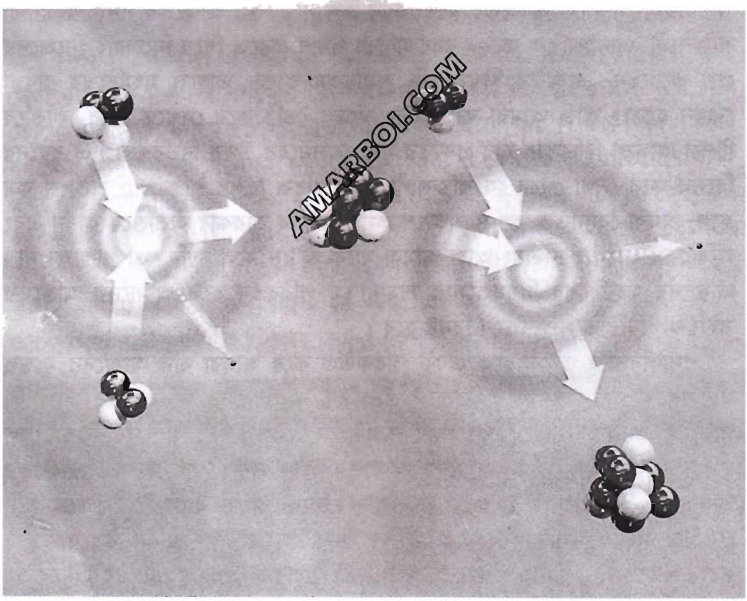
AMARBOI.COM

ট্রিপল আলফা পদ্ধতি : তিনটি হিলিয়ান নিউক্লিয়াসের সংঘর্ষে তারকার অভ্যন্তরে কার্বন সৃষ্টি হয়। এটা এমন একটি অস্বাভাবিক ঘটনা, যা কেবল মাত্র নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানের বিশেষ সূত্রের কারণে ঘটে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের আইসোটোপের আরেক নাম 'আলফা কণিকা'। এই পদ্ধতিতে তিনটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সংঘর্ষ এবং যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। পদার্থ বিজ্ঞানের মতে, সাধারণত ট্রিপল আলফা পদ্ধতিতে যে হারে কার্বনের সৃষ্টি হয়, তার পরিমাণ খুবই কম। এটি বিবেচনায় এনে ফ্রেড হোয়েল ১৯৫২ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এবং বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াসের মধ্যে সংঘর্ষে সৃষ্ট শক্তির যোগফলের পরিমাণ সৃষ্ট কার্বন আইসোটোপের কোয়ান্টাম অবস্থার শক্তির পরিমানের হুবহু সমান। এই অবস্থাকে বলা হয় অনুরণন (Resonance), এবং এর ফলে পারমাণবিক বিক্রিয়ার হার ত্বরান্বিত হয়। ঐ সময়ে এ ধরনের কোনো শক্তির মাত্রা সম্পর্কে জানা ছিল না, কিন্তু হোয়েলের ধারণার উপর নির্ভর করে ক্যালটেকের উইলিয়াম ফাউলার এটা নিয়ে কাজ করেন এবং হোয়েলের জটিল যৌগ নিউক্লিয়াসের গঠন-প্রক্রিয়াকে সঠিক প্রমাণ করেন।

হোয়েল লিখেছিলেন, "তারকার অভ্যন্তরে যা সৃষ্টি হয়, কোনো বিজ্ঞানী যদি এই ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করেন, তবে দেখতে অসমর্থ হবেন যে নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম সচেতনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।" ঐ সময়ে কারোরই পরমাণু পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে আজকের মতো জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আজকের পদার্থবিজ্ঞানীরা শক্তিশালী এ্যানথ্রোপিক তত্ত্বের কার্যকারিতা প্রমাণ করতে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের প্রশ্ন করেছেন– প্রকৃতির নিয়ম যদি অন্যরকম হতো, তাহলে মহাবিশ্বের অবস্থা কেমন হতো? আজ আমরা কম্পিউটার মডেল তৈরি করে দেখতে পারি, কীভাবে ট্রিপল আলফা বিক্রিয়ার হার প্রকৃতির মৌল বলসমূহের উপর নির্ভরশীল। এ ধরনের হিসেব করে দেখা গেছে যে শক্তিগুলো পারমাণবিক বলের শক্তি ০.৫ শতাংশ কম হলে, অথবা বৈদ্যুতিক বল ৪ শতাংশ কম হলে সব তারকার অভ্যন্তরে কার্বন এবং অক্সিজেন ধ্বংস হত এবং আজ আমরা যাকে জীবন বলে জানি, তা থাকতো না। আমাদের মহাবিশ্বের নিয়মগুলোর সামান্যতম পরিবর্তন হলে আমাদের অস্তিত্বের সহায়ক পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হবে।

পদার্থবিদ্যার তত্ত্বসমূহকে একটু পরিবর্তিত করে আমরা যদি আমাদের মডেল মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মাবলির পরিবর্তনের ফলে কী ঘটে, তা দেখতে পাই। এটা প্রমাণিত হয় যে, কেবল শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বল এবং তড়িৎ চুম্বকীয় বলই আমাদের অস্তিত্বের কারণ নয়। আমাদের তত্ত্বের বেশির ভাগ মূল ধ্রুবকগুলোই সেরকম ক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে পাল্টে যাবে, সে ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রকৃতির মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা জীবন উদ্ভবের জন্য সহায়ক হবে না। উদাহরণ স্বরূপ, দূর্বল নিউক্লিয়ার বল যদি আর একটু দূর্বলতর হতো, তাহলে প্রাথমিক মহাবিশ্বের সমস্ত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতো। সেক্ষেত্রে কোনো স্বাভাবিক তারকা থাকতো না। আর যদি নিউক্লিয়ার বলটি শক্তিশালী হত, বিস্ফোরিত সুপারনোভাগুলি তাদের বহির্ভাগের ভারী মৌলগুলি মহাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হতো, যা জীবন উদ্ভবের জন্য প্রয়োজন। প্রোটন যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

০.২% ভারী হতো, তবে তা নিউট্রনে পরিণত হয়ে পরমাণুকে অস্থিতিশীল করে তুলত। কোয়ার্কের ভরসমূহের যোগফল, যা দিয়ে প্রোটন কণিকার সৃষ্টি, যদি শতকরা ১০ ভাগ পরিবর্তিত হত, তাহলে খুবই কম স্থিতিশীল পারমাণবিক নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হত– যা দিয়ে আমরা সৃষ্ট। আসলে বেশি সংখ্যক স্থিতিশীল নিউক্লিয়াস তৈরির জন্য কোয়ার্কের যোগফল যথেষ্ট মাত্রায় সঠিক মানের হতে হবে।

যদি কেউ এটা ধরে নেন যে গ্রহের ভেতর জীবন উদ্ভবের জন্য কয়েকশো মিলিয়ন বছর স্থিতিশীল কক্ষপথের প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে স্থানিক মাত্রার নির্দিষ্ট সংখ্যাটিও আমাদের অস্তিত্বের মাধ্যমেই নির্ধারিত। এর কারণ, মহাকর্ষ বলের সূত্রানুযায়ী কেবল ত্রিমাত্রিক পরিসরেই স্থিতিশীল উপবৃত্তাকার কক্ষপথ সম্ভব। অন্যান্য মাত্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথ সম্ভব, কিন্তু নিউটন যেমনটা আশঙ্কা করেছেন, সেগুলো অস্থিতিশীল। ত্রিমাত্রিকতা ছাড়া অন্য মাত্রায় সামান্য গোলযোগ হলে, যা অন্য গ্রহের আকর্ষণের ফলে ঘটতে পারে; সেক্ষেত্রে বৃত্তাকার কক্ষপথ থেকে গ্রহটিকে ছিটকে ফেলে সূর্যের ভেতরে অথবা দূরে ঠেলে দেবে। সেক্ষেত্রে আমরা পুড়ে ছাই কিংবা জমে বরফ হয়ে যাব। এছাড়া তিনটি মাত্রার চেয়ে বেশি হলে দুটি বস্তুর ভেতর মহাকর্ষ বলের পরিমাণ ত্রিমাত্রিকতার তুলনায় দ্রুত হারে কমে যাবে। দুটি বস্তুর দূরত্বকে দ্বিগুণ করলে ত্রিমাত্রিকতায় মহাকর্ষ বল এক চতুর্থাংশ কমে যায়। এই হার চার মাত্রিকতায় হবে ১/৮, পাঁচ মাত্রিকতায় ১/১৬ ভাগ এবং তা একই হারে হ্রাস পেতে থাকবে। ফলে তিনের বেশি মাত্রায় সূর্য স্থিতিশীল থাকতে পারে না, কারণ তার আভ্যন্তরীণ চাপ মহাকর্ষ বলের কারণে পরিবর্তিত হবে। হয় এটা ভেঙ্গে পড়বে, অথবা কালোবিবরে (Black hole) পরিণত হবে। এর যে কোনো অবস্থাই আমাদের বারোটা বাজাতে পারে। পারমাণবিক পর্যায়ে বৈদ্যুতিক বল মহাকর্ষ বলের মতোই আচরণ করে। এর অর্থ, পরমাণুর ইলেক্ট্রনগুলি হয় কেন্দ্র থেকে বের হয়ে যাবে, অথবা তার কেন্দ্রে পতিত হবে। আমরা যে পরমাণুর সাথে পরিচিত, তা এগুলোর কোনোটিই নয়।

বুদ্ধিমান দর্শক সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় জটিল মৌল উদ্ভবের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর বলে মনে হয়। প্রকৃতির সূত্রসমূহ একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতির মাধ্যমে অত্যন্ত সূচারুভাবে সৃষ্ট। জীবনের যে রূপকে আমরা জানি, তা বিনষ্ট না করে বাস্তব সূত্রসমূহের পরিবর্তন খুবই দুঃসাধ্য। এটি একটি অস্বাভাবিক সমাপতন, ভৌত সূত্রসমূহের আভ্যন্তরীণ অস্বাভাবিক সন্নিপাত ও গভীর সুসামঞ্জস্য ছাড়া মানুষ এবং সমধর্মী জীবন অস্তিত্বশীল হতে পারতো বলে মনে হয় না।

সবচেয়ে গভীর সমন্বিত সন্নিপাত আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সূত্রের মহাজাগতিক ধ্রুবকের (cosmological constant) ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি, ১৯১৫ সালে যখন তিনি এই সূত্রের উদ্ভাবন করেন, আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন যে মহাবিশ্ব স্থির– সম্প্রসারণশীল কিংবা সংকোচনশীল নয়। যেহেতু সব বস্তু একে অপর বস্তুকে আকর্ষণ করে, তাই

এক্ষেত্রে তিনি মহাকর্ষবলের বিপরীত ধর্মী একটি বলের অবতারণা করেছিলেন, যাতে মহাবিশ্ব নিজেই নিজের মধ্যে ভেঙ্গে না পড়ে। এই বল অন্যান্য বলের মতো কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত নয়, এটা স্থান-কাল কাঠামোর ভেতর থেকেই এসেছে। মহাজাগতিক ধ্রুবক সেই বলের শক্তিকেই ব্যাখ্যা করেছে।

যখন এটা আবিষ্কৃত হলো যে মহাবিশ্ব স্থির নয়, আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্ব থেকে মহাজাগতিক ধ্রুবককে পরিহার করলেন এবং একে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হিসেবে আখ্যা দিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালে দূরবর্তী সুপারনোভা পর্যবেক্ষণে প্রমাণ পাওয়া গেল যে মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটছে দ্রুততর হারে, যা মহাবিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান কোনো বিকর্ষক বলের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। আর তাই মহাজাগতিক ধ্রুবককে আবার গণনায় নিয়ে আসা হল। যেহেতু আমরা জানি যে এই ধ্রুবকের মান শূন্য নয়, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে, ধ্রুবকটির মান ঠিক এরকমই কেন? পদার্থবিদেরা যুক্তি দেখালেন, এই মান কোয়ান্টাম যান্ত্রিক প্রভাবে সৃষ্ট। কিন্তু তারা যে মান নির্ধারণ করলেন, তা ১২০ মাত্রার সমান (এক এর পর ১২০টি শূন্য); যা সুপারনোভা বিস্ফোরণ থেকে প্রাপ্ত আসল মানটির চেয়ে শক্তিশালী। এর অর্থ, গাণিতিক সমাধানের জন্য যে সমস্ত যুক্তি গ্রহণ করা হয়েছিল, হয় সেগুলোতে ভুল ছিল; অথবা অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান, যা সেই ধারণাতীত সূক্ষ্ম সংখ্যাটি ছাড়া অন্যগুলোকে বাতিল করে। একটি বিষয় নিশ্চিত যে, মহাজাগতিক ধ্রুবকের মান যদি এই প্রাপ্ত মানের চেয়ে বেশি হতো; তাহলে আমাদের মহাবিশ্ব ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে দূরে ছিটকে পড়তো। গ্যালাক্সি সৃষ্টি অসম্ভব হয়ে পড়তো এবং জীবনের সৃষ্টি আরো অসম্ভব হয়ে পড়তো।

এরকম একটি যোগসূত্রের ভেতর থেকে আমরা কী বুঝতে পারি? সূচারু শৃঙ্খলা এবং এর সাথে মৌলিক ভৌত সূত্রসমূহের প্রকৃতি সৌভাগ্যজনকভাবে মিলে যাওয়া পরিবেশগত সৌভাগ্যের চেয়ে একটি ভিন্ন ধরনের সৌভাগ্য। এ বিষয়টিকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যাবে না, যার ভেতরে গভীর দার্শনিক ও ভৌত রহস্য মিশে আছে। আমাদের মহাবিশ্ব ও এর সূত্রসমূহকে নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যাতে করে জীবনের উদ্ভব হতে পারে এবং তা অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। যদি আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়, তবে এগুলোতে পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যাবে না, এরকমটা কেন হল?

এরকম একটা যোগসূত্রে অনেকেই ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ খুঁজে পান। মহাবিশ্ব মানুষের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে– ধর্মশাস্ত্র ও পুরাকাহিনিগুলো এরকম ধারণা প্রদান করে। আমাদের হাজার বছরের পুরনো গল্পগাথায় এরকম কাহিনিরই উল্লেখ রয়েছে। মায়া সভ্যতার পৌরাণিক কাহিনিতে ঈশ্বরগণ ঘোষণা করেছেন– "আমরা যা সৃষ্টি করেছি, তার জন্য কোনো সম্মান বা গৌরব পাবনা, যদি মানব সম্প্রদায় সচেতন গুণসম্পন্ন হয়ে বেঁচে থাকতে না পারে।" খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালের মিশরের একটি লিপিতে আছে, "ঈশ্বর গবাদিপশু ও মানবকূলকে পর্যাপ্ততা দিয়েছেন। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(সূর্য দেবতা) এই আকাশ এবং পৃথিবীকে তাদের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" চীনের তাওবাদী দার্শনিক লিয়ে ইউ কো (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ সাল) একটি গল্পের চরিত্রের মুখে বলেছেন "স্বর্গে পাঁচ রকমের শস্যকণা উৎপাদিত হয়, পাখনাযুক্ত ও পালকযুক্ত প্রজাতিসমূহকে আমাদের সুবিধার জন্যই পাঠানো হয়েছে।"

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মে সৃষ্টি সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ধ্রুপদী সেই খ্রিস্টান দৃষ্টিভঙ্গি এরিস্টোটলের মতবাদ দিয়ে বহুল প্রভাবিত। এরিস্টোটল বিশ্বাস করতেন "একটি বিধাতাপ্রদত্ত নকশাই প্রজ্ঞাবান ও নিয়মতান্ত্রিক বিশ্বপ্রকৃতি থাকার কারণ।" মধ্যযুগের খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিক টমাস একুইনাস এরিস্টোটলের সাথে একমত হয়ে প্রকৃতির নিয়মাবলীকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ বলে দাবি করেছেন। অষ্টাদশ শতকের একজন খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিক আরো একধাপ এগিয়ে বললেন যে খরগোসের লেজের রঙ একারণে সাদা, যেন আমরা সহজেই তা লক্ষ্য করে গুলি করতে পারি। কয়েক বছর আগে আরো আধুনিক ব্যাখ্যার নামে ভিয়েনার আর্চ বিশপ কার্ডিনাল খ্রিস্টাফ শোনবর্ণ লিখেছেন, "এখন একবিংশ শতকের শুরুতে নবডারউইনবাদ এবং বহু মহাবিশ্বের ধারণায় সজ্জিত হয়ে আধুনিক বিজ্ঞান মহাবিশ্বের উদ্দেশ্য এবং নকশার প্রসঙ্গটি পরিহার করতে চাইছে; তাই ক্যাথলিক চার্চ মানব প্রকৃতিকে আবার এই বলে সুরক্ষা প্রদান করবে যে প্রকৃতির এই অন্তর্নিহিত নকশা একটি বাস্তবতা।" এখানে কার্ডিনাল মহাকাশ বিজ্ঞানের যে সমস্ত নকশা ও উদ্দেশ্যের কথা বুঝাতে চেয়েছেন, সে সমস্ত ভৌত সূত্রগুলোর নিখুঁত ও সূচারু নিয়মের কথাই আমরা উপরে বর্ণনা করেছি।

কোপার্ণিকাস কর্তৃক সৌরজগতের মানবকেন্দ্রিক মডেলের প্রত্যাখ্যান বিজ্ঞানের জগতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ও পরিবর্তন সূচনা করেছে, যাতে পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু নয়। মজার বিষয় যে কোপার্নিকাসের নিজস্ব বিশ্বভাবনা মানবত্ব আরোপকারী (anthropomorphic) ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। এটা এতটাই দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি মনে করতেন, সূর্যকেন্দ্রিক মডেল সত্ত্বেও পৃথিবী মোটামুটিভাবে মহাবিশ্বের প্রায় কেন্দ্রদেশে অবস্থিত। "যদিও পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত নয়, তবুও স্থির তারকাদের প্রেক্ষিতে বিচার করলে এই দূরত্ব [কেন্দ্র থেকে] তেমন কিছুই নয়।" দূরবীন আবিষ্কারের সাথে সপ্তদশ শতকের পর্যবেক্ষণে জানা গেল, আমাদের গ্রহটিই চাঁদ দিয়ে পরিক্রমণরত একমাত্র গ্রহ নয়। এরকম আরো অনেক গ্রহ আছে– এই ফলাফল আমাদের এতদিনের লালিত বিশেষ অবস্থানের ধারণাকে ক্ষুণ্ন করেছে। এর পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে আমরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে যতবেশি জানতে পেরেছি, ততই বুঝতে পেরেছি যে আমাদের পৃথিবী অনেকগুলোর মধ্যে বড়জোর একটি বাগানসজ্জিত গ্রহমাত্র। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে প্রকৃতির সূত্রগুলোর সূচারু উপস্থাপনার ধারণা আমাদের কাউকে কাউকে পুরনো ধারণায় ফিরে যেতে প্রলুব্ধ করেছে। অর্থাৎ মনে করা হচ্ছে এই মহাবিশ্ব একজন মহান নকশাকারীর তৈরি নকশায় নির্মিত। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে যেহেতু স্কুলপর্যায়ে ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ, তাই এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ধরনের ধারণাকে বলা হয় বুদ্ধিমান নকশা (intelligent design), যেখানে সরাসরি উল্লেখ না করেও বুঝানো হয় যে এই নকশাকারী হচ্ছেন ঈশ্বর।

আধুনিক বিজ্ঞানের উত্তরটি এরকম নয়। আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে দেখেছি যে আমাদের মহাবিশ্ব সম্ভবত বহু মহাবিশ্বের মধ্যে একটি, যেখানে প্রতিটি মহাবিশ্বের ভিন্ন সূত্রাবলি রয়েছে। বহু মহাবিশ্বের ধারণা নিছক কোনো সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সূত্র আবিষ্কারের জন্য সৃষ্ট হয়নি। এটা সীমানাহীন অবস্থার ফল এবং আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানের অন্যান্য তত্ত্বের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু যদি তা সত্য হয়ে থাকে, তবে শক্তিশালী এ্যানথ্রপিক সূত্রকে দূর্বল এ্যানথ্রপিক সূত্রের মতোই মনে করা যায়। এ ক্ষেত্রে বাস্তব সূত্রের সামঞ্জস্য বিধানকে পরিবেশগত উপাদানের সাথে মেলানো সম্ভব। এর অর্থ হল, বৈশ্বিক পরিসরে আমাদের এই আবাসস্থল সমগ্র দৃশ্যমান সম্ভাব্য মহাবিশ্বের অনেকগুলোর মধ্যে একটি, যেমনটি অনেকগুলি সৌরজগতের মধ্যে আমাদেরটি একটি। এর অর্থ এই যে, একইভাবে আমাদের সৌরজগতের পরিবেশের এই যোগসূত্র মহাবিশ্বে অবস্থিত বিলিয়ন বিলিয়ন সৌরজগতের মধ্যে অস্বাভাবিক কোনো কিছু নয়। যদি প্রকৃতির নিয়মকে সুসংবদ্ধ করা যায়, তবে বহু মহাবিশ্বের ধারণাকে ব্যাখ্যা করা যাবে। বহুবছর ধরে অনেকেই প্রকৃতির জটিলতা ও সৌন্দর্যের জন্য ঈশ্বরের স্তুতি করেছেন, যার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সে সময়ে ছিল না। কিন্তু ডারউইন এবং ওয়ালেস যেমনটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, কী রকম আশ্চর্য নকশাসমৃদ্ধ জীবন কোনো সৃষ্টিকর্তার হস্তক্ষেপ ছাড়াই উদ্ভব হতে পারে! সেরকমভাবে বহু মহাবিশ্বের ধারণাকেও শুধুমাত্র ভৌত সূত্রসমূহকে সুসংহত করেই কোনো দয়াময় ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রমাণ করা সম্ভব।

আইনষ্টাইন একবার তাঁর সহকর্মী আর্নষ্ট ষ্ট্রসকে প্রশ্ন করেছিলেন, "মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কী কোনো পছন্দ- অপছন্দ ছিল?" ষষ্ঠদশ শতকের শেষে কেপলার বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর সঠিক গাণিতিক নিয়মানুসারেই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। নিউটন দেখালেন যে পৃথিবী এবং স্বর্গে একই নিয়ম কার্যকর এবং তিনি এ সমস্ত সূত্রের এমন গাণিতিক সমীকরণ প্রকাশ করলেন যে অষ্টাদশ শতকের বিজ্ঞানীরা ধর্মে অতি উৎসাহী হয়ে দেখাতে চাইলেন, ঈশ্বর একজন গণিতজ্ঞ।

নিউটন-পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে আইনস্টাইনের পরে পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ছিল একটি সরল গাণিতিক নিয়ম বের করা, কেপলার যেমনটির স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যার সাহায্যে সার্বিক একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব (Unified Field Theory of Evrything) দৃশ্যমান সব পদার্থ ও বলসমূহের সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। উনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের শুরুতে ম্যাক্সওয়েল ও আইনস্টাইন বিদ্যুৎ, চুম্বক এবং আলোক তত্ত্বকে একীভূত করেন। বিগত শতকের সত্তরের দশকে আদর্শ মডেল (Standard model) উদ্ভাবিত হল, যা দূর্বল ও শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বলসমূহ এবং তড়িৎ চুম্বকীয় বলের একত্রীকরণ সম্পন্ন করে। তারপর আসে ষ্ট্রিং তত্ত্ব এবং M-তত্ত্ব, যার উদ্দেশ্য বাদবাকী বল, অর্থাৎ মহাকর্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলকে একীভূত করা। এর লক্ষ্য ছিল, কেবল সবগুলো বলের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম– এমন একটি বলের উদ্ভাবন মাত্র নয়; অধিকন্তু তা বলের শক্তি, মৌলিক কণিকার ভর ও চার্জ– ইত্যাদি মৌলিক সংখ্যার ব্যাখ্যা প্রদান করা, যা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আইনস্টাইন যেমনটি বলেছেন, "প্রকৃতি এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে শক্তিশালী নির্ধারক তত্ত্বের উদ্ভাবন সম্ভব, যার ভেতর যুক্তিগ্রাহ্য, নির্ধারিত ধ্রুবকগুলো সুসংহতভাবে বিদ্যমান থাকবে। (এরকম কোনো ধ্রুবক নয়, যার সংখ্যাগত মানের পরিবর্তন হলে তত্ত্বগুলো অর্থহীন হয়ে পড়বে)"। একটি অদ্বিতীয় তত্ত্ব এরকম হবে না যে, আমাদের অস্তিত্ব ব্যাখ্যাকল্পে একে সুসংবদ্ধ করার প্রয়োজন হবে। কিন্তু বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অগ্রগতির ফলে আমরা আইনস্টাইনের স্বপ্নকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে, একটি আদর্শ তত্ত্ব এই মহাবিশ্ব এবং অন্যান্য মহাবিশ্বগুলোকে বিভিন্ন সূত্রাবলির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। সেক্ষেত্রে M-তত্ত্ব সেরকম একটি তত্ত্ব হতে পারে। কিন্তু M-তত্ত্ব কী একটি আদর্শ, অদ্বিতীয় তত্ত্ব? নাকি এটা সহজ, যৌক্তিক নিয়মের একটি চাহিদা মাত্র? কেন এই M-তত্ত্ব? আমরা কী সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

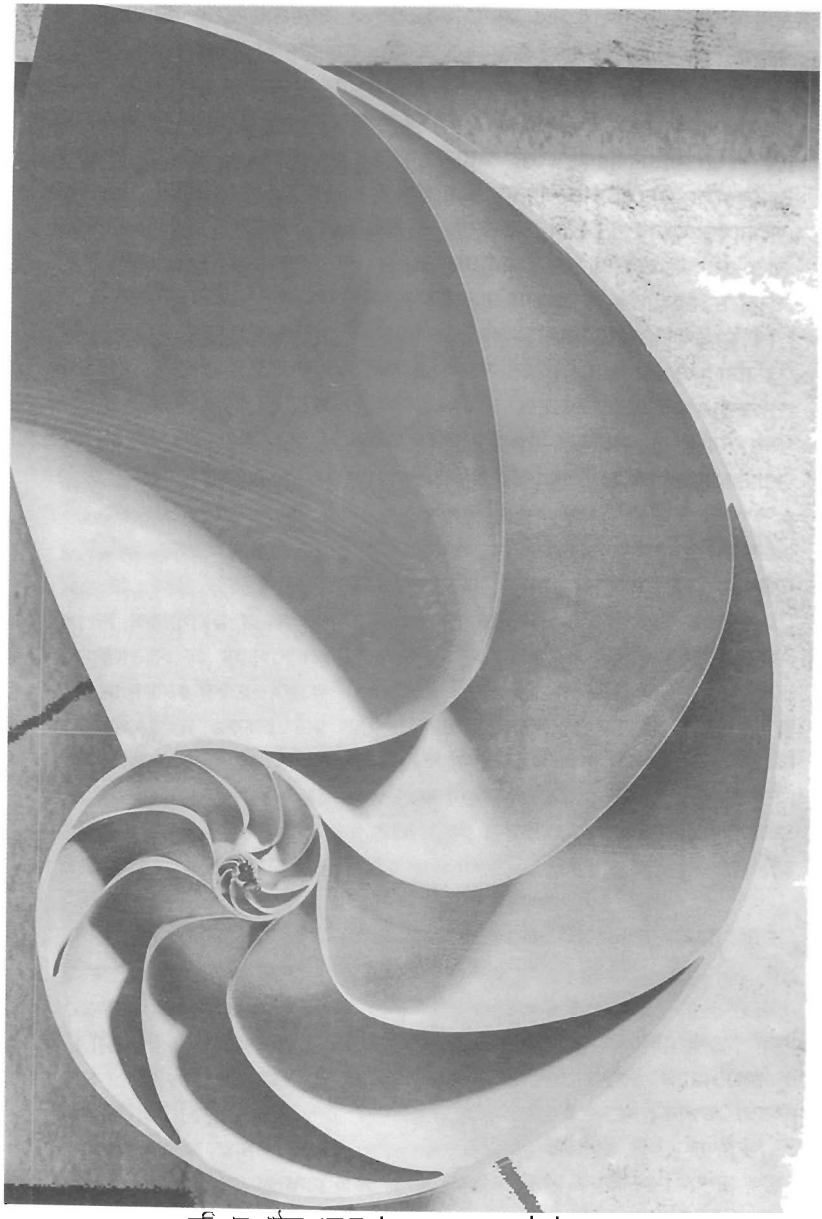

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন

এই বইয়ে আমরা সূর্য, চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহের, অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বস্তুসমূহের নিয়ম-কানুন বর্ণনা করেছি; যাতে দেখেছি যে এগুলি নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী তত্ত্ব মেনে চলেছে– কোনো দেবতা বা অপদেবতার অদ্ভুত খেয়াল বা খামখেয়ালীর দ্বারা এগুলো চালিত হচ্ছে না। প্রথমদিকে এই সূত্রগুলি কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাছে প্রকাশিত হয় (অথবা জ্যোতিষশাস্ত্র বলা যেতে পারে, প্রাচীন কালে উভয় শাস্ত্র একই রকম ছিল)। পৃথিবীতে বস্তুসমূহের চরিত্র এতই জটিল এবং এত বেশি বিষয়ের প্রভাবাধীন যে আমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষে এই জ্ঞানের ব্যাখ্যায় পরিষ্কার কোনো রূপরেখা বা তত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। ধীরে ধীরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আওতার বাইরে নতুন নতুন তত্ত্বের আবিষ্কার হয়েছে এবং এ সবই বৈজ্ঞানিক নিমিত্তবাদ (Scientific determinism) ধারণার উদ্ভব ঘটায় : অবশ্যই একগুচ্ছ পূর্ণাঙ্গ সূত্র আছে, মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট সময়কালকে হিসেবে নিয়ে যার মাধ্যমে ভবিষ্যতের মহাবিশ্বের সম্পর্কে আগাম কথা বলা যায়। এই সূত্রগুলো সর্বত্র, সব সময়েই একই রকমের হতে হবে, এটা না হলে এগুলোকে সূত্র বলা যাবে না। দৈব বা কোনো কিছুর কারণে এর কোনো ব্যাতিক্রম ঘটতে পারবে না। এই মহাবিশ্বের চলমানতায় ঈশ্বর বা অপদেবতার পক্ষে এর ভেতর কোনো হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই।

প্রথমে বৈজ্ঞানিক নিমিত্তবাদের যখন প্রস্তাবনা করা হয় তখন কেবল আমরা নিউটনের গতি সূত্র এবং মহাকর্ষ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম। আমরা দেখিয়েছি কীভাবে এই সব সূত্র বিস্তৃত হয়ে আইনস্টাইনের মহাকর্ষের সাধারণ তত্ত্বের অবতারণা করল এবং অন্যান্য সূত্রসমূহ মহাবিশ্বের বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণে আবিষ্কৃত হল।

প্রকৃতির এই তত্ত্বসমূহ আমাদেরকে মহাবিশ্বের আচরণ ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু এই আচরণের কেন উদ্ভব হল? যেমনটি আমরা এই বইয়ের শুরুতেই উল্লেখ করেছি:

স্টিফেন হকিং ও লিওনার্দ ম্লডিনাও # ১৩৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন কিছুই না থাকার বদলে কেন একটা কিছু বর্তমান?
আমরা কেন এখানে?
কেন নির্দিষ্ট কিছু তত্ত্বের বন্ধন? অন্যরূপ কিছু নয় কেন?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে কেউ কেউ দাবী করতে পারেন যে ঈশ্বর বর্তমান এবং তিনিই মহাবিশ্ব এমন করে সৃষ্টি করেছেন। এটা জিজ্ঞাসা করা যৌক্তিক যে কে এবং কী কী দিয়ে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে? কিন্তু এর উত্তর যদি ঈশ্বর হন তাহলে এর পরবর্তী প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছেন। এই ধারণামতে এটা গ্রহণযোগ্য যে কোনো একটা অবস্থা বিদ্যমান যে অবস্থার জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নেই– আর সে অবস্থাকে ঈশ্বর বলা যেতে পারে। এটাকেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তিযুক্ত কারণ বলা যায়। আমরা দাবী করি বিজ্ঞানের মাধ্যমে এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব এবং তাতে কোনোরকম স্বর্গীয় ঈশ্বরকে আহ্বান করার প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় অধ্যায়ে মডেল-নির্ভর বাস্তবতার ধারণায়, আমাদের মস্তিষ্কের সংবেদনশীল ইন্দ্রিয় বাইরের জগতকে দেখার মধ্য দিয়ে কোনো গৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করে। আমরা আমাদের গৃহ গাছপালা, লোকজন, বিদ্যুতের সকেট, অণু-পরমাণু ও অন্যান্য কিছু, মহাবিশ্বের সাপেক্ষে আমাদের মানসিক একটি ধারণা তৈরি করে নেই। এই মানসিক ধারণাই একমাত্র বাস্তবতা, যা আমরা জানি। এই বাস্তবতাকে কোনো স্বাধীন মডেল বহির্ভূত কোনোরূপ পরীক্ষা করে দেখার উপায় নেই। এটা দেখা যায় যে, একটি সুসংগঠিত মডেল তার নিজস্ব বাস্তবতাকেই সৃষ্টি করে। একটি উদাহরণ এই বাস্তবতা ও সৃষ্টির বিষয়টি বুঝতে সহায়ক হতে পারে। সেটা হল জীবনের খেলা (Game of life)। কেমব্রিজের গণিতজ্ঞ জন কনওয়ে ১৯৭০ সালে জীবনের 'খেলা' আবিষ্কার করেন।

জীবনের খেলায় 'খেলা' শব্দটির প্রয়োগ একটি ভুল। এই মডেলে কোনো হারজিৎ নেই। আসলে এখানে কোনো খেলোয়াড়ও নেই। জীবনের খেলা আসলে প্রচলিত অর্থের মতো কোনো খেলা নয়। এটা একগুচ্ছ নিয়ম, যা দ্বিমাত্রিক মহাবিশ্বকে পরিচালনা করে। এটা একটি নিশ্চয়তামূলক মহাবিশ্ব : একবার শুরুর একটি কাঠামো বা প্রাথমিক শর্ত আরোপ করে দিলে, সূত্রটিই তখন ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা নির্দেশ করে।

কনওয়ে যে মহাবিশ্বের চিত্র এঁকেছেন সেটা বর্গাকৃতি, দাবা খেলার বোর্ডের মতো অনেকগুলি বর্গক্ষেত্রবিশিষ্ট, কিন্তু বোর্ডটির বিস্তৃতি সব দিকে অসীম। প্রতিটি বর্গক্ষেত্র দুটি অবস্থার ভেতর আছে : জীবন্ত (ছবিতে সবুজ ঘর) অথবা মৃত (ছবিতে কালো ঘর)। প্রতিটি বর্গের আটটি প্রতিবেশি আছে : উপরে, নীচে, বামে, ডাইনের প্রতিবেশি এবং কোণাকুনিভাবে চারটি প্রতিবেশি। এ বিশ্বে সময় একটানা অবিছিন্ন নয়, সময় এখানে অসংলগ্নভাবে সামনের ধাপে এগিয়ে চলে। জীবন্ত এবং মৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্গক্ষেত্র যে কোনো উপায়ে সাজালে, জীবন্ত প্রতিবেশিদের সংখ্যা ভবিষ্যতে কী হবে তা নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী বলা যায় :

১. দুটি বা তিনটি জীবন্ত প্রতিবেশির সাথে সংলগ্ন একটি জীবন্ত বর্গক্ষেত্র টিকে থকে (উদ্‌বর্তন)
২. সুনির্দিষ্ট তিনটি জীবন্ত প্রতিবেশির সাথে সংলগ্ন একটি মৃত বর্গক্ষেত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে (জন্ম)
৩. অন্য সব ক্ষেত্রে একটি বর্গক্ষেত্র মৃত্যুবরণ করে বা মৃত অবস্থায় থাকে। একটি জীবন্ত বর্গক্ষেত্রের শূন্য অথবা একটি প্রতিবেশির ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গতার কারণে মৃত্যুবরণ করে। আর যদি তিনটির বেশী জীবন্ত প্রতিবেশি থাকে, তবে বর্গক্ষেত্রটি মাত্রাধিক্য জীবনের কারণে মৃত্যুবরণ করে!

জীবনের খেলার তত্ত্বে এই হচ্ছে সব কথা : একটি প্রাথমিক শর্তের সাপেক্ষে এই সূত্র বংশের পর বংশ সৃষ্টি করতেই থাকে। একটি বিচ্ছিন্ন জীবন, বর্গক্ষেত্র অথবা দুটি পরস্পরসংলগ্ন জীবন্ত বর্গক্ষেত্র পরবর্তী বংশধারায় মরে যায়, কারণ তাদের যথেষ্ট প্রতিবেশি নেই। তিনটি কোনাকুনি জীবন্ত বর্গক্ষেত্র একটু বেশী দিন বাঁচে। প্রথম ধাপ সময় অতিক্রমের পর শেষের দিক বর্গক্ষেত্রগুলি মারা যায় এবং সেখানে একটি মধ্যবর্তী বর্গক্ষেত্র রেখে যায় যা পরবর্তী বংশধারায় মারা যায়। যে কোনো কৌণিক বর্গক্ষেত্রগুলো এভাবেই উধাও হয়ে যায়। কিন্তু যদি তিনটি বর্গক্ষেত্র আনুভূমিকভাবে একই সারিতে রাখা যায়, ও কেন্দ্রের দুটি প্রতিবেশি থাকে এবং দুটি শেষ প্রান্তের বর্গক্ষেত্র মারা গেলেও বেঁচে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থিত বর্গক্ষেত্রের উপরের ও নীচের সংলগ্ন বর্গক্ষেত্রটি জীবনের সূচনা করে। সেক্ষেত্রে আনুভূমিক সারিটি কলামে রূপান্তরিত হয়। এভাবে পরবর্তী বংশানুক্রমিক ধারায় কলাম আবার সারিতে রূপান্তরিত হয় এবং এভাবেই চলতে থাকে। এ ধরনের আন্দোলিত গঠনপ্রণালীকে ব্লিংকার (Blinker) বলা হয়।

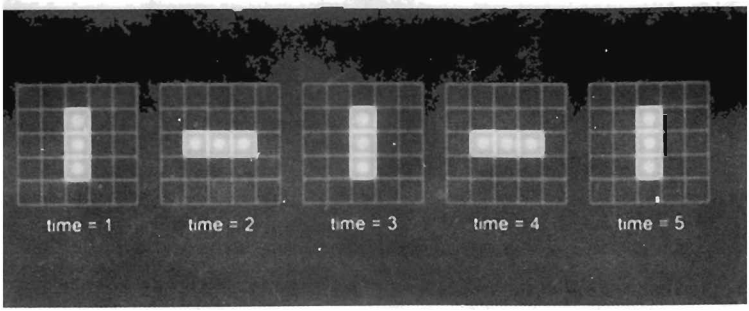

ব্লিংকার : ব্লিংকার হচ্ছে জীবনের খেলার যৌগিক বস্তুর সহজ নমুনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি তিনটি জীবন্তবর্গক্ষেত্রকে L এর মতো আকারে বসানো হয় তখন একটি নতুন ঘটনা ঘটে। পরবর্তী বংশধারায় L এর মাঝখানের বর্গক্ষেত্রটিতে একটি নতুন জীবন সৃষ্টি হয়, যা একটি ২ X ২ ব্লকের সৃষ্টি করে। এই ব্লকের ছকের অবস্থানটিকে বলে স্থির-জীবন (Still Life), কারণ এরা বংশ থেকে পরবর্তী বংশে অপরিবর্তিত অবস্থায় চলতে থাকবে। বহু ধরনের বিভিন্ন প্রকার ছকে পূর্বের বংশধারায় এই গঠন বৈশিষ্ট্য থাকে, কিন্তু পরবর্তীকালে তা 'স্থির-জীবনে' পরিণত হয় অথবা মারা যায় অথবা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় এবং পুনরায় এই পদ্ধতিতে চলতে থাকে।

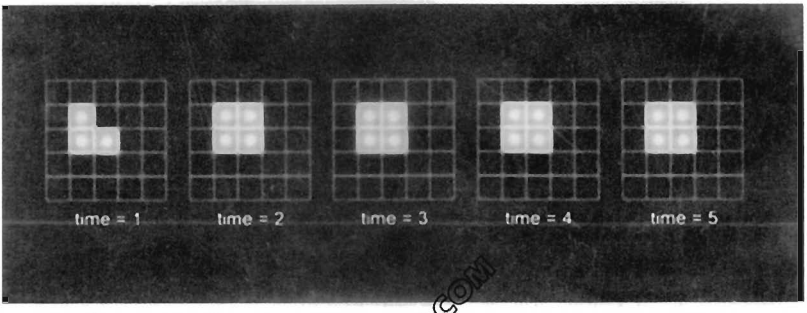

স্থির-জীবনের বিবর্তন : কিছু যৌগিক বস্তু জীবনের খেলায় এমন অবস্থায় পৌঁছে যে নির্দেশকারী সূত্রসমূহ কখনো পরিবর্তিত হয় না।

AMARBOI.COM

গ্লাইডার নামক আরো এক ধরনের নকশা আছে, যা অন্য রকম সাংগঠনিক আকার ধারন করে এবং কয়েক প্রজন্ম পরে তাদের মূল গঠনে ফিরে যায়। সেক্ষেত্রে তার অবস্থান একটি বর্গক্ষেত্রের নিচে, কোণাকুণিভাবে। সময়ের সাথে পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা যায় যে এগুলো শ্রেণীবদ্ধভাবে জড়ো হচ্ছে। যখন এই গ্লাইডারগুলো

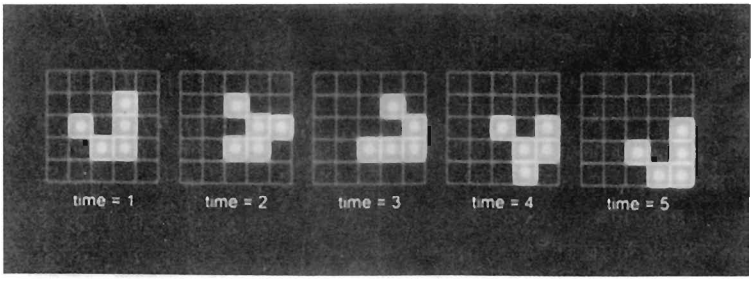

গ্লাইডার : গ্লাইডার এ সমস্ত অন্তবর্তী গঠন বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তাদের মূল আকৃতিতে প্রত্যাবর্তন করে, যেখানে কৌণিকভাবে একটি বর্গক্ষেত্রকে অপসারিত করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াকালীন সময়ে এদের আকৃতির উপর নির্ভর করে এক অদ্ভুত ঘটনা দেখা দেয়।

মহাবিশ্বকে যা আকর্ষণীয় করেছে, তা হচ্ছে-এর মৌলিক 'পদার্থবিদ্যা' সহজ, কিন্তু এর 'রসায়ন' জটিল হতে পারে। অর্থাৎ এর যৌগিক বস্তুসমূহ বিভিন্ন পরিমাপে অবস্থান করছে। একেবারে ক্ষুদ্রতম পরিমাপের ভেতর মৌলিক পদার্থবিজ্ঞান বলে যে, শুধুমাত্র জীবন্ত ও মৃত বর্গক্ষেত্র রয়েছে। আর বড় পরিসরে আছে গ্লাইডার, ব্লিংকার এবং স্থির জীবনের ব্লকসমূহ। আরো বৃহত্তর পরিমাপে রয়েছে জটিলতর বস্তুর অবস্থান, যেমন গ্লাইডার বন্দুক : স্থির নকশায় যা সময়ের ক্রমানুসারে নতুন গ্লাইডার জন্ম দেয়, যা তার আশ্রয় ফেলে কৌণিক অবস্থানে আসে।

যদি আপনি মহাবিশ্বের আলোকে জীবনের খেলাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের ভেতর অবলোকন করেন, তাহলে ঐ পরিমাপের ভেতর কোনো বস্তুর বিশ্লেষণের জন্য সহায়ক সূত্রগুলো ধারণা করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, বস্তুর এই মাপকাঠিতে কয়েকটি বর্গক্ষেত্রের জন্য আপনি এমন কিছু তত্ত্ব পেতে পারেন, যেমন, 'ব্লক কখনো চলাচল করে না' 'গ্লাইডার কৌণিকভাবে চলে' এবং বস্তুসমূহ সংঘর্ষে লিপ্ত হলে কী পরিণতি হয়, সে তত্ত্ব। আপনি যৌগিক বস্তুর ক্ষেত্রে কোন্ অবস্থায় কী ঘটে, তার সামগ্রিক পদার্থবিজ্ঞান তৈরি করতে পারবেন। এসব সূত্রের ধারণা বা চরিত্র হয়তো মূল সূত্রসমূহের সাথে মিলবে না। উদাহরণস্বরূপ, মূল সূত্রে 'সংঘর্ষ' বা 'চলাচলের' কোনরূপ ধারণা নেই। এগুলো বড়জোর প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের জীবন্ত ও মৃত অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে। আমাদের মহাবিশ্বে আপনার বাস্তবতা জীবনের খেলায় কোন্ মডেল গ্রহণ করেছেন, তার উপর নির্ভর করে।

কোনওয়ে এবং তাঁর ছাত্রদের এই গাণিতিক মডেল উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য ছিল এটা জানা যে মহাবিশ্বের সহজ সূত্রসমূহের প্রেক্ষিতে প্রজননক্ষম যৌগিক বস্তুর উদ্ভব সম্ভব কিনা। জীবনের খেলার এই বিশ্বে, যেখানে যৌগিক বস্তুর অবস্থান, বংশানুক্রমিকভাবে সূত্রগুলোর মাধ্যমে একই ধরনের যৌগিক বস্তু সৃষ্টি করে কিনা। কোনওয়ে এবং তাঁর ছাত্ররা কেবল এর সম্ভাবনাই প্রমাণ করলেন না, তাঁরা দেখালেন যে এরকম সৃষ্ট বস্তু, বলা যায় বুদ্ধিমানও হতে পারে। এর মাধ্যমে আমরা কী বুঝতে পারি? সঠিকভাবে বললে, তাঁরা দেখালেন যে এই বিশাল সংখ্যক বর্গক্ষেত্র নিজেরাই একই ধরনের বস্তুর জন্ম দেয়, যেটা হচ্ছে 'ইউনিভার্সাল ট্যুরিং মেশিন (Universal Turing Machines)'। এটা বুঝার জন্য বলতে পারি, কোনো কম্পিউটারকে যদি সঠিক তথ্যাদি প্রদান করা হয়, তবে সেটা সঠিক ফলাফল প্রদান করতে পারে। এটা জীবনের খেলায় বিশ্ব পরিবেশের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শর্ত দিয়ে দেখা, এরপর বংশানুক্রমে কয়েক পরম্পরায় ঐ যন্ত্রটি কম্পিউটারের হিসাব অনুযায়ী ফলাফলই জন্ম দেবে।

এটা কীভাবে কাজ করে বুঝতে হলে ধরা যাক, যখন ২ X ২ ব্লক জীবন্ত বর্গক্ষেত্রে গ্লাইডার এর বর্ষণে কী ঘটে। যদি গ্লাইডার ঠিকপথে এগুতে থাকে, স্থির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

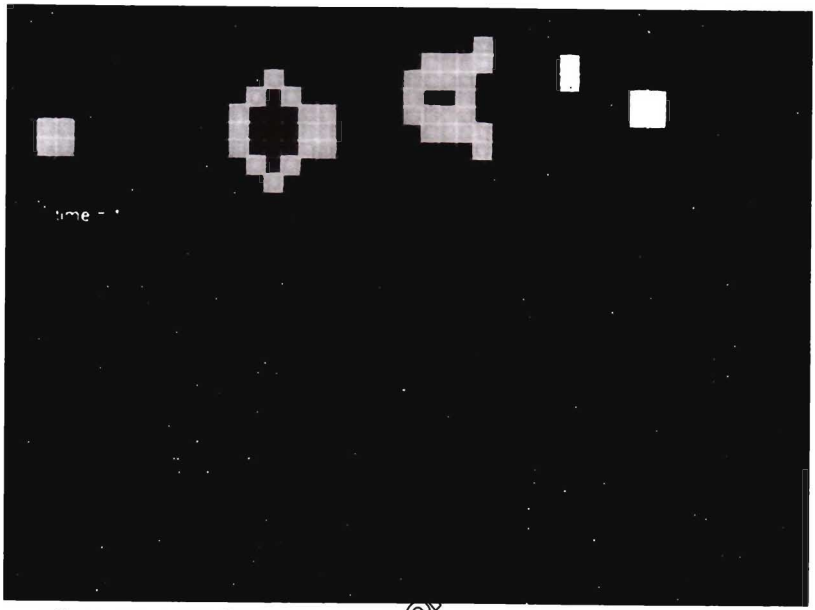

গ্লাইডার গান এর প্রাথমিক নকশা : গ্লাইডার গান গ্লাইডারের চেয়ে মোটামুটি দশগুণ বড়।

ব্লকগুলি গ্লাইডারের দিকে আসবে এবং দূরে সরে যেতে থাকবে। এভাবে একটি ব্লক কম্পিউটারের স্মৃতিকোষকে স্পন্দিত করতে পারে। আসলে কম্পিউটারের স্মৃতির সমস্ত মূল কার্যকলাপ যেমন AND এবং OR গেট গ্লাইডারের দ্বারা তৈরী করা যায়। এভাবে যেমন করে বৈদ্যুতিক সিগনাল কম্পিউটারে প্রবাহিত করানো হয়, ঝাঁকে ঝাঁকে গ্লাইডারও প্রবেশ করিয়ে তথ্য উপাত্তকে প্রক্রিয়াজাত করা যেতে পারে।

আমাদের পৃথিবীর জীবনের খেলায় স্বপ্রজনন ক্ষমতার নকশা হচ্ছে জটিল বিষয়। একটি গণনায়, স্বপ্রজনক্ষম গণিতবিদ জন ভন নিউম্যানের পূর্ববর্তী গবেষণায় জীবনের খেলার স্ববিস্তারকৃত নকশায় ১০ ট্রিলিয়ন বর্গক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে, যা মানুষের একটি মাত্র কোষের ভেতর পরমাণুর সংখ্যার প্রায় সমান।

জীবিত প্রাণীর সংজ্ঞায় একজন বলতে পারেন যে এটি একটি জটিল পদ্ধতি, নির্দিষ্ট আকারের এবং স্থিতিশীল, যা প্রজননক্ষম। উপরের যে বস্তুসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি পুনঃসৃষ্টি ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্তু স্থিতিশীল নয়। একটি বাইরের ছোট বিশৃঙ্খলা সম্ভবত এই সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াকে বিনষ্ট করে দিতে পারে। যাই হোক, এটা ভাবা সহজ যে আরো একটি জটিল সূত্র জটিল পদ্ধতির ভেতর জীবনের চিহ্ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হতে পারে। এরকম একটা অবস্থার কথা কল্পনা করুন : কোনওয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

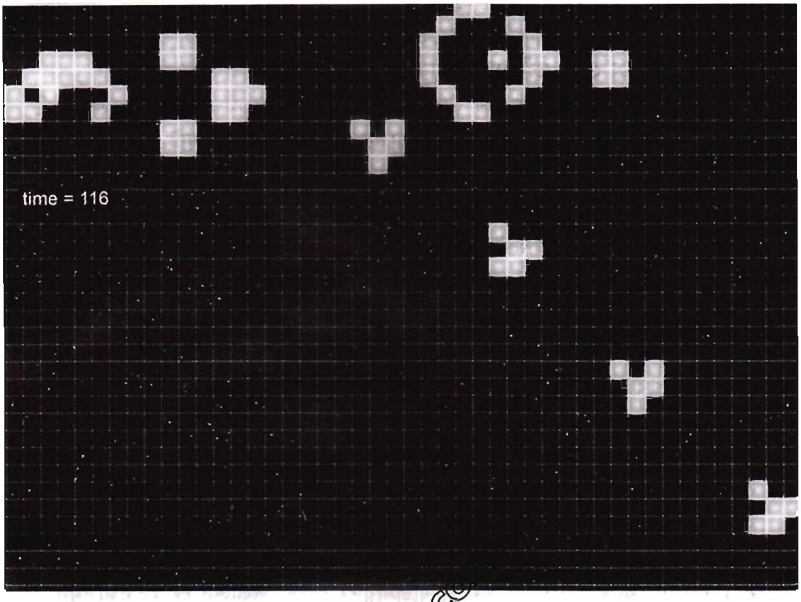

১১৬ প্রজন্ম পরে গ্লাইডার গানের অবস্থা। সময়ের সাথে গ্লাইডার গান আকৃতি পরিবর্তন করে, একটি গ্লাইডার নিক্ষেপ করে, তারপর তার পূর্বাবস্থায় ও পূর্ব স্থানে ফিরে আসে। এ ঘটনাটি অসীম সংখ্যায় ঘটতে থাকে।

AMARBOI.COM

মতো একটি বিশ্বের ভেতর একটি বস্তুর অবস্থান। এ ধরনের বস্তু পরিবেশের প্রভাবে প্রভাবিত হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে। এরকম জীবন কী নিজেদের সম্বন্ধে নিজেরা জ্ঞাত হবে? এটা কী সজ্ঞান হবে? এই প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কারভাবে দ্বিধাবিভক্ত। কেউ কেউ বলেন যে সজ্ঞান হওয়াটা সম্পূর্ণই মানবিক বিষয়। এটা স্বাধীন ইচ্ছার জন্ম দেয়, বিভিন্ন পথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করে।

কীভাবে একজন বলতে পারে যে কারো স্বাধীন ইচ্ছা আছে? যদি কেউ কখনও ভিনগ্রহের প্রাণীর সামনে পড়ে, সে কীভাবে নিশ্চিত হবে যে ওটা আদৌ একটি রোবট অথবা নিজস্ব প্রজ্ঞাসম্পন্ন প্রাণী কিনা? কেউ রোবট এর ব্যাপারে বলতে পারেন যে এর কার্যকলাপ বলে দেয়া যায়, যা সম্পূর্ণই ভবিষ্যদ্বাণীর আওতাধীন। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমনটি বলেছি যে এটা কিন্তু অসম্ভব রকমের কঠিন হতে পারে, যদি বস্তুটি বৃহৎ এবং জটিল হয়। আমরা তিন বা ততধিক কণিকার একের সাথে অন্যের সাংঘর্ষিক আচরণের সমীকরণের একেবারে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। যেহেতু একটি ভিন্নগ্রহের প্রাণীর, যা হয়তো মানুষের মাপের সমান, তাতে হাজার ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কণিকা থাকতে পারে, এমনটি হতে পারে যদি ঐ প্রাণীটি রোবটও হয়। এক্ষেত্রে এটা সমীকরণের মাধ্যমে বলা সম্ভব নয় যে, সে কী করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। অতএব আমাদেরকে বলতেই হবে যে, যে কোনো জটিল প্রাণীর মুক্ত ইচ্ছা থাকতে পারে তা মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে না হলেও, একটি কার্যকর তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়ে যে, আমরা ওটার ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকলাপ হিসেব করে বলতে সক্ষম নই।

কোনওয়ের জীবনের খেলার উদাহরণ দেয়া যায় এরকম যে, খুব সহজ একটি সূত্রের ভেতর থেকে বুদ্ধিমান জটিল জীবনের উদ্ভব সম্ভব। অবশ্যই এরকম অনেক অনেক ঝাঁক একই ধর্মের সূত্র এখানে আছে। আমাদের মহাবিশ্বের পরিচালনায় কোনগুলো মূল সূত্রসমূহ হিসেবে গণ্য করা যাবে? কোনওয়ের মহাবিশ্বের ভেতর আমাদের মহাবিশ্বের নিয়মাবলীর মতো, বিবর্তনের পদ্ধতির দিক নির্দেশনা করে। কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনওয়ের পৃথিবীতে আমরাই স্রষ্টা। আমরা মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা নির্ধারণ করে দেই– বস্তু নির্দেশ করা এবং এর অবস্থান ঠিক করা হয় খেলার শুরুতেই।

বাস্তব মহাবিশ্বে বস্তুর অনুরূপ অংশ, যথা জীবনের খেলার গ্লাইডার পদার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন বস্তু। একটি চলমান পৃথিবীর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একরাশ নিয়মাবলীর ভেতর শক্তির ধারণা থাকতে হবে, যে শক্তি পরিমাণগতভাবে নিত্য। এর অর্থ এটা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় না। ফাঁকা স্থানে শক্তি সুনির্দিষ্ট মান বিশিষ্ট, যা সময় এবং অবস্থান নিরপেক্ষ। যে কোনো আয়তনের স্থানের অভ্যন্তরীণ শক্তি একই আয়তনের শূন্যস্থানের শক্তির সাপেক্ষে এই স্থির শূন্যস্থানের শক্তিকে বিয়োগ করে শূন্য ধ্রুবক মান পাওয়া যেতে পারে। একটা প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে, প্রকৃতির যে কোনো নিয়মে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন কোনো বস্তুর চারপাশের শূন্যস্থানের শক্তি ধনাত্মক হতে হবে। এর অর্থ এই যে, বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে বিগঠনের সহায়ক হতে হবে। কারণ কোনো বিচ্ছিন্ন বস্তুর শক্তি যদি ঋণাত্মক হয়, এটা গতির এমন একটি পর্যায় সৃষ্টি করতে পারে, যা গতিজনিত কারণে ধনাত্মক শক্তির সমান হয়ে পড়তে পারে। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে কোথাও বা সর্বত্র কোনো বস্তু থাকার কথা নয়। শূন্যস্থান তাই অস্থিতিশীল হতো। কিন্তু বিচ্ছিন্ন বস্তু তৈরী করতে শক্তির প্রয়োজন হতো, এরকম অস্থিতিশীল শূন্যস্থান থাকতো না; কারণ আমরা বলেছি যে মহাবিশ্বের সমস্ত শক্তিই সুনির্দিষ্ট থাকে। এই কারণে মহাবিশ্ব স্থানীয় পর্যায়ে স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। একারণেই কোনো অস্তিত্বহীনতার থেকে সর্বত্রই কোনো কিছুরই আবির্ভাব হচ্ছে না।

যদি মহাবিশ্বের সমস্ত শক্তির যোগফল শূন্য থাকত এবং বস্তু সৃষ্টিতে শক্তির প্রয়োজন হতো তাহলে অস্তিত্বহীনতার ভেতর থেকে কীভাবে সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি হল? এই জন্যই মহাকর্ষের মতো একটি সূত্র থাকতেই হবে। কারণ মহাকর্ষ বল আকর্ষক, মহাকর্ষীয় শক্তি ঋণাত্মক মহাকর্ষীয় বলের কারণে পৃথিবী ও চাঁদ তাদের অবস্থানে স্থিত আছে। কোনো পদার্থের সৃষ্টির জন্য ঋণাত্মক শক্তি ও ধনাত্মক শক্তির সমতা দরকার। কিন্তু এটা হওয়া এত সহজ নয়। পৃথিবীর মহাকর্ষীয় ঋণাত্মক শক্তি, পৃথিবীতে অবস্থিত সমস্ত পদার্থকণিকার ঋণাত্মক শক্তির এক বিলিয়ন ভাগের একভাগ মাত্র। কোনো বস্তু, যেমন একটি তারকার আরো অনেক বেশি ঋণাত্মক

পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাকর্ষীয় শক্তি আছে এবং এর ভেতর বিভিন্ন অংশ কাছাকাছি থাকার কারণে এই ঋণাত্মক মহাকর্ষীয় শক্তি তত বেশি হবে। এর ভেতর বস্তুসমূহের ঋণাত্মক শক্তি মহাকর্ষীয় শক্তির চেয়ে বেশি হওয়ার পূর্বে এটা কালো বিবরে পরিণত হবে। কালো বিবরে ধনাত্মক শক্তি বিদ্যমান এই জন্যই শূন্যস্থান স্থিতিশীল। তারকা বা কালো বিবর কোনোটাই অস্তিত্বহীন অবস্থার ভেতর থেকে সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু সমগ্র মহাবিশ্ব অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে উদ্ভূত হতে পারে।

মহাকর্ষ-স্থান ও সময়ের আকার প্রদান করে, এই বল স্থান-সময়কে স্থানীয়ভাবে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে, কিন্তু বৈশ্বিক দিক দিয়ে অস্থিতিশীল করে। সমগ্র মহাবিশ্বের মাপকাঠিতে পদার্থের ধনাত্মক শক্তি ঋণাত্মক মহাকর্ষীয় শক্তির মধ্যে ভারসাম্য তৈরী করে; অতএব, অনেকগুলি মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে কোনো বাধা থাকে না। কারণ মহাকর্ষ সূত্রের মতো একটি সূত্র বিদ্যমান, মহাবিশ্ব ষষ্ঠ অধ্যায় অনুযায়ী এর ভেতর থেকেই বা অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকেই সৃষ্ট হতে পারে। স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিই কোনো কিছু না থাকার চেয়ে কিছু একটা থাকার কারণ– কেনই বা মহাবিশ্ব আছে এবং কেন আমরা এখানে আছি। ঈশ্বরের এখানে আলো জ্বেলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

আমরা যে সমস্ত মৌলিক সূত্রগুলির কথা বলেছি সেগুলি কেন? পূর্ণাঙ্গ একটি সূত্র হতে হবে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুনির্দিষ্ট ফলাফল বলে দিতে সক্ষম। আমরা দেখেছি যে মহাকর্ষ সূত্রের মতো একটি সূত্র থাকতেই হবে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে দেখেছি মহাকর্ষ তত্ত্ব সুনির্দিষ্ট পরিমাপের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এই তত্ত্বকে প্রকৃতির বল এবং যে পদার্থের উপর এই বল কাজ করে, এদের ভেতর অতিসামঞ্জস্যের মধ্যে থাকতে হবে। M-তত্ত্ব হচ্ছে মহাকর্ষের অতি সাধারণ অতি সামঞ্জস্যের সূত্র। এই জন্য M-তত্ত্ব একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব হওয়ার দাবী করে। এটা এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ যে এটা অসীম কিনা, যদি এটা সুনির্দিষ্ট হয়, তাহলে এটা সেই মহাবিশ্বের মডেল সূত্র, যে মহাবিশ্ব নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে। আমরা অবশ্যই মহাবিশ্বের একটি অংশ, কারণ এটা ছাড়া আর কোনো গ্রহণযোগ্য মডেল নেই।

M-তত্ত্বই সেই একীভূত তত্ত্ব, যা আইনস্টাইন স্বপ্ন দেখতেন। সত্য কথা হল, আমরা মানুষেরা– যারা নিজেরা অনেক মৌলিক কণিকার সৃষ্টি– তারা মহাবিশ্বের এবং আমাদের চালিকাতত্ত্বের খুব কাছাকাছি এসেছি, যেটা আমাদের মহাবিজয়। কিন্তু সম্ভবত সত্যিকারের দৈব হল যুক্তিশাস্ত্রের বিমূর্ত ধারণা দিয়ে আমরা কীভাবে একটি অসাধারণ তত্ত্বের অবতারণা করে এই বিশাল মহাবিশ্বের বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি। যদি এই সূত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত প্রমাণ করা যায়, তাহলে এটা হবে ৩০০০ বছরের অধিক কালব্যাপী আমাদের অন্বেষণের সার্থক নিস্পত্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দকোষ

অল্টারনেটিভ হিস্টোরিজ : কোয়ান্টাম তত্ত্বের একপ্রকার সূত্র, যেখানে কোনো দৃশ্যমান ঘটনার সম্ভাবনাকে সম্ভাব্য ইতিহাসগুলি বিবেচনায় এনে উপস্থাপন করা হয় এমনভাবে যাতে করে ঐ দৃশ্যমান ঘটনাটির সৃষ্টি হয়।

এনথ্রোপিক প্রিন্সিপল : এক ধরনের ধারণা তত্ত্ব, যার মাধ্যমে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের আপাত প্রতীয়মান সূত্রসমূহ সম্পর্কে উপসংহার টানতে পারি এই বাস্তবতার মাধ্যমে যে আমাদের অস্তিত্ব বিরাজমান।

এন্টিম্যাটার প্রতিকণিকা : কোনো বস্তুর কণিকার প্রতিকণিকা আছে। যদি উভয় প্রকার কণিকা এবং প্রতিকণিকা একত্রিত হয়, তবে তারা নিঃশেষিত হয়ে শক্তির উদ্ভব ঘটায়।

এপারেন্ট লজ : আমাদের মহাবিশ্বের দৃশ্যমান প্রকৃতির সূত্রসমূহ– যেমন চারটি বলের সূত্রগুলির ধ্রুবকগুলি যথা ভর এবং চার্জ যা মৌলিক কণাসমূহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে। এই আপাতঃ প্রতীয়মান সূত্রগুলি M-তত্ত্বের মতো আরো মৌলিক সূত্রের সাথে সাংঘর্ষিক, যেখানে বহু মহাবিশ্ব এবং বহু রকমের তত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে।

এসিম্পটটিক ফ্রিডম : (অপ্রতিসাম্য স্বাধীনতা) : এটি শক্তিশালী বলের একটি ধর্ম, যা নিকটবর্তিতার সাপেক্ষে দূর্বলতর হয়। এখানে যদিও কোয়ার্ক নিউক্লিয়াসের ভেতর বাঁধা আছে শক্তিশালী বলের কারণে, তথাপিও কোয়ার্ক নিউক্লিয়াসের ভেতর চলাচল করতে পারে, যেন বা এটা কোনোরূপ বলের প্রভাবের বাইরে।

এটম : সাধারণ পদার্থের মূল একক। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন এবং নিউট্রন আছে, তা কক্ষে পরিক্রমণরত ইলেক্ট্রন দ্বারা পরিবেষ্টিত।

বেরিয়ন : এক ধরনের মৌলিক কণিকা, যেমন প্রোটন বা নিউট্রন এবং যা তিনটি কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত।

বিগ ব্যাংগ (মহাবিস্ফোরণ) : মহাবিশ্বের উষ্ণ ও ঘন অবস্থা থেকে শুরুর মুহূর্ত। অতীতে আমাদের আজকের যে দৃশ্যমান মহাবিশ্ব, তা মাত্র কয়েক মিলিমিটার ছিল। আজকের মহাবিশ্ব বিস্তৃত ও শীতলতর, কিন্তু আমরা মহাবিশ্বের শুরুর অবস্থার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণা নিতে পারি মহাজাগতিক অতীত পটভূমির বিকিরণ (CMBR) থেকে, যা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

ব্ল্যাক হোল : (কালো বিবর) : সময়-কালের ভেতর একটি স্থান, মহাকর্ষীয় বলের কারণে এটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং মহাবিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকে পৃথক।

বোসন : একপ্রকার মৌলিক কণিকা, যা বল বহন করতে পারে।

বটম-আপ এপ্রোচ : নীচ থেকে উপরের ধারণা : মহাকাশবিদ্যার এটি একটি ধারণা, যা মহাবিশ্বের একটি মাত্র ইতিহাসের উপর আশ্রয় করে সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে সুষ্ঠুভাবে একটি শুরুর মুহূর্তের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আজকের মহাবিশ্ব শুরুর মুহূর্ত থেকে বিবর্তিত হয়ে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ক্লাসিক্যাল ফ্রিজিক্স : পদার্থবিজ্ঞানের যে কোনো সূত্র, যাতে মনে করা হয় যে মহাবিশ্বে একটি মাত্র সুব্যাখ্যাকৃত সংঘটন রয়েছে।

কসমোলজিক্যাল কনষ্টান্ট : আইনস্টাইনের সমীকরণের একটি ধ্রুবক, যার কারণে স্থান-কালের বিস্তৃত হওয়ার উপাদান সহজভাবে বিদ্যমান আছে।

ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বল : প্রকৃতির চারটি বলের মধ্যে দ্বিতীয় শক্তিশালী বল। এই বল, কণিকা ও বৈদ্যুতিক চার্জের ভেতর ক্রিয়াশীল।

ইলেক্ট্রন : ঋণাত্মক চার্জযুক্ত বস্তুর মৌলিক কণিকা এবং ইলেক্ট্রন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক গুণাবলীর জন্য দায়ী।

ফার্মিয়ন : পদার্থের মতো এক ধরনের মৌলিক কণিকা।

গ্যালাক্সি : তারকা ও নক্ষত্রমণ্ডলের ভেতর পদার্থসমূহ এবং ডার্কম্যাটার, যা মহাকর্ষের কারণে একত্রে আছে।

গ্রাভিটি : প্রকৃতির চারটিবলের মধ্যে দুর্বলতম বল। ভরবিশিষ্ট কোনো বস্তুর একটি অপরটির সাথে আকর্ষণের কারণে এই বল সৃষ্টি হয়।

হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপল্ : হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্র : এটি কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি নিয়ম, যাতে বলা হয় যে কোনো বস্তুর দুটি ভৌত ধর্মের যে কোনো একটি সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।

মেসন : কোয়ার্ক এবং একটি প্রতি-কোয়ার্ক দ্বারা সৃষ্ট এক ধরনের মৌলিক কণিকা।

M-থিয়োরী : সবধরনের তত্ত্বের সবকিছুর ব্যাখ্যার জন্য পদার্থবিজ্ঞানের একটি মৌলিক তত্ত্ব হিসেবে পরিগণিত হওয়ার জন্য দাবীদার একটি তত্ত্ব।

মাল্টিভার্স : এক ঝাঁক মহাবিশ্ব।

নিউট্রিনো : এক ধরনের বৈদ্যুতিক চার্জ, নিরপেক্ষ বেরিয়ন, যা প্রোটনের সাথে পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন করে।

নো-বাউন্ডারি কন্ডিশন : মহাবিশ্বের সংঘটনগুলির সীমানাহীন শর্তাবলী।

ফেজ : একটি ঢেউ এর আবর্তনকালের উপর একটি অবস্থান (দশা)।

ফোটন : তড়িৎ চুম্বকীয় বল বিশিষ্ট একটি বোসন কণিকা। এটি আলোর কোয়ান্টাম কণিকা।

প্রবিলিটি এমপ্লিচুড : কোয়ান্টাম তত্ত্বে এটি একটি জটিল সংখ্যা, যার বর্গ করলে সম্ভাবনার পরম মান পাওয়া যায়।

প্রোটন : ধনাত্মক চার্জবাহী বেরিয়ন, যা নিউট্রনের সাথে পরমাণুর নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে।

বুদ্ধিদীপ্ত পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোয়ান্টাম থিওরী : এমন তত্ত্ব যেখানে কোনো বস্তুর ব্যাখ্যায় একটি মাত্র নির্দিষ্ট সংঘটন থাকে না।

কোয়ার্ক : আংশিক বৈদ্যুতিক চার্জবিশিষ্ট মৌলিক কণিকা, যা শক্তিশালী বলকে অনুভব করতে পারে। প্রোটন ও নিউট্রন প্রত্যেকটি তিনটি কোয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত।

রি-নরমালাইজেসন : এটি একটি গাণিতিক পদ্ধতি, যা কোয়ান্টাম তত্ত্বের মাধ্যমে উদ্ভূত অসীম সংখ্যকতাকে অনুভব করতে পারে।

সিংগুলারিটি : স্থান-কালের ভেতর একটি অবস্থা, যাতে ভৌত পরিমাণ অসীমে রূপান্তরিত হয়।

স্পেস-টাইম : একটি গাণিতিক স্থান, যার ব্যাখ্যার জন্য স্থান ও সময় উভয় স্থানাংককে ব্যবহার করতে হবে।

স্ট্রিং থিওরী : পদার্থবিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব, যার কণিকাগুলি একটি কম্পনের নকশার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। সেখানে দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু কোনো উচ্চতা বা প্রস্থ নেই– এটি অসীম পরিমাণ চিকন সুতার মতো।

স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স : প্রকৃতির চারটি বলের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী বল। এই বল পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভেতর প্রোটন ও নিউট্রনকে একত্রে ধরে রাখে। এই বল প্রোটন ও নিউট্রনকে ধরে রাখে, কারণ এ দুটি কোয়ার্ক কণিকার সমন্বয়ে গঠিত।

সুপারস্যাভিটি : মহাকর্ষের একটি তত্ত্ব যাতে একধরনের সামঞ্জস্য আছে, যাকে অতি সামঞ্জস্যতা বলে।

সুপারসিমেট্রি : এটি এক ধরনের সূক্ষ্ম সুসামঞ্জস্য যা সাধারণ স্থানের রূপান্তরের সাথে যুক্ত নয়। এই অতি সুসামঞ্জস্যের একটি উল্লেখযোগ্য কথা হল, বলকণিকা এবং বস্তুকণিকা অর্থাৎ বল ও বস্তু একই জিনিসের দুটি পিঠ।

টপ ডাউন এপ্রোচ : উপর-নীচ ধারণা : মহাকাশ বিজ্ঞানে এই ধারণার অর্থ হল মহাবিশ্বের সংঘটনসমূহ অতীতের সময় থেকে বর্তমান সময়ের হিসেবে ব্যাখ্যা করা।

উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স : দূর্বল পারমাণবিক বল : এটি প্রকৃতির চারটি বলের একটি। পারমাণবিক বিকিরণের জন্য দূর্বল বল দায়ী। এই বল তারকার এবং প্রাথমিক মহাবিশ্বের কণিকা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতজ্ঞতা

এই বিশাল মহাবিশ্বের যেমন একটি নকশা রয়েছে তেমনি এই বইয়েরও একটি নকশা আছে। কিন্তু পার্থক্য হল, মহাবিশ্ব শূন্যতার ভেতর থেকে সৃষ্টি হয়েছে অথচ বই শূন্যতার ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয় না। বইয়ের জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন হয় এবং বই সৃষ্টির এই দায়ভার পুরোপুরি লেখকের উপর বর্তায় না। অতএব, একেবারে সর্বপ্রথমে আমাদের সম্পাদকদ্বয় বেথ রাসবম এবং এ্যান হ্যারিসকে তাদের 'প্রায়-অসীম' ধৈর্য্যের জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা ছিলেন আমাদের ছাত্র যখন আমাদের ছাত্রের প্রয়োজন হয়েছে, তারা আমাদের শিক্ষকও হয়েছেন যখন শিক্ষকের দরকার বোধ করেছি, একই সাথে যখন প্রেরণার প্রয়োজন হয়েছে তখন এদের কাছ থেকে প্রেরণাও পেয়েছি। এরা দুজন পাণ্ডুলিপির প্রতিটি বাক্যের সাথে সানন্দে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। আলোচনার সময় কোনো দাঁড়ি, কমা বা সেমিকোলনের যৌক্তিকতার বিষয়েও মতামত দিয়েছেন অথবা সামগ্রিক পূর্ণ অক্ষের সমতল পিঠের উপর লুকানো ঋণাত্মক বক্রতার উপস্থিতির সম্ভাবনার বিপক্ষের আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। আমরা মার্ক হিলারীকে ধন্যবাদ দিতে চাই, যিনি দয়া করে পাণ্ডুলিপি পড়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, ক্যারল লো এনষ্টেইন বইটির অভ্যন্তরের অঙ্গসজ্জায় উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছেন, ডেভিড স্টিভেনসন প্রচ্ছদ তৈরীতে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং লরেন নভেক এর একাগ্র পর্যবেক্ষণের ফলে ছাপার কাজে আমাদের সংশ্লিষ্টতার প্রয়োজনীয়তা ও সময় বেঁচে গেছে। পিটার বলিঙ্গার এর প্রতি আমাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা, যিনি ইলাস্ট্রেশন চিত্রশিল্পকে বিজ্ঞানে রুপান্তর করেছেন। এখানে আপনি প্রতিটি ছবিকে সম্পূর্ন সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। এবং সিডনি হ্যারিস : আপনার অসাধারণ কার্টুনের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এক্ষেত্রে আপনার অসাধারণ বিজ্ঞানীসূলভ স্পর্শকাতর মনের জন্য ধন্যবাদ, ভিন্ন কোনো মহাবিশ্বে আপনি পদার্থবিজ্ঞানী হতে পারতেন। আমরা আমাদের এজেন্ট অল জুকারমেন ও সুসান গিন্সবার্গ এর প্রতি কৃতজ্ঞ তাদের সমর্থন ও উৎসাহের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা সবসময়ে দুটি বার্তাই আমাদের কাছে পাঠাতেন। একটি হল, "বইটি এখনই শেষ করা দরকার" এবং "কখন লেখা শেষ হবে এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না, আপনারা যথাসময়ে এটা শেষ করবেনই"। কখন কি বলতে হবে তারা এটা ভালো বোঝেন।

এবং সবশেষে, স্টিফেনের ব্যক্তিগত সহকারী জুডিথ ক্রসডেলকে আমাদের ধন্যবাদ, তাঁর কম্পিউটার সহযোগী স্যাম ব্লাকবার্ন ও জোয়ান গডউইন কে আমাদের ধন্যবাদ– তারা কেবল নৈতিক সমর্থনই দেন নি, তাদের বাস্তবিক এবং কারিগরী সহায়তা ছাড়া এই বই লেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। উপরন্তু, তারা জানতেন কোথায় সবচেয়ে ভালো রেষ্টুরেন্ট আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্ল সাগান

অভিযাত্রী বিজ্ঞানী ও সংশয়ী দার্শনিক

অনুবাদ ও সম্পাদনা

নূর মোহাম্মদ কামু ও ড. গোলাম মোরশেদ খান

বিশশতকের এক ইউলিসিস বাস করতেন ইথাকায়। তবে তা প্রাচীন গ্রিসে নয়, আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে। তাঁর নাম কার্ল সাগান। মহাবিশ্বের চির অন্ধকার, নিঃসীম বিশালতার প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র-তুচ্ছ পৃথিবী ও তুচ্ছতর মানুষের অবস্থান কি 'আটপৌরে সাধারণ,' নাকি তা 'বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ' কিছু? মহাবিশ্বের রঙ্গমঞ্চে মানুষ কি নায়ক, নাকি শুধু এক তুচ্ছ চরিত্রাভিনেতা—তা নির্ধারণ করতে কার্ল সাগান দূরবীন নিয়ে রাতের পর রাত ব্যয় করেছেন। নিকট গ্রহমণ্ডল কিংবা দূর তারকাজগতের অজানা রহস্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে, সে জগতে পৃথিবীর মতোই প্রাণউদ্ভবের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করতে, সে জগতের সম্ভাব্য প্রযুক্তিসভ্যতার কাঙ্ক্ষিত বার্তা আবিষ্কার করতে এবং আমাদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য ভবিষ্যতের সমুদ্রে কোনো 'বোতলবার্তা' রেখে যেতে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অন্য সবার চেয়ে ভিন্নমাত্রিক। তাঁর অনেক প্রথাগত সহকর্মীর চোখে হয়তো তা ছিল অপ্রয়োজনীয়, অবাস্তব, স্বপ্নবিলাসী। উদ্যমী, উদ্যোগী, এই চির তরুণ বিজ্ঞানী 'নাসা' কর্তৃপক্ষের সাথে দীর্ঘ দেন-দরবার করেছেন মঙ্গল-বৃহস্পতি-শনির গ্রহমণ্ডলে জৈব উপস্থিতির অনুসন্ধান প্রচেষ্টায় নাসাকে রাজি করাতে, সৌরজগতের পরিধি পার হয়ে তারকান্তরে ছুটে চলা ভয়েজার-১ মহাকাশযানের ক্যামেরা পিছন ফিরে তাকিয়ে 'চার বিলিয়ন মাইল দূরে সূর্যের এক চিলতে আলোয় ঝুলে থাকা একটি ফ্যাকাশে নীল বিন্দুর মতো' নিঃসঙ্গ পৃথিবীর ছবি একবারের মতো তুলতে। সেই সাথে জৈব বিবর্তনের 'উত্তরাধিকার' থেকে প্রাপ্ত আমাদের মস্তিষ্ককোষে সরীসৃপীয় অন্ধবোধের উন্মাদনায় যাতে আমরা নিজেদের ধ্বংস ডেকে না আনি, পারমাণবিক শৈত্যে মানবসভ্যতাকে তুষারাবৃত না করি, পৃথিবীর সংবেদনশীল জৈব পরিমণ্ডলের অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ার আগেই তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসি—তার জন্য বিশ শতকের এ ইউলিসিস মানবজাতির সামনে রেখে গেছেন কাসান্ড্রার মতোই অমোঘ সাবধান বাণী।

কার্ল সাগানকে নিয়ে মূল্যায়নধর্মী এ গ্রন্থটি বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকের অনুসন্ধিৎসা আরো জাগিয়ে তুলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবী বদলে দেয়া মহাগ্রন্থ

বাইবেল

একটি জীবনী

মূল : ক্যারেন আর্মস্ট্রং

অনুবাদ : সৌরীন নাগ

পৃথিবীর প্রতি তিনজনের একজনের জন্য বাইবেল হচ্ছে তার আধ্যাত্মিক জীবনের পথ-প্রদর্শক আর এই বাইবেল পৃথিবীর বৃহত্তম সুসংগঠিত ধর্ম, ক্রিশ্চিয়ানিটির একেবারে মর্মস্থলে অবস্থিত একটি অসামান্য গ্রন্থ। বাইবেল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক বিক্রীত বই, যা গত দুশো বছরে অন্তত ছ'কোটি কপি সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু বাইবেল একটা জটিল গ্রন্থ এবং এর ইতিহাসও অত্যন্ত জটিল এবং অস্পষ্ট। শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই বইয়ের বিষয়বস্তু বদলেছে, এটা বিভিন্ন অনুবাদ ও ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কাছে এই বই নানারকম অর্থ বহন করেছে। এই বইটিতে ক্যারেন আর্মস্ট্রং, একজন স্বীকৃত ঐতিহাসিক, ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বইটির সম্বন্ধে প্রারম্ভিক ধারণা, তার উদ্ভব, তার জীবন এবং পরবর্তী ইতিহাস আলোচনা করেছেন। যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় মৌখিক ইতিহাস লিখিত শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে, আর্মস্ট্রং তা বিশ্লেষণ করেছেন, এবং কেমন করে এই সর্বব্যাপী শাস্ত্র একটি গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে, কেমনভাবে এটা ক্রিশ্চিয়ানিটির পবিত্র রচনা হিসাবে গৃহীত হয়েছে এবং এর ব্যাখ্যা কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে– সেসবও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। যে সময়ে মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে ক্যারেন আর্মস্ট্রং রচিত বাইবেল-এর জীবনী একটি অনবদ্য, মন-কাড়া-বই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আর্মস্ট্রং কেবলমাত্র বাইবেল কেমন করে, কখন এবং কার দ্বারা লিখিত হয়েছিল, তাই বর্ণনা করেননি, তিনি দু'হাজার বছরের রব্বি, বিশপ, পণ্ডিত ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের দ্বারা বাইবেলের ব্যাখ্যাগুলিকেও পরীক্ষা করেছেন এবং তার ফলে বাইবেল-ব্যাখ্যার অসংখ্য নতুন নতুন দিক খুলে দিয়েছেন, কেবলমাত্র একটি মতই সঠিক, এরকম মৌলবাদী চিন্তা-ভাবনাকেও নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

বাংলাভাষী পাঠকের জন্য বইটি অনুবাদ করেছেন সৌরীন নাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোজেস ও একেশ্বরবাদ

মূল : সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড
অনুবাদ : সৌরীন নাগ

ফ্রয়েড সাহেব আস্তিক ছিলেন না; তাহার বিবেচনায় ধর্মবিশ্বাস একরূপ মনোবিকলন, মানুষের পরিপক্কতা অর্জন ও জ্ঞান-অন্বেষণের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। সুতরাং মুসার নবীত্বে তাহার বিশ্বাস থাকিবার প্রশ্ন উঠে না। তাহার অনুসন্ধিৎসা কিছুটা ভিন্ন হইবারই কথা। মুসা নবী এবং একেশ্বরবাদ নামীয় গ্রন্থটিতে তাহার উদ্দেশ্য ঠিক কী সহসা স্পষ্ট হয় না। তবে শুরুতে তিনি স্বীয় কায়দায় মুসা নবীর ঠিকুজি লইয়া টানাটানি করিয়াছেন। তাহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে মুসা নবী আদৌ বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত নহেন। বরং তিনি মিশরীয় বংশোদ্ভূত, মিশরের এক সম্ভ্রান্ত বংশের ভাগ্যবিড়ম্বিত সন্তান। নিছক পৌরাণিক কাহিনীর বিবর্তনে তিনি ইহুদি পরিচয় লাভ করিয়াছেন।

ফ্রয়েড সাহেবের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হইল : মুসা নবী আল্লাহর ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত হইয়া নতুন কোনো ধর্ম প্রবর্তন করেন নাই; বরং পূর্বপ্রচলিত ইখনাতনের ধর্মই তিনি প্রচার করিয়াছেন। অতএব তাঁহার প্রতি ভক্তিতে আনত হইবার বিশেষ কোনো কারণ ইহুদি সম্প্রদায়ের থাকিতে পারে না।

সাতকাহনে বইয়ের পাতার সংখ্যা বাড়িলেও ফ্রয়েড সাহেব কার্যত এমন কিছুই বলিতে পারেন নাই যে ইহুদিরা মুসা নবীর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিবে। বরং মুসা নবী যে একটি ঐতিহাসিক অস্তিত্ব, কাল্পনিক কোনো চরিত্র নহেন, এই বক্তব্যটি প্রকারান্তরে দৃঢ়মূল হইয়াছে। অবচেতনের রাজাধিরাজ ফ্রয়েড সাহেবের অবচেতনে লক্ষ্য হয়তো তাহাই ছিল। ধর্মে বিশ্বাস না থাকিলেও জন্মসূত্রে তিনি নিজেও ইহুদি; মুসা নবী সম্পর্কে তাহার কৌতূহল থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

–ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, *দৈনিক প্রথম আলো*

"একটা জাতি যাকে জাতির শ্রেষ্টতম সন্তান বলে প্রশংসা করে, সেই মানুষকে জাতির কাছে অস্বীকার করা, এটা মোটেই হাল্কাভাবে নেওয়া যায় না– বিশেষ করে সেই জাতিরই আরেকজনের পক্ষে," সিগমুণ্ড ফ্রয়েড লিখছেন, যখন তিনি মোজেস ও একেশ্বরবাদ বইতে সেই মহান্ অনুশাসন-দাতার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিচ্ছেন– এই বইয়ে, যেটি তাঁর শেষ বই।

বাংলাভাষী পাঠকের জন্য বইটি অনুবাদ করেছেন সৌরীন নাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমরখন্দ ▷ আমিন মাআলুফ

টাইটানিকের সঙ্গে আটলান্টিকের গভীর তলদেশে ডুবে গিয়েছিলো একটি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। ১৯১২ সালের ১৪ এপ্রিল– যেদিন টাইটানিক ডুবেছিলো মার্কিন উপকূলের কাছাকাছি আটলান্টিকে। হ্যাঁ টাইটানিকের মধ্যেই ছিলো ওটি। পাণ্ডুলিপিটি ছিলো ওমর খৈয়ামের লেখা রুবাইয়াতের। কি করে পারস্যের এই গৌরব উঠেছিলো টাইটানিকে? তারই ইতিবৃত্ত এই উপন্যাস। শুধু তাই নয়, কি ভাবে প্রবল বৈরি পরিবেশে একাদশ শতকে ওমর খৈয়াম লিখেছিলেন তাঁর রুবাইগুলি! ইরানের ইস্পাহানের অধিবাসি ছিলেন ওমর খৈয়াম কিন্তু গিয়েছিলেন মধ্য এশিয়ার সমরখন্দে। এক কাজী তাঁকে রক্ষা করেছিলেন কারণ তখন ঐ অঞ্চলের কোনো রাজ্যেই কবি, দার্শনিক, গবেষক, চিন্তাবিদ কারুরই কোনো মূল্য ছিলো না, অধিকার ছিলো না জ্ঞান চর্চার। আর ওমর খৈয়াম তো ছিলেন কবি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম রচনার আগে-পরে অনেক ঘটনাই ঘটেছিলো সমরখন্দে ওমর খৈয়ামকে নিয়ে, তাঁর রুবাইগুলো নিয়ে। ১০৭২ সালে ওমর খৈয়াম পৌঁছেছিলেন সমরখন্দে– ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিলো তখনই। তারপর বিংশ শতকের প্রথম দশকে এক আমেরিকান বুদ্ধিজীবীর নজরে আসে রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের মূল পাণ্ডুলিপিটি। নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে ওটি তাঁর হস্তগত হয়। নাম তাঁর বেঞ্জামিন লেসাজে। লেসাজে পাণ্ডুলিপিটি নিয়েই উঠেছিলেন টাইটানিকে। টাইটানিক ডোবার পর লেসাজে বেঁচে গিয়েছিলেন কিন্তু রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের পাণ্ডুলিপিটি বাঁচেনি।

AMARBOI.COM

লেবানিজ সাংবাদিক-সাহিত্যিক আমিন মাআলুফ তাঁর এই সমরখন্দ উপন্যাসে ওমর খৈয়ামের সমরখন্দ আগমন থেকে নিয়ে তাঁর রুবাইয়াৎ রচনা এবং সেটির ডুবে যাওয়ার ইতিহাসকে গ্রন্থিত করেছেন পরম দক্ষতায়। কল্পকাহিনীর আদলে লেখা এই ইতিহাস বিশ্ব সংস্কৃতির এক অপঠিত অধ্যায়কে তুলে ধরেছে। এতে আছে সৃজনশীলতা, প্রেম-বিরহ, বিদ্রোহ-ধ্বংস, ব্যর্থতার এক রোমাঞ্চকর চিত্র।

আমিন মাআলুফ ফরাসি ভাষায় লিখেছিলেন উপন্যাসটি, প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৮৯ সালে। বৃটেনে এটির ইংরেজী অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে।

সমরখন্দ উপন্যাসটি তিনটি পুরস্কার পেয়েছে এপর্যন্ত। প্রথম, প্রিক্স দ্য মাঁইসো দি লা প্রেস, দ্বিতিয়টি, দ্য রক অব তানিয়াস এবং ১৯৯৩ সালে এটি ভূষিত হয় অত্যন্ত সম্মানজনক সাহিত্য পুরস্কার প্রিক্স গনকোর্ট-এ।

এই সমরখন্দ-এরই বাংলা অনুবাদ লেখকের অনুমতিক্রমে বাঙালী পাঠকদের জন্য–

অনুবাদ করেছেন : আবীর হাসান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরিয়েছে

বিখ্যাত লেখক **ক্যারেন আর্মস্ট্রং**-এর

The Battle for God-এর বাংলা অনুবাদ

স্রষ্টার লড়াই

মৌলবাদের ইতিহাস

অনুবাদ : সুনীতি চরণ ভট্টাচার্য্য

যুক্তিবাদ ও প্রযুক্তি প্রভাবিত আমাদের বর্তমান সময়টি সেক্যুলার হওয়ার কথা, কিন্তু বিশ্বের প্রতিটি প্রধান ধর্মের ক্ষেত্রে মৌলবাদী শক্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। কেন? সুবিখ্যাত লেখক ক্যারেন আর্মস্ট্রং এই বিহ্বলকারী ও বিব্রতকর প্রশ্নের জবাব খোঁজার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ **'দ্য ব্যট্‌ল ফর গড'**-এ।

মৌলবাদ ধর্মের প্রাচীন ধরনের পুনরাবির্ভাব নয়, যেমনটি সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় বরং তা আধুনিক বিশ্বের আধ্যাত্মিক টানাপোড়েনের প্রতি সাড়া বিশেষ। আর্মস্ট্রং যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আলোকনপর্বে কিংবদন্তী ও বিশ্বাসে প্রোথিত ধর্মানুরাগের বিনাশ ঘটায় মানুষ ধার্মিকতার নতুন উপায়ের সন্ধানে বাধ্য হয়েছে–যার ফলে মৌলবাদের আবির্ভাব। এ গ্রন্থে আর্মস্ট্রং তিনটি মৌলবাদী আন্দোলনের উপর আলোকপাত করেছেন : আমেরিকায় প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদ, ইসরায়েলের ইহুদী মৌলবাদ এবং মিশর ও ইরানের ইসলামি মৌলবাদ–আধুনিকতার আক্রমণ ঠেকাতে প্রতিটি আন্দোলন কীভাবে নিজস্ব অনন্য কৌশল গড়ে তুলেছে তার অনুসন্ধান করেছেন তিনি।

ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতাকে মিশিয়ে মানবজাতির আধ্যাত্মিক দিকের গভীর উপলব্ধির আলোকে ক্যারেন আর্মস্ট্রং ধর্মীয় অভিব্যক্তির চরমপন্থী রূপটির আকর্ষণীয় ও নিবিড় বর্ণনা দিয়েছেন, যে অভিব্যক্তিটি বিশ্বের ইতিহাসের গতি স্থির করে দিচ্ছে।

ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর লেখা

ইসলাম সংক্ষিপ্ত ইতিহাস • মুহাম্মদ (সঃ) : মহনবীর জীবনী • মুহাম্মদ (সঃ) : আমাদের সময়কার পয়গম্বর • বাইবেল : একটি জীবনী • পূরাণ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলায় প্রকাশ করেছে সন্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশকে পটভূমি করে অস্ট্রেলিয়ান চিত্রকর ও ঔপন্যাসিক ওয়াইন এস্টনের লেখা উপন্যাস

টিন রঙা শাড়ি

ওয়াইন এস্টনের সাম্প্রতিক গ্রন্থ *Under a Tin-grey Sari*-র বাজার জমজমাট। সম্প্রতি এক আড্ডায় উপন্যাসটি সম্পর্কে জানতে পারি। কৌতূহল ব্যাপক হয়, যখন শুনি উপন্যাসটির পটভূমি বাংলাদেশ। আরো চমৎকার যে পেপার ব্যাকে মোড়া ৪৭০ পৃষ্ঠার উপন্যাসটির পটভূমি আমার জন্মভূমি চট্টগ্রাম। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মনোরম শৈল শহর চট্টগ্রামের প্রেম কাহিনী। খ্যাতিমান সমালোচক কিম স্কট লিখছেন, 'ইট ইজ আ সেনশুয়্যাল লাভ স্টোরি সেট ইন ১৯৬৭ ইন দ্য বাস্টলিং সিটি অব চিটাগাং। আই লাভ্‌ড্ দ্য প্লেফুল উইট অ্যান্ড আইরনি অব দিজ নভেল অ্যান্ড ফেল্ট আই হ্যাড এন্টার্‌ড্ ইনটু অ্যান ইনটিমেট প্যাক্ট উইথ দি ন্যারেটর।

উপন্যাসটির আগাগোড়া ইতিহাসের সময়কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। খালেদ নামের এক বাবুর্চি এ উপন্যাসের নায়ক। এই তরুণ বাবুর্চিটি অসাধারণ তন্দুরি পাকানোর কারণে চট্টগ্রাম শহরে খ্যাতিমান হয়ে ওঠে এবং তার বদ্ধ ধারণা সাহেব (Sahib's) মহলে বিয়ের খানা পাকাতে পাকাতে একদিন সে বিশ্বখ্যাত হয়ে উঠবে। যখন তার উদ্ভূত ধারণা চুরি করে ইংরেজ সাহেবদের কারখানায় তন্দুরি পাকানো শুরু হয়, খালিদের বেদনা তখন চরমে পৌঁছে। ইতিমধ্যে সাহেবের বাসার জেঠি নামের সুন্দরী আয়াটির সঙ্গে খালেদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রেমান্ধ খালেদ জানে না যে, জেঠি উত্তেজক অপরাহ্ন পাড়ি দিচ্ছে। কেননা সাহেবীয় প্রেমের আলাদা স্বাদের জন্য জেঠি তখন পাগলপ্রায়। আরো অনেক ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্বের ভেতর এগিয়ে যায় উপন্যাসটি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম প্রসঙ্গেও ইঙ্গিত রয়েছে এতে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, জিয়াউর রহমানের ঘোষণা শুনে অস্থির খালেদের প্রতিক্রিয়াগুলো চমকে দেয়। নিঃসন্দেহে ওয়াইনের ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতায় পুষ্ট উপন্যাসটি। ভাষা যেন সঙ্গীত ও নৃত্যের মতো দোল খায়। পশ্চিম প্রান্তে বড় হওয়া ওয়াইন এস্টন পাশ্চাত্য ধারায় কৌতুকের ব্যাপারেও অগ্রণী। তাই রসবোধের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া প্রেম কাহিনীটি মনোটোনাস তো নয়ই বরং দ্বন্দ্বে অনেক তীব্র।

–অজয় দাশগুপ্ত, (দৈনিক প্রথম আলো ২১-০২-২০০৩)

উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদ শিবব্রত বর্মনের অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আফগান লেখক খালেদ হোসাইনি'র
আলোড়ন সৃষ্টিকারী, বহুল প্রশংসিত প্রথম উপন্যাস:

দ্য কাইট রানার

বারো বছরের বালক আমির বাবার স্বীকৃতি পেতে মরিয়া। ওর মাঝে পৌরুষের উপাদান আছে প্রমাণ করতে স্থানীয় ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার সংকল্প করে ও। ওর বিশ্বস্ত বন্ধু হাসান ওকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সবসময়ই আমিরকে সাহায্য করে সে। কিন্তু এটা ১৯৭০ দশকের আফগানিস্তান। হাসান স্রেফ নিচু শ্রেনীর এক ভৃত্য, পথেঘাটে যাকে নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়, যদিও ছেলেটার সহজাত সাহস আর ওর বাবার হৃদয়ে তার আসনের কারণে তাকে ঈর্ষা করে আমির। প্রতিযোগিতার দিন বিকেলে হাসানের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে সেটা আঁচ করতে পারে নি ওরা কেউই– যা চুরমার করে দেবে ওদের জীবন। রাশানরা আগ্রাসন চালানোর পর ওর পরিবার যখন আমেরিকায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, আমির বুঝল একদিন অবশ্যই ফিলতে হবে ওকে এমন কিছুর সন্ধানে নতুন জগৎ যা দিতে পারে ওকে: নিস্কৃতি।

AMARBOI.COM

"হোসাইনি সত্যিই একজন প্রতিভাবান কথক... আপনার হৃদয়ে সুর তুলতে কোনও তন্ত্রীতে টোকা দিতেই শঙ্কিত নন।"

–দ্য টাইমস্

"দরদ ও সত্যির অনুরণন। আমির ওর মারাত্মক ভুল শোধরানোর প্রয়াস পাচ্ছে, সে বিচারে ওই গ্রন্থের নায়ক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাসানের নীরব, নিবেদিতপ্রাণ ভালোবাসাই আপনার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবে।"

–ডেইলি মেইল।

"প্রেম ও বিবাহের অভিজ্ঞতার মূলে পৌছানোর ক্ষমতা হোসাইনিকে ট্যাং-রা লা'র মতো নতুন আমেরিকার অনন্য কাহিনীর কাতারে পৌছে দেয়... অসাধারণ মহত্ত্ব, সততা এবং সহানুভূতির উপন্যাস।"

–ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

"খালেদ হোসাইনির *দ্য কাইট রানার* এক অসাধারণ উপন্যাস।... দীর্ঘক্ষণ স্তম্ভিত হয়েছিলাম। ব্যতিক্রমধর্মী। ঔপন্যাসিক নিঃসন্দেহে একজন শক্তিশালী লেখক।"

–ইসাবেল আয়েন্দো।

লেখকের অনুমতিক্রমে গোলাম রসুল ফিরোজের অনুবাদ সন্দেশ প্রকাশ করেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~